স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক
শ্রীকুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
উপনিষৎ-রহস্য কার্য্যালয়
গুরু-মন্দির,
হাওড়া।

প্রিণ্টার—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস, লিঃ
৯৩-এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্

রবিমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে হুতাশনঃ ।
তেজোমধ্যে স্থিতং সত্ত্বং সত্ত্বমধ্যে স্থিতোঽচ্যুতঃ ॥

ওঁ নমঃ শ্রীগুরবে।

তমোনিমগ্নে ভুবনে বিদিত্বা
মিথ্যাভিভূতান্ মনুজান্ কৃপালুঃ।
যো দেবদেবঃ কৃপয়া দিদেশ
সত্যপ্রতিষ্ঠাং তমহং প্রপদ্যে॥

উপাসনং পূজনমধ্বরাদিকং
আচারমাত্রাবসিতং যদাঽভবৎ।
তদা গুরুর্যো জগতাং সমাদিশৎ
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং তমহং প্রপদ্যে॥

তন্ত্রপ্রোক্তং মন্ত্রচৈতন্যমগ্র্যং
কালান্নষ্টং যস্য কারুণ্য-লেশাৎ।
আবির্ভূতং তস্য পাদারবিন্দে
শ্রীমদ্‌গুরোর্লীয়তাং মানসং মে॥

সম্যক্ত্যাজ্ঞানতো ব্রহ্ম-বিষ্ণু-
রুদ্রগ্রন্থীন্ ভেদমার্গাংশ্চ তেষাম্।
স্বয়ং দৃষ্ট্বা দর্শয়েদ্‌যোঽপরেভ্যঃ
কৃপাবন্তং সদ্‌গুরুং তং নমামঃ॥

"…শুশ্রূষাং সোঽনুচানা উপলভন্তে…"

উৎসর্গ

দীনা ক্ষুদ্রা হইলেও করুণা করিয়া তোমার সমস্ত যজ্ঞের ভার দিয়া ও মা বলিয়া যাহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছ, তাহার ভক্তিহীন প্রণামটুকু গ্রহণ কর। তোমার উপদেশ-বাণী তোমাকেই সকলে মিলিয়া উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীচরণাশ্রিতা সেবিকা সুভাষিণী—

—মা।—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গ-সাহিত্যের ভূতপূর্ব্ব
অধ্যাপক ৺শশাঙ্কমোহন সেন বি এল, বিদ্যাভূষণ,
কবিভাস্কর মহাশয় তৎপ্রণীত "বাণী-মন্দির"
নামীয় গ্রন্থে "ঋতম্ভরা" সম্বন্ধে
লিখিয়াছেন,—

বর্ত্তমান প্রসঙ্গের মুদ্রণ-ব্যাপার চলিতেছে, এমন সময় একটী অপূর্ব্ব গ্রন্থের দিকেই ঘটনাক্রমে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল,—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মার 'ঋতম্ভরা'। লেখক মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। কিন্তু গ্রন্থপাঠে মনে হইল, প্রাচীন 'আর্যবিদ্যা' এখনো এতদ্দেশে 'সম্প্রদায়'ক্রমে অক্ষুন্ন আছে। ভারতীয় 'মৌষ্টিক বিদ্যা' বিষয়ে উহা বঙ্গভাষায় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যতদূর ভাষায় আসে, লেখক তাহা অনুপম ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। অগ্রে 'বেদান্তদর্শন' এবং শ্রীমতী বেশান্তের 'thought power' গ্রন্থটী পাঠ করিয়া 'ঋতম্ভরা' গ্রহণ করিলেই জিজ্ঞাসু পাঠক উপকৃত হইতে পারেন। যদিও গ্রন্থটী কার্য্যকর ভাবে বুঝিতে হইলেও অনেক স্থলে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে। —বাণী-মন্দির, ৩৮২ পৃষ্ঠা।

আমার বক্তব্য

যখন থেকে তোদের সত্যপ্রতিষ্ঠার কথা বল্‌তে আরম্ভ করেছি, তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত যা তোরা শুনেছিস্‌, শিখেছিস্‌ ও উপলব্ধি করবার স্বল্প-বিস্তর চেষ্টা করেছিস্‌ বা আমি তোদের পাখী-পড়ান ক'রে ১৪।১৫ বৎসর ধরে বলে আস্‌ছি, সেগুলি যে পূজ্যপাদ সত্যদ্রষ্টা ঋষিদিগের অমৃতবাণীরই প্রতিধ্বনি, কপোল-কল্পিত কথা নয়, অন্ততঃ এইটুকু তোরা বুঝতে পেরেছিস্‌ ব'লে আমার আনন্দ হয়। তোরা জানিস্‌, আমি শাস্ত্র পড়ে কোন কথা বলিনি। যা দেখি, তাই বলি, আর তোরা প্রায়ই সেই সবগুলি শাস্ত্র-কথিত ব'লে বুঝতে পারিস্‌। সাধনা যে বই পড়ে হয়ে উঠে না, এটা আমি তোদের বলেছি। মাটিতে সাঁতার শিখে জলে নামতে হয় না, জলে নেমে সাঁতার শিখতে হয়; তবে উপদেশ যে সাহায্যকারী নয়, এ-কথা কখনও বল্‌তে চাই না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটা ভুল্‌লেও চলে না যে, গুরু-মুখ হইতে লব্ধ উপদেশই প্রকৃত জীবন্ত সংশয়শূন্য ও সত্বর সিদ্ধিপ্রদ হয়; কেন না গুরু দ্রষ্টা ও মন্ত্রচৈতন্যময়। যাক্‌, তোদের আমি যতটা পারলুম, লিপিবদ্ধ

ক'রে দিলাম; এখন প্রকাশের ইচ্ছা হয় কর। জগতে দু'টী প্রত্যক্ষ মহাসত্য আলোক আঁধারবৎ রয়েছে--ভগবান্ ও মৃত্যু; যারা প্রথমটিকে না দেখে, তারা শেষেরটি পায়, আর এই দুইয়ের ডাক কেহ উপেক্ষা করিতে পারে না। গুরুরূপে ভগবান্ই ডাকেন, সুতরাং তাঁরই ডাক ব'লে তোরা গুরু-মুখে তাঁর ডাকের সাড়া দিতে এগিয়ে আয়।

আমি এই সত্যপ্রতিষ্ঠার উপক্রমণিকাস্বরূপ "সত্যালোকম্" লিখ্তে আদেশ দিয়াছিলাম এবং কি লিখতে হবে, তাও ব'লে দিয়েছিলাম; "পণ্ডিত" সেটা বেশ লিখেছে আর "সত্যপ্রতিষ্ঠা" নামে লব্ধ উপদেশের কতকটা মর্ম্মও প্রকাশ ক'রেছে। এখন নিজে সবটা লিপিবদ্ধ ক'রে দিলুম। ও দু'খানা আগে পড়ে এটা পড়া ভাল। শুধু রুদ্রগ্রন্থি সম্বন্ধে কা'কেও বলা হয় নাই। পরে বল্‌বার ইচ্ছা আছে। "সাধন-সমর" নামে চণ্ডীর ব্যাখ্যাও সে আমার উপদেশ ও গীতার ব্যাখ্যার অনুসরণে লিখেছে; যদিও স্থলে স্থলে একটু ভাববিপর্য্যয় তাতে রয়েছে ব'লে মনে হয় ও রুদ্রগ্রন্থি সম্বন্ধে প্রায় বিশেষ কিছু বলা হয়নি—হবার কথা নয়। অনেকে মনে করে, চণ্ডীখানা আমারই লেখা; সেই জন্যও এটী বলে রাখ্‌লুম। "সাধন-সমর" পুত্রোপম শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ (আদরের নাম "পণ্ডিত") তারই লেখা। যাক্, এবার কাজের কথা বলি।

সত্য-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমার কথার স্থূল তাৎপর্য্য, অবাধ পরমাত্মদর্শনের প্রতিষ্ঠা। জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন

পরমাত্মা যুগপৎ সর্ব্বলিঙ্গাতীত এবং উভয়লিঙ্গ, সর্ব্ববিপরীতের সমন্বয় তাঁতে; যুক্তিতে তা বলা বা উপলব্ধি করা যায় না। আলোক আঁধারবৎ বিপরীত হ'লেও জ্ঞান অজ্ঞান বা চেতন অচেতন, সমস্তই জ্ঞানময়ের সত্য জ্ঞানশক্তিবিলাস, সুতরাং চক্ষে, কর্ণে, মনে প্রাণে, সর্ব্বতঃ আত্মাকেই দেখিতেছি, এই চেতনধার ফুটিয়ে তুল্‌তে হ'বে, কোন কিছু বাদ দিতে গেলে, মিথ্যা বল্‌তে গেলে, দ্বিতীয় বল্‌তে গেলে অল্পবিস্তর বাধ হয় বা অনাত্মদর্শন হয়। তাই মিথ্যারূপে প্রতীত যাহা কিছু, তাহাও উপনিষদের আদেশ অনুসারে সত্য-জ্ঞানে দর্শন করতে হবে। এই কথা অনুসারে সাধনতত্ত্ব বুঝিয়ে দিতে গিয়ে "ব্রহ্মগ্রন্থি", "বিষ্ণুগ্রন্থি" ও "রুদ্রগ্রন্থি" নামীয় বিভাগগুলি ধ'রে অনুভূতি-ক্ষেত্র বিশ্লেষণ ক'রে তোদের আমি পাখী-পড়ান করেছি ও যত দূর পেরেছি, লিখে দিয়েছি। সত্য-প্রতিষ্ঠা, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, মন্ত্রচৈতন্য—এগুলি বস্তুতই অভিনব, অপূর্ব্ব গুরুপ্রদত্ত আলোক। তোরা সে আলোক লাভ কর ও অপরকে দান কর,—গ্রহণ ও দানই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।

তুষ্টি সত্যপ্রতিষ্ঠার অন্য অন্তরায়। তুষ্টির দিকে চোক রাখ্‌বি; তুষ্টি এসে দাঁড়ালে, সবলে তাকে ভেদ ক'রে চল্‌তে থাক্‌বি; জান্‌বি, পেতে হ'বে অনেক। আর একটা মস্ত আশঙ্কা, সত্যপ্রতিষ্ঠায় একটু অগ্রসর হ'লে তখন অন্তর্বৃত্তিগুলি এত সজীব ও সতেজ হ'য়ে ওঠে যে, কোন কিছু একটা ফুটে উঠলে তাকে থামান দুষ্কর। সত্যপ্রতিষ্ঠ পুরুষের প্রাণে যা

স্ফুটবে, তা সত্য না হ'য়ে যে যায় না রে! এই জন্যে মন্দ বৃত্তিগুলার দিকে যথাশক্তি পেছন ফিরে দাঁড়াবি।

আর "উপলক্ষ্যের আদর" ও "গুরুবোধ" এই দু'টা সব চেয়ে বেশী ক'রে নিজেরা ক'রবি ও শিষ্যদের শিক্ষা দিবি অনেকেরই দেখতে পাই, সময়ে সময়ে এমন জ্ঞানমোহ একটা আসে, যেটা মিথ্যাবাদের দিকেই মানুষকে টেনে নিয়ে যায়। যেমনই তোরা শুনিস্, একমাত্র তিনিই আছেন—তিনি পরমাত্মা, তিনিই পরমগুরু, তিনিই সব, অমনিই তোরা দিব্য ব্রহ্মজ্ঞ হ'য়ে "উপলক্ষ্যের আদর" একেবারে উড়িয়ে দিস্, দেবতা—দেবশক্তি এ সব মানতে চাস না। আবার ওরই আর একটা শাখা হয়—তিনি যা করেন, তাই হয়, সে ত আর কেউ বদলাতে পারে না—চেষ্টাদি সুতরাং পণ্ডশ্রম; যে দিন হ'বার ঠিক হ'বে, এই ভাবে তোরা উপলক্ষ্যকে একেবারে মাটিতে শুইয়ে দিস্। ওরে, যত দিন যথার্থ আত্মাধিকার না পাস, যত দিন বিষয়াদির উপর তোদের কর্তৃত্ব না আসে, তত দিন তোদের চোখে জিনিষের অপেক্ষা "উপলক্ষ্যেরই" দর বেশী। তিনিই একমাত্র গুরু, এ কথাও সত্য এবং তাঁর ইচ্ছায় যা হবার, সব ঠিক্ হ'য়ে আছে ও হবে, এ কথাও ভুল না। কিন্তু সেই তিনিকে তোর এখন পাওয়া হয়নি। সেই জন্য যতক্ষণ ফুলের গন্ধ পেয়ে ভগবানের গন্ধ বলে সত্য সত্য তাঁকে উপলব্ধি করতে না পারিস, ততক্ষণ ফুলের যেমন তোর কাছে আদর, তেমনই করে যিনি জ্ঞানদাতা মনুষ্যমূর্ত্তি গুরু হয়ে তোকে জ্ঞান দেবেন, জ্ঞান দানের উপলক্ষ্য

স্বরূপ সেই পুরুষে সত্য গুরুবোধ ফুটিয়ে রাখতে, বিন্দুমাত্র অবহেলা করবি না ও কেহ না করে, সেই দিকে চোখ রাখিবি। দেখ, না হ'লে ত স্বচ্ছন্দে বল্‌তে পারিস্, "তোর জন্ম ও জগদ্দর্শনের একমাত্র কারণ ভগবান্; পিতা মাতা উপলক্ষ্য-মাত্র, তাদের আর মর্য্যাদা কি ?" নিজ গুরু, দেবতা বা দেবশক্তি, নিজ প্রচেষ্টা, বাহ্য পূজাদিরূপ ব্যবহার, এ সবকে জ্ঞানের মোহে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা যেন বিন্দুমাত্র না হয়। প্রতীকে সত্যবোধ না ফোটাতে পারলে কখনও সত্যক্ষেত্রে পৌঁছাতে পারবি না— পারবি না। মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধেও তাই বুঝিবি—মূর্ত্তি উপাসনা সম্বন্ধেও ওই একই কথা। উপলক্ষ্যকে মধু অভাবে গুড়, গুড় অভাবে ইক্ষুদণ্ড ও ক্রমে ইক্ষুদণ্ড অভাবে দণ্ড দিতে তথাকথিত ব্রহ্মবাদীদের প্রায়ই দেখতে পাই। শ্রুতির "পদেনানুবিন্দেৎ" কথাটি ভুলিস্ না।

সর্ব্বতোভাবে অগোচর পরমাত্মাই সর্ব্বতোভাবে গোচরী-ভূত পরমেশ্বর। নিজের স্থূল সত্তার মত সত্যবোধ যতক্ষণ না তাঁর সম্বন্ধে লাভ করিস্—বিন্দুমাত্র কম নয়, বরং অনেক বেশী—ততক্ষণ প্রতীকই তোর পরিত্রাতা, পথের সাথী, উদ্ধার-কর্ত্তা—চেষ্টাই তোর মৃত-সঞ্জীবনী পথ্য—মনুষ্যরূপী গুরুই তোর সর্ব্বস্বের অধিকারী—এ অচেতনরূপী বিশ্বই তোর চেতনাত্মার ভূমামন্দিরের আলোক। অপ্রত্যক্ষা মা এই রূপেই প্রত্যক্ষী-ভূতা। আমার গুরুরূপিণী মায়ের পাদপদ্মে বসে যা লাভ করেছি, তাই আমার উপনিষদ্, তাই তোদের বলে দিলুম।

তাঁর পাদপদ্মে তোদের পূজা পৌঁছে দিতে না পারলে আমি গুরুবিত্তাপহারী হব। ওঁকে প্রণাম কর—প্রণাম কর—আমি শুধু এইটুকুই তোদের কাছে আশা করি। গুরুতুল্য চৈতন্যময় হওয়াই প্রকৃত গুরুর ঈপ্সিত দক্ষিণা। তোরা গুরুদক্ষিণা দিতে সমর্থ হ'স্—মায়ের এই বরাশীষ তোরা লাভ কর।

ব্রহ্ম-গ্রন্থি

সত্য-প্রতিষ্ঠা

ঋতম্ভরা
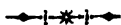
সত্য-প্রতিষ্ঠা

সত্য

সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥

জয়যুক্ত হয়—বিজয়মণ্ডিত হয় সত্য। মিথ্যা কখনও বিজয়-শ্রীকে আলিঙ্গন করিতে পারে না—কি আধ্যাত্মিক রাজ্যে, কি ব্যবহারিক জগতে। বিশেষতঃ আত্মার পথে, আত্মার মুখে অগ্রসর হইতে হইলে সত্যের আলোকোজ্জ্বল পথেই বিচরণ করিতে হইবে। সত্যের পাদক্ষেপে সত্যকামী হইয়া, সত্য-মণ্ডিত পথ অতিক্রম করিতে করিতেই সত্যের মুক্তমন্দিরে পৌঁছান যায়। যে দিক্ দিয়া যাইলে মিথ্যার ছায়া প্রাণে জাগিবে না, মিথ্যার মাটিতে পাদক্ষেপ করিতে হইবে না, মিথ্যার দৃশ্য চক্ষে উদ্ভাসিত হইবে না, মিথ্যার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত চেতনার কোন প্রান্তকে কলঙ্কিত করিবে না, মিথ্যা শব্দটা পর্য্যন্ত সত্যের আলোকে সত্য হইয়া উঠিবে, অথবা মিথ্যাটা বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াই দাঁড়াইবে, সেই দিকেই সত্যের ভূমা

মন্দির প্রতিষ্ঠিত। বিন্দুমাত্র মিথ্যার আভাস যদি প্রাণে জাগে বা জাগিবার অবসর পায়, তবে বুঝিতে হইবে, সত্য হইতে সেই পরিমাণে বিচ্যুত হইয়াছি।

কিসের অবসাদ? কিসের মর্ম্মভেদী হাহাকার? কিসের এ দীনতা—এ করুণ লুণ্ঠন? কেন এ মোহ-মূর্চ্ছা? কেন এ ভীতিবিভীষিকা? কেন এ দৌর্ব্বল্য, এ আত্মদারিদ্র্য, বলহীন মন, এ দীপ্তিহীন প্রাণ, এ প্রকৃতির দাসত্ব, এ সঙ্কীর্ণতা, এ ভূমিলুণ্ঠন? মিথ্যার—মিথ্যা জ্ঞানের—মিথ্যা বোধের, মিথ্যা দর্শনের।

তোমাদের সব মিথ্যা। তোমরা শিখিয়াছ, জানিয়াছ, বুঝিয়াছ—এ জীবন মিথ্যা অনিত্য, এ সংসার মিথ্যা অনিত্য, এ দেহ মিথ্যা অনিত্য, এ ফুল ফল, চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি, এ স্ত্রীপুত্র পিতা মাতা, এ বাহ্য জগৎ, এ অন্তর্জ্জগৎ সমস্ত—সমস্ত শুধু মিথ্যায় ভরা, মিথ্যা জীবনের মিথ্যা মরীচিকা। মরণের পট-পরিবর্ত্তনে তোমাদের ক্ষীণ দৃষ্টি জীবনের সীমারেখা দেখে; জন্মে তোমাদের জীবনের আদি, মরণে শেষ। এইটুকু—এই প্রত্যক্ষিতাটুকু তোমাদের প্রাণের পরতে পরতে একটা ক্ষণভঙ্গুরতার আতঙ্ক জাগ্রত করিয়া রাখে, আর ভগ্নপ্রবণ পদার্থের মত অতি সাবধানে, অতি সঙ্কোচে, অতি সতর্কে আগলাইয়া আগলাইয়া, হারাইয়া ফেলি হারাইয়া ফেলি করিয়া সভয় সোদ্বেগে চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া তোমরা যতক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি রাখি, এই ভাবেই অন্তর ও বাহ্যবোধের

উপজীব্য বিষয়গুলিকে, এমন কি, আপনাকে পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কর। বোঝ এ সব মিথ্যা—সেইগুলিকে সত্যের মত ব্যবহার কর, অথচ বল মিথ্যা ; আর তাহার উপর তোমাদের শিক্ষালাভ হয়—"ভাই সকল, এ সমস্ত মিথ্যা, এ মিথ্যা সংসারমোহ দূরে ফেলিয়া দাও, ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দাও, এ স্বপ্ন—এ সংসারমোহ ত্যাগ কর, ত্যাগ কর ; পলায়ন কর এ মরীচিকার মোহভূমি হইতে—মায়ার এ জ্বালাভূমি হইতে।

পলাইতে পার বা না পার, কিন্তু মিথ্যায় যে সত্য সত্যই মগ্ন হইয়া আছ, এ বোধটা সে উপদেশে আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে, জ্বালা বর্দ্ধিত হয়, অন্ধকার আরও আবৃত করে, সংসার বিষময় মিথ্যাময় হয়, নরক-জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে ত্রাহি ত্রাহি রব কর, অথচ কি ধরিয়া উঠিবে, পলাইবে, কিসে ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইবে, তেমন সত্যের রজ্জু, সত্যের দণ্ড তোমাদের করতলগত নহে। দূরে—দূরে সে দণ্ড, অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অরূপ, অশব্দ, অবাঙ্মনসগোচর,—পালাইলে তবে তাঁহাকে পাওয়া যায়, অন্ধকার দূর করিলে তবে সে আলোক দীপ্তি পায়! বলিহারি শিক্ষা!

মায়াবাদ।

অন্য শিক্ষাও আছে তোমাদের—"ত্রাহি ত্রাহি তাঁহাকে আহ্বান কর, তাঁহাকে সেবা কর, তিনি সর্ব্বময়, এ অচেতন জগৎ, এ সব অচেতন তাঁহারই অঙ্গ, তাঁহাকে ভালবাস, ভক্তি কর, ভজনা কর, এ অনিত্য সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবে—এ মিথ্যাময় জগৎ হইতে পরিত্রাণ

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

পাইবে।” পূর্ব্বশিক্ষা তবু বলিয়াছিল, এ জগৎ স্বপ্নময় মিথ্যা মরীচিকাবৎ অস্তিত্বহীন শুধু ভ্রম। পরশিক্ষা আরও জীবন্ত করিয়া, সত্য করিয়া গাঁথিয়া দিল, অচেতনের এক নিত্য অস্তিত্ব, মিথ্যা স্বপ্নে আচ্ছন্ন করিবার এক সনাতন অনাত্ম আবরণ, আত্মার অঙ্গে অনাত্মের এক পারমার্থিক সত্যের বিদ্যমানতা। ছিল আত্মা কুজ্ঝটিকায় ঢাকা—আসিল তাহারই উপর দুর্ভেদ্য পর্ব্বতপ্রাচীর। আর সত্য-বঞ্চিত তোমরা একের শিক্ষায় নিজে সত্য হইয়াও মিথ্যায় দৃষ্টিহীন হইলে—অন্যের উপদেশে সত্যের অঙ্গ হইয়াও অচেতনের প্রাচীরে অবরুদ্ধ হইলে।

মিথ্যা নহে। তুমি মিথ্যা নহ—এ জগৎ মিথ্যা নহে, সত্য পরমাত্মার সত্য-শক্তির সত্যলীলা—নাম, রূপ ও কর্ম্ম আবর্ত্তনময় আত্মবিলাস। তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রে যেমন জল ভিন্ন কিছু নাই বলা যায়, কিন্তু তরঙ্গ মিথ্যা বলা যায় না—তরঙ্গ যেমন জলেরই আবর্ত্তন এবং সেই আবর্ত্তনে যেমন জলেরই নাম, রূপ ও কর্ম্মাত্মক বিশিষ্টতা দেখি, সে নাম, রূপ, কর্ম্ম সত্য বলি, পদার্থরূপেই হউক, নামরূপ কর্ম্মরূপেই হউক, জলকেই পাই, দেখি, বোধ করি, এ জগৎ ঠিক তেমনই; কোন মিথ্যা বা মিথ্যা-সত্যমিশ্রিত ব্রহ্মাবরণ নয়—নামরূপাত্মক আত্মার বিশিষ্টতা, মাত্র চেতনাত্মার বিশিষ্টতা—আত্মাই। কোন আবরণ নাই—আত্মার কোন অনাত্মনামীয় অচেতনধর্ম্মী পদার্থ নাই—আত্মারই নামরূপকর্ম্ম-বিশিষ্টতাময় স্বরূপ-মহিমবিলাস। শুধু

আত্মা—আত্মা স্বপ্রকাশ, একান্ত ভূমা, একান্ত অপরিচ্ছিন্ন, একান্ত মিথ্যাহীন, অচেতনহীন, প্রাণক্রিয়া ও বোধক্রিয়া-রূপ মহিমবিকাশী, বোধময়, বোধমূর্ত্তি সত্য আত্মা।

তবে এই যে জগৎকে অচেতন বলিয়াই, মৃত্যুকে মৃত্যু বলিয়াই জন্মকে জন্ম বলিয়াই দেখি, বোধকরি—এই যে আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি আর্ত্ত, পীড়িত, আমি মহান্, আমি মনুষ্য, এইরূপ বোধে উজ্জীবিত হইয়া বিরাজ করি, ইহা কি মিথ্যা নয়? জীবত্বের বোধে নিমগ্ন হইয়া যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ তোমার পক্ষে ঈশ্বর-বোধের নামরূপকর্ম্মাত্মক সত্যলীলা এইরূপেই প্রতিফলিত হইবে। জীববোধে যাহা বন্ধন, পীড়ন, অবিদ্যা, পরমাত্মদর্শনে তাহা লীলাবিলাস, সত্যের সত্যক্রীড়া। ইহাই সত্যশক্তির সত্যবিলাস।

ইহাকে আংশিক সত্যদর্শন বলিতে পার—সত্যের অনৃত-লীলা বলিতে পার। তোমার অনুভূতিতে উপচিত ভাব-সকলকে অবিদ্যা ও অনৃত আখ্যা ততক্ষণ দিতে পার, যতক্ষণ তুমি জান না, যিনি তোমার আত্মার আত্মা তাঁহারই এ লীলা—তাঁহারই লীলা-বোধে তুমি প্রতিবোধিত হইয়া জীব আখ্যা লাভ করিয়াছ। পরমাত্মার লীলা জীবাত্মায় বাধ্যতার আকার লইয়া উদ্বুদ্ধ হইতেছে এবং ইহা ততক্ষণই হয়, যতক্ষণ লীলাময়ী চিৎ-শক্তির লীলা বলিয়া এ জগৎকে জীব চিনিয়া লইতে না পারে। তোমার বোধে উদ্বুদ্ধ চিন্ময়ীর লীলা ততক্ষণই মাত্র অবিদ্যা, যতক্ষণ বিদ্যারূপিণী চিন্ময়ীকে ইহারই একমাত্র কারণ বলিয়া না

দেখ—সাক্ষাৎ চিন্ময়ী বলিয়া যতক্ষণ অনাত্মবোধ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে না পার। এ বিদ্যা, এ মহিমা, বস্তুতঃ সত্যের মহিমা বা সত্যেরই স্বরূপ। তোমাতে—অজ্ঞ তোমাতে এ বিদ্যাই অবিদ্যাস্বরূপ, অনৃতস্বরূপ লইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে; সুতরাং এ অনৃত, এ অবিদ্যা, তোমার এ জগদ্‌ব্যবহার আংশিক সত্তা, মিথ্যা নহে, সত্যেরই সত্য-লীলা। তুমি সত্যদর্শী হইলে এ জগৎ ঘুচিয়া যাইবে না—তবে আত্মার জগৎ দেখিবে, ঘুচিয়া যাইবে শুধু ইহার অনাত্মবোধ, শুধু ইহার অধীনতার পাশ-মোহ। ইহাই মধ্যমুক্তি বা জীবন্মুক্তি। এই অনাত্মবোধই অবিদ্যা।

তাই—তাই ঋষিরা এই জগতের পরিণামশীল, চঞ্চল নামরূপকর্ম্মের ভঙ্গিমাটুকুকে ঈশ্বরজ্ঞানে আবৃত করিবার জন্য বারবার বলিয়া গিয়াছেন। মধ্যের অনৃত আকারে উদ্ভাসিত সত্যের যে সত্যলীলা, তার আদিতে সত্য এবং তার উদ্দেশ্যের পরিসমাপ্তি সত্যলীলায়। এই অবিদ্যার আদ্যন্ত ঈশ্বরজ্ঞানে আচ্ছাদিত করিবার জন্য ঋষি উপদেশ দিয়াছেন।

মুছিয়া ফেল মিথ্যা দর্শন, প্রাণ হইতে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত কর ও মিথ্যা শব্দ। তোমার বাক্য সত্য, তোমার মন সত্য, তোমার প্রাণ সত্য, তোমার ব্যবহার সত্য, "এই দর্শন, এই বোধ, সত্যানুশাসন" মানিয়া লইয়া সত্য হইয়া থাক। তোমার জ্ঞান-চক্ষুর মিথ্যা কজ্জল মুছিয়া ফেল। তোমার এ লীলার আনন্দ-মন্দিরকে অজ্ঞানের কারাগার বলিয়া

দেখা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হউক। তুমি সত্যদর্শী হও। দেখ, এ জগৎ সত্য আত্মার সত্য লীলারূপ বোধক্রিয়া—মিথ্যা নহে। এই সত্য-দর্শনই তোমায় সত্যের মন্দিরপ্রাঙ্গণে পৌঁছাইয়া দিবে। মিথ্যা জ্ঞানের বিন্দুমাত্র ছায়া থাকিতে তোমার সত্য-দর্শন পূর্ণতা লাভ করিবে না, ইহা কখনও ভুলিও না।

সত্য-প্রতিষ্ঠা

——ঃ০ঃ——

সত্য কি ?

অস্তি ভাতি ইতি সৎ। এই অস্তিত্বের অভাববোধই মৃত্যু শব্দে অভিহিত হয়। মরণের বিভীষিকায় সমাচ্ছন্ন-চেতনা হইয়া শঙ্কিতচিত্তে জীব জগতে বিচরণ করে। জীব চারি ধারে দেখে শুধু মরণ, মরণ, মরণ! মরণের বোধই বুকের ভিতর সজীব হইয়া ফুটিয়া থাকে; আপনাকে হারাই হারাই, এই ভাবে সর্ব্বদা ভীত ত্রস্ত হইয়া থাকে; রহিয়াছি—থাকিব, এ বোধের প্রকাশ জীবের থাকে না। তাই কার্য্যতঃ ভাবের সাধনা হয় না, অভাবেরই সাধনা হয়। আমার পারমার্থিক অস্তিত্বের কখনও বিলোপ হয় নাই, হইবে না—এ বিশ্বের পারমার্থিক অস্তিত্বের কখনও বিলোপ হয় নাই, হইবে না—অস্তিত্ব সনাতন শাশ্বত—অস্তিত্ব আদ্যন্তহীন—অপলোপশূন্য—অস্তিত্ব অচ্যুত। অথবা অস্তি বলিতে মাত্র যাঁহার অস্তিত্ব বুঝায়, সেই চেতন-স্বরূপ ও চিৎশক্তিসম্পন্ন পরমাত্মা শাশ্বত, অচ্যুত—আদ্যন্তহীন। সত্যবোধের ভিত্তি এই অস্তিত্ববোধ। কিন্তু আমি থাকিব, "অথচ যদি সে থাকা আমার" বোধ না হয়, যদি আমার উপলব্ধি না হয় যে, আমি আছি, আমি যদি আমার অস্তিত্ব বোধ করিতে না পারি, তেমন অনুভূতি-হারা—চেতনাহারা অস্তিত্ব কে চায়? সে ত না থাকার মতন থাকা; জীবের প্রাণ তাহা চাহে না।

জীব চাহে, আমি থাকিব ও বুঝিব, উপলব্ধি করিব যে, আমি আছি। থাকা ও থাকার জ্ঞান, এই দুইটাই জীবের নিত্য প্রার্থনা। ভাল, আমি থাকিব, আমি বুঝিব যে, আমি আছি; অথচ সে থাকাটা যদি কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়, তেমন থাকা কি আমি চাহি? না—আমরা এমন থাকা চাহি যে, থাকার অপলাপ হইবে না, সে থাকার জ্ঞান থাকিবে—চেতনা থাকিবে, আর সে থাকাটা অবিচ্ছিন্ন আনন্দময় হইবে; সেই থাকাই হইবে আমাদের প্রিয়। তবেই আমাদিগের অস্তি, ভাতি, প্রিয়, এই বোধে উজ্জীবিত হওয়া হইবে। এই বোধের নামই সচ্চিদানন্দ বোধ। এই যে আনন্দময়, চিন্ময় সত্তাবোধ, ইহাই জীবের নিত্য শাশ্বত প্রার্থনা—জীব ইহারই নিত্য উপাসক; ইহাকে লাভ করিতেই জীব নিত্য আকাঙ্ক্ষা করে। বোধস্বরূপ পরমাত্মার এই সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি, বোধের এই পূর্ণানন্দ মূর্ত্তিই— কাঙ্গালের ঠাকুর—মাতৃহীনের মা—বিপন্ন, ভবসমুদ্রমজ্জিত জীবের ত্রাতা—তার প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা। তুমি আত্মা, তুমি এ ব্রহ্মাণ্ডের মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া বিরাজিত রহিয়াছ—তুমি আমার আত্মা সচ্চিদানন্দময়। তুমি যথার্থই সচ্চিদানন্দ; কেন না, তুমিই রহিয়াছ, তুমি জান যে, তুমিই রহিয়াছ, আর তোমার এ অস্তিত্ববোধের চ্যুতি কখনও কোন নিমেষে হয় না। তুমি আনন্দময়— এত বৈচিত্র্যময় সাজিয়াও তোমার আনন্দের বিচ্যুতি হয় না। আপনাকে হারাইবার এত খেলাতেও তুমি আত্মহারা হও না, তাই তুমি আনন্দময়।

তোমার এ থাকার বিচ্যুতি হয় না, তাই তুমি সত্য। সচ্চিদানন্দময় বলিয়াই তোমায় সত্য নামে অভিহিত করি। সত্য শব্দের "স" অস্তিত্ববাচক, 'ত' অনন্ত বৈচিত্রময়, সত্যমিথ্যা, নিত্যানিত্য, মৃত্যু অমৃত, সর্ব্ববিপরীত ভাবগ্রহণ-সমর্থ, মায়াময় চেতন বা বোধবাচক, আর সে সমস্ত চেতনবিলাসই আনন্দমুখে, আনন্দানুশাসনে, আনন্দউদ্দেশে, আনন্দেরই স্বতঃসিদ্ধ প্রেরণা বলিয়া নিয়ন্তৃত্ববাচক ওই "য" শব্দে আনন্দনিয়ন্তৃত্ব বুঝায়। তাই তুমি সত্য—তুমি আপনাকে সত্য বলিয়াই বোধ কর।

সত্য তুমি—"স" সংজ্ঞা বা নামবাচক, "ত" ভূতি, অনুভূতি, প্রকাশ বা রূপবাচক আর এ বোধপ্রকাশ—এ জগৎরূপ পরিগ্রহণ, কর্ম্মময়—যজ্ঞময় লীলা বলিয়া, প্রত্যক্ষ চাঞ্চল্য বলিয়া—গতি বলিয়া গতিবোধক "য"। নামরূপ কর্ম্মময়—সচ্চিদানন্দময় আত্মা—তাই তোমার নাম সত্য। এ বিশ্ব তোমার বোধক্রিয়া।

তুমি সত্য। "স"=জন্ম, "ত"=লয়। "য" নিয়ামকত্বজ্ঞাপক। এ বিশ্বের জন্মলয়ের নিয়ামক তুমি—তাই তুমি সত্য, বিশ্বের পরম সত্য।—তুমি সত্য। "স" শব্দাত্মক বাক্, "ত" রূপ বা মূর্ত্তিআত্মক মন, আর "য" গতি বা প্রাণবোধক। তাই বাঙ্ময়, মনোময়, প্রাণময় সত্য তুমি—তোমায় সত্য নামে অভিহিত করি। চিন্ময় তোমার "অচেতন" নামীয় বোধই অচেতন জগদ্রূপে প্রতিভাত।

বাহিরে তুমি নামরূপ কর্ম্মময় জগৎ, বিভূতিসম্পন্ন বা "সম্ভূতি"স্বরূপ জগৎরূপী সত্য—অন্তরে তুমি বাঙ্ময়, মনোময়,

প্রাণময়, জগদনুভূতিসম্পন্ন, অসম্ভূতি বা অনুভূতিময় সত্য। শ্রুতিতে তোমায় সম্ভূতি বলা হইয়াছে,—তুমি বোধ-সাহায্যে সম্যকরূপে জগন্মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়াছ বলিয়া। আর অনুভূতিকে বিনাশ বা অসম্ভূতি বলা হইয়াছে—অনুভূতি হওয়াটা সম্যগ্ভাবে হওয়া নয় বলিয়া। কিছু অনুভব করিলাম অর্থে আমার বোধ তদাকার হইয়া গেল। কিন্তু সেই হওয়াটা বাহ্য বিষয়ের অনুসারেই হয়—যে রকম বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শে আসে, সেই রকমই হয় বলিয়া তাহাকে ভূতি বলে না, অনুভূতি বলে। বাহ্য বিষয় ভব, আর আমাদের বোধের তদাকার লওয়ার নাম অনুভব। "সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ" বলিয়া ঈশোপনিষৎ এই জগৎ হওয়া ও জগৎ অনুভব করাকেই উল্লেখ করিয়াছেন, যদিও ভাষ্যকারদিগের চক্ষে ঐ অর্থটা ঠেকে নাই। বাহিরে ভূতি, অন্তরে অনুভূতি; বাহিরে সাজিয়াছ জগৎ, অন্তরে অনুভব করিতেছ জগৎ—তুমি বিশ্বরূপ তুমি বিশ্ববোদ্ধা, তুমি সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি অনুপ্রবেশ করিয়াছ, —হে চেতনা, হে চিন্ময়ী—এ সমস্ত অন্তর বাহ্য চেতনা তুমিই সত্য। অনুভব করাই শ্রুতিতে অনুপ্রবেশ করা বলা হইয়াছে। এ জগৎ শুধু সত্যের যজ্ঞভূমি—প্রাণপ্রকাশ—প্রাণের লীলা-সমুদ্র—চেতনবিলাস।

তবেই কোথাও মিথ্যা নাই—না না নাই—একমাত্র তুমি, চেতনসত্তারূপে, নিত্যপ্রত্যক্ষ আমার অন্তরে; আমার চেতনার অস্তিত্বই তোমার অস্তিত্ব দেখাইয়া দিতেছে। একমাত্র

সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ, সর্ব্বরূপে প্রত্যক্ষ আত্মা তুমিই বিদ্যমান। আমাদের সমস্ত অস্তিত্বই তোমারই অস্তিত্ব। এ বিশ্বের জন্ম-মৃত্যুর নিয়ন্তা বিশ্বরূপী তুমিই। তুমি এ বিশ্ব—এ সমস্ত, এইরূপে তোমাকে দেখা, জানা ও তোমাতেই প্রবেশ করাই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বা সত্যপ্রতিষ্ঠা করা। এইরূপে তোমাকে জানিলেই অভাবের শিখা নিভিয়া যায়, মরণের ভীতি ছুটিয়া যায়, অচিদ্-বোধের অন্ধকার বিলুপ্ত হইয়া যায়, অনাত্মবোধ তিরোহিত হয় —প্রাণময়, জ্ঞানময়, আত্মময় হইয়া যায়—এ সমগ্র আকাশ. পাতাল, শশী, সূর্য্য সমস্ত। তখন তোমাকেই দেখি, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে—তখন তোমাকেই দেখি মনে প্রাণে জ্ঞানে—তোমাকে দেখি আমাতে, আমাকেই দেখি তোমাতে। আর এই রকম দেখিতে দেখিতে সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প হইয়া তোমাকে আপনাতেই বা আপনাকে তোমাতেই ভোগ করিতে করিতে মিশিয়া যায়—যত ব্যবধান, মিশিয়া যায় বোধের যত তরঙ্গ, যত সংজ্ঞা-পরিচিত বোধের আয়তন ; সকল ভাঙ্গিয়া, সকল আয়তন মিলাইয়া যাইয়া একায়তন হইয়া যায়। যাহা থাকে, তাহাই তোমার পরম ধাম, সত্য—তখন বোধেও থাকে অবাঙ্মনসগোচর সত্য।

সুতরাং বোধস্বরূপ ও বোধশক্তিসম্পন্ন সত্যই প্রত্যক্ষে ও অপ্রত্যক্ষে বিরাজিত। এই জ্ঞান ধারণা করিলে তবেই তোমার অনুভূতিও সত্যময় হইবে—কোন মিথ্যাই অনুভূতিতে চন্দ্রে কলঙ্কবৎ অবস্থান করিবে না এবং সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন

সত্যানুভূতিই সত্যভূমিতে জীবকে উত্তোলন করিতে সমর্থ। আত্মাই সত্য, তাঁহার এ জগদ্‌বিলাস সত্য এবং তাঁহাকে লাভ করার উপায়স্বরূপ এই দর্শন সত্য। একমাত্র বোধ বা চেতনাই যাঁহার স্বরূপ ও যিনি চিৎশক্তিসম্পন্ন—তিনিই সত্য। চেতন অচেতন বা আত্ম অনাত্মরূপ বোধবৈচিত্র্য-রচনাশক্তি-সম্পন্ন চেতন আত্মাই রহিয়াছেন—তিনিই সত্য। সেই জন্য সত্যই আত্মানাত্ম সমস্ত। সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম।

সত্যপ্রতিষ্ঠা

সত্যানুভূতি

সর্ব্বঅস্তিত্বময়, বোধময়, প্রাণময় আত্মাই অন্তর ও বাহ্যে রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এ থাকার বিশেষ ফল পাইতে হইলে তিনি যে রহিয়াছেন, এইটা বোধ করিতে হইবে—বোধ করিতে হইবে—তিনি রহিয়াছেন—সর্ব্বত্র রহিয়াছেন। বোধ অনুসারেই আমরা ফল পাই। কিন্তু কোন কিছু একান্ত সত্যরূপে বোধ করা অনুশীলনসাপেক্ষ। বোধ করা মানেই জানা, দেখা, হওয়া। ভগবান্‌ও গীতাতে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন,—"জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং প্রবেষ্টুম্।" আমি এক জন—আমায় দেখিলে আমার মায়ের বুকে পুত্রবোধ ফুটিয়া উঠে, ভ্রাতার বুকে ভ্রাতৃবোধ উজ্জীবিত হয়, স্ত্রীর বুকে স্বামীবোধ জাগে, মিত্রের বুকে মিত্রবোধ ভাসে, আর যাহার যে রকমের বোধ ফোটে, সে সেই প্রকারেই আমার সহিত ব্যবহার করে। সাধুকে আমি ভক্তি করি—তাঁহাকে দেখিয়া আমার সাধুবোধ বিকাশ পায় বলিয়া—চোরকে আমি ঘৃণা করি, তাহাকে দেখিয়া আমার চোরবোধ দীপ্তি পায় বলিয়া। একটী স্ত্রীলোককে দেখিয়া যদি আমি মাতৃবোধ ফুটাইয়া তুলিতে পারি, তবে তাঁহাকে দেখিলে আমার মাকেই দেখা হয়। আর যদি সেই নারীকে দেখিয়া মাতৃবোধ ফুটাইয়া না তুলিয়া নিষিদ্ধবোধ ফুটাইয়া তুলি, তবে আমায়

ভোগলালসাতুর হইতে হয়। বোধের তারতম্যেই ফলের তারতম্য। দ্রোণাচার্য্যকে গুরুরূপে না পাইয়াও একলব্য তাঁহাকে অন্তরে গুরু বলিয়া বোধ করিয়াছিল। আর সেই বোধের ফলে তার গুরুলাভ হইয়াছিল—গুরুর বিদ্যায় অধিকার পাইয়াছিল। স্বামীকে দেবতা বলিয়া বোধ করিয়া সতী স্ত্রী দৈবশক্তি লাভ করেন, যদিও তাঁহার স্বামী বস্তুতঃ দেবতা না হয়। এ শুধু বোধের ফল। সত্য সত্য যদি এ জগৎ আত্মা না হইয়া অন্য কিছু হইত, তাহা হইলেও আমরা সত্যকে লাভ করিতাম—যদি সত্য বলিয়া, আত্মা বলিয়া এ জগৎকে দেখিতাম, বোধ করিতাম। বোধই ফলদায়ক। বোধের জগৎ লইয়াই আমরা বিহার করি। বোধেই আমরা মরি বাঁচি, ঘুমাই, জাগিয়া থাকি। বোধ ভিন্ন আমরা অন্য কিছু—কি বদ্ধ অবস্থায়, কি মুক্ত অবস্থায়—কিছুই ভোগ করি না। বাহিরের জগৎ থাক্ বা না থাক, তাহাতে আমাদের বড় একটা ক্ষতি-বৃদ্ধি হইত না, যদি আমরা জগৎকে বোধে না পাইতাম। আশঙ্কা করিতে পারি যে, বিষ বলিয়া না বোধ করিয়া যদি বিষ পান করি, তাতে কি মৃত্যু হইবে না? না, হইবে না। অজ্ঞাতসারে বিষপান করিয়া তাহার ক্রিয়া যখন আমার উপর হইতে থাকে, তখন সে ক্রিয়া বোধ করি, আর বিষ বা তদ্বৎ মৃত্যুজনক কোন কিছু বলিয়া বোধ করি বলিয়াই বিষক্রিয়া ও মৃত্যু বোধ করি। যদি আমাদিগের এমন ক্ষমতা হয় যে, বোধের বিবর্ত্তন হইবে না, তাহা হইলে আমাদের মৃত্যুতেও মৃত্যু হইত না। এই জন্য

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের মৃত্যু নাই বলে। অর্থাৎ দেহত্যাগ অনিবার্য্য হইলেও তাঁহারা দেহত্যাগ বুঝিতে পারেন না, নিত্য-জীবিত ভাবেই অবস্থান করেন। শুধু তাহাই নহে, প্রাকৃতিক শক্তির উপরও সত্যবোধের আধিপত্য আসে। তিনি ইচ্ছা করিলে জলে মগ্ন হ'ন না, অগ্নিতে দগ্ধ হ'ন না, প্রস্তরপেষণে নিষ্পিষ্ট হ'ন না, বিষপানে তাঁহার মৃত্যু হয় না—বিষ অমৃত হইয়া যায়, অগ্নি শীতল হইয়া যায়, যদি বোধময় আত্মায় কেহ প্রকৃত বিহার করে। প্রহ্লাদের বৃত্তান্ত উপাখ্যান মাত্র নয়। পরমাত্মার বোধে রচিত এ বাহ্য জগৎ—বোধে রচিত এ অন্তর্জ্জগৎ, আমিও তাঁহারই বোধের বিলাস। তাঁহার চেতনা বা বোধশক্তি অনন্ত বৈচিত্র্যময়। এ চিৎশক্তি অপার, অননুমেয়। এই চিৎশক্তিসম্পন্ন আত্মা ভিন্ন আর কোথাও কিছু নাই। তিনি যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন, সে সমস্ত ঈক্ষণ করিয়া বা বোধ করিয়া; আর আমরা যাহা কিছু ভোগ করি, সে সমস্ত তাঁর বোধেরই অনুসারে। তবে পরমাত্মার বোধের ভঙ্গিমা এ জগৎ সাক্ষাৎভাবে স্বাধীনবোধ, আমাদিগের বোধগুলি প্রতিরোধ পরমাত্মার বোধের ছবির প্রতিচ্ছবি। তাঁহার বোধ বিশ্ব রচনা করে, আমাদিগের বোধ—রচনা সচরাচর করিতে পারে না। কিন্তু সৃষ্ট পদার্থ সংগ্রহ করে—আকর্ষণ করে—অধিকার করে আমি যেমন বোধ করিব, তেমনই হইব, তেমনই পাইব, তেমনই ক্ষেত্রে—তেমনই অধিকারে আমাকে আকৃষ্ট করিয়া আমার বোধ লইয়া যাইবে।

গঙ্গাকে গঙ্গা বলিয়া বোধ করিতে না পারিলে গঙ্গা মোক্ষ দেয় না। স্বামীকে স্বামী বলিয়া বোধ না করিলে স্বামীসেবা হয় না। তদ্রূপ জগৎকে সত্য আত্মা বলিয়া—সত্য আত্মার জগৎমূর্ত্তি বলিয়া বোধ করিতে না পারিলে অনবচ্ছিন্ন জগদ্-ভোগী জীবের সত্য আত্মার উপলব্ধি হয় না। জগৎকে মিথ্যা বলিতে গেলে আত্মাকেই মিথ্যা জ্ঞানে আবৃত করা হয়। জগৎকে সত্য বলিলে আত্মায় সত্যের অনুভূতিই ফুটাইয়া তোলা হয়। তিনি বোধ করেন, "আমি বহু হইব"—সঙ্গে সঙ্গে বহু হইয়া যান; তিনি বোধ করেন, "আমি অগ্নি"—অমনি অগ্নিমূর্ত্তি পরিগ্রহণ করেন; তিনি বোধ করেন, "আমি সূর্য্য, চন্দ্র, দেবতা, মনুষ্য, পশু",—অমনি সূর্য্য, চন্দ্র, দেবতা, মনুষ্য-মূর্ত্তিতে প্রকাশ হন। সত্যবোধের ইহাই মহিমা। বোধের সত্যতা বা দৃঢ়তাই এরূপ বৈচিত্র প্রকাশে সমর্থ। মুক্ত পুরুষ বা সত্যলব্ধ পুরুষও এইরূপ সত্যানুভূতির মহিমা ভোগ করিতে পারেন। অবশ্য পরমাত্মার মত জগদ্‌ব্যাপার প্রকাশ করিতে না পারিলেও বহু হইয়া অনন্ত জগতের অনন্ত সম্পদ সম্ভোগ করিতে মুক্ত পুরুষ সমর্থ। সত্যানুভূতিই জগতের ও জীবের বন্ধন ও মুক্তির একমাত্র কারণ।

সত্যানুভূতি ইহাই। কোন বিষয়কে সত্যরূপে বা সম্যক্-রূপে অনুভব করাই সেই বিষয়ের সত্যানুভূতি। সত্যস্বরূপ আত্মার অনুভূতি বা অন্তঃকরণের সত্যনামীয় বৃত্তির অনুভূতিকেও সত্যানুভূতি বলা যায়; কিন্তু আমি সত্য সম্বন্ধে অনুভূতির কথা

এখানে বলিতেছি না—সত্যরূপে অনুভব করার কথাই বলিতেছি। সত্য সম্বন্ধে ওরূপ দৃঢ় অনুভূতিকে সত্যের সত্যানুভূতি বলিতে পার—সে কথা পরে বলিব। এখন সত্যানুভূতির সার্থকতার দৃষ্টান্ত দিই।

রজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া ব্রাহ্মণপত্নী তাঁহার কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত স্বামীকে বেশ্যালয় হইতে ফিরাইয়া লইয়া আসিতেছেন। পথপার্শ্বে সমাধিস্থ মাণ্ডব্য শূলবিদ্ধ হইয়াও ব্রহ্ম-সংলগ্নভাবে অধিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণী অন্ধকারে পথ ভুলিয়া সেই সমাধিস্থ মুনির উপর পতিত হইলেন; সমাধি তাঁহার ভাঙ্গিয়া গেল, শূলব্যথার অনুভূতিতে তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। এই আগত মনুষ্যটী তাঁহাকে আঘাত করিয়াছে ভাবিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইলেন। ব্রাহ্মণীর কাতর অনুনয়, করুণ-পুণ্য আত্ম-কাহিনী যোগচ্যুত মুনির ক্রোধের উপশম করিতে পারিল না; তিনি অভিশাপ দিলেন, "রজনী প্রভাতে তোমার এ হতভাগ্য স্বামীর মৃত্যু হইবে।" সতীর সমস্ত আকুলতা, সমস্ত অনুনয় সমস্ত মর্ম্মদ্রাবী ক্ষমা-প্রার্থনা ব্যর্থ হইল; স্বামীসেবায় সত্যসিদ্ধ তাহার প্রাণ ভিখারিণীর দীনতা প্রকাশ করিয়াও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে—কৃপা পায় নাই—সমবেদনা পায় নাই; তাহার সতীত্বের মহিমা পদাহতা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল—"শোন ব্রাহ্মণ, তবে এ রজনী প্রভাত হইবে না।" সূর্য্য-সংক্রমণ স্তম্ভিত—রজনী প্রভাত হইতেছে না! দেবতাদিগের ভোগ হয় না। মর্ত্তের এই বিপ্লব দেবতাদিগকে নারায়ণ সহ

ঘটনাস্থলে আবির্ভূত করাইল। নারায়ণের একান্ত অনুরোধে, সেই ব্রাহ্মণীর স্বামীর নানা কল্যাণ-প্রাপ্তির প্রতিজ্ঞায় ও নানা কৌশলময় বরদানে অবশেষে ব্রাহ্মণী সম্মতা হইলেন, তবে রজনী প্রভাত হইল। ব্রাহ্মণীর স্বামী রূপ, গুণ, যৌবন, বিদ্যায় ভূষিত হইয়া, মুহূর্ত্তের মৃত্যু অতিক্রম করিয়া নবজীবন লাভ করিল।

এক দিকে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ মাণ্ডব্য মুনি; তাঁহার বাক্য অব্যর্থ। কিন্তু অন্য দিকে অবলা, ব্রহ্মজ্ঞানহীনা এক স্বামী-পরায়ণা নারী; সে ত ব্রহ্ম জানে না, সমাধি জানে না; যোগসিদ্ধা, আত্মবিভূতিসম্পন্না নহে; তাহার বাক্য কেমন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের বাক্যের তুল্যবল হয়? কোন্ শক্তিবলে সঞ্জীবিত হইয়া একটী অবলা স্ত্রীলোকের মুখের কথা সূর্য্যের গতি রুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল? মাত্র স্বামিসেবা, স্বামিপরায়ণতা। কিন্তু এ ত অসংখ্য স্ত্রীলোকেই দেখা যায়, তাঁহাদের বাক্যে এ বীর্য্য নিহিত দেখা ত যায় না? কোথায় প্রভেদ—সাধারণ স্বামিপরায়ণা স্ত্রীলোকে, আর সেই ব্রাহ্মণ-পত্নীতে?

ব্রাহ্মণীর বাক্যের এ বীর্য্য সত্যবোধ-প্রসূত। স্বামিসেবা সকল স্ত্রীলোকেই করে, কিন্তু করার মত করে না, অর্থাৎ স্বামী সে সত্য সত্য সর্ব্বতোভাবে স্বামী, এ কথাটা জানা থাকিলেও, স্বামীর সর্ব্বতোভাবে তৃপ্তিসাধনই যে তাহাদের আত্মার একমাত্র তৃপ্তি, এ কথাটা বোঝা থাকিলেও, সাধারণ নারী সেটার সর্ব্বতোভাবে বোধ করে না—বোধে ফুটাইয়া রাখে না,

জীবনটাকে সর্ব্বতোভাবে ঐ জ্ঞানের ছাঁচে ঢালিয়া দেয় না অর্থাৎ তাহারা উঁহাতে সত্য-প্রতিষ্ঠা করে না, সেই জন্য তাহাদিগের ওই জ্ঞান বীর্য্যহীন। ব্রাহ্মণ-পত্নীর ঐ জ্ঞানে সত্য-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ঐ জ্ঞানকে সত্য বলিয়া জানিয়াছিল, মানিয়াছিল, ঐ জ্ঞানকেই জীবনে সর্ব্বাঙ্গীন ব্যবহারময় করিয়া তুলিয়াছিল। সতীচরিত্র সত্যবোধের দৃষ্টান্ত।

পূর্ব্বে সত্যের বল কথায় কথায় পরীক্ষা হইত। সীতার অগ্নিপরীক্ষা সত্যবলের দৃষ্টান্ত। চৌর্য্য অপরাধে আনীত পুরুষের হস্তে অগ্নিময় লৌহদণ্ড দেওয়া হইত, নির্দ্দোষী পুরুষের হাত তাহাতে দগ্ধ হইত না। আজও অনেক নির্দ্দোষী পুরুষ চৌর্য্যাপরাধে ধৃত হয়; কিন্তু তাহাদিগের হস্তে তেমনি করিয়া অগ্নিময় লৌহদণ্ড দিলে দগ্ধ না হইয়া বোধ হয় পরিত্রাণ পায় না। ইহার কারণ, তখনকার পুরুষেরা সত্যের অনুশীলন করিত, সত্য বোধটাকে নানা দিক্ দিয়া সজীব করিয়া রাখিত; এখন সত্যের সে অনুশীলন নাই—সত্যবোধের সেবা আজকাল বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বে আহার বিহারাদি সাধারণ কার্য্যসকল করিতেও একটা সত্য সঙ্কল্প, একটা সার্থকতার জন্য সত্যজ্ঞান উজ্জীবিত করিয়া তবে হিন্দুরা সম্পন্ন করিত; প্রায় কোন কাজই মরার মত বা "করিতে হয় করিতেছি" এ ভাবে করিত না। এখনকার লোক সে দিকে দৃষ্টি রাখে না এবং সেই জন্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়াও সম্যক্ ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

দ্রোণের মৃণ্ময়ী প্রতিমা বা এ ব্রাহ্মন-পত্নীর স্বামী কোন শক্তিসম্পন্ন না হইলেও সত্যবোধই ঐরূপ অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছিল ; ইহা ভুলিবে না।

সত্য বোধ কর, সত্যবোধ করা দুরূহ নহে। সত্যবাদিতা সত্যবোধের অঙ্গ হইলেও সত্য ভিন্ন মিথ্যা না বলাই যে সত্য-বোধ, এমন মনে করিও না। লৌকিক ঋষির মত বাক্য সত্যের অনুগামী করা প্রয়োজনীয় হইলেও সত্যবোধ প্রসঙ্গে সে কথা বলিতেছি না। সত্যবাক্য কথন সত্যবোধের একান্ত সহায়ক ; এমন কি, সত্যবোধসিদ্ধির প্রধান উপায়। কিন্তু যদি তাহা না পার, তবু হইতে পারে—যদি তোমার অভীষ্ট চিন্তাটি সম্বন্ধে ভাব যে, "যাহা বলিতেছি—যাহা ভাবিতেছি—ইহা সত্য, নিশ্চয়ই সত্য"—সত্যবোধ এইরূপ। সত্যানুভূতি এই প্রকারে উজ্জীবিত করিতে হয়।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ বা সুখ, দুঃখ, প্রীতি, দ্বেষ বা অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশ বা সত্য মিথ্যা, সমস্ত বোধেরই জিনিষ বোধেরই প্রকারান্তর মাত্র। শব্দমাত্রের দ্বারা আখ্যাত যাহা কিছু বা যাহা কিছু বোধগম্য হয় বা বুঝি, সে সমস্ত আমাদের বোধের উপাদানে গড়া। "বুঝিলাম" বলিলে বোধ উপাদানে গঠিত কিছু পাইলাম, এইটাই ঠিক মানে। ব্যবহারিক জগতে বা বাহিরে যাহা কিছু আছে, সেইগুলি যে ভাবে আমাদের বুকে বোধ ফুটাইয়া দেয়, তদনুসারে তাহাদের নামকরণ হয়। বাহিরের একটা ফুল আমার নাসারন্ধ্রে ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে উদ্রিক্ত করে ও একটা

সুগন্ধবোধ আমাদের বুকের ভিতরে জাগাইয়া দেয় বলিয়া আমরা ফুলটাকে সুগন্ধ ফুল বলি। বাহিরের একটা ফল আমার রসনাকে উদ্রিক্ত করে ও মিষ্টতাবোধ ফুটাইয়া দেয় বলিয়া আমরা সেই ফলটাকে সুমিষ্ট বলি। যেমন বাহিরের একটি সূচী আমার অঙ্গ বিদ্ধ করিলে আমার অন্তরে বেদনা জাগাইয়া দেয়, সে বেদনা স্থচে থাকে না—আমার অন্তরেই ছিল এবং অন্তরেই জন্মে; শব্দস্পর্শাদি, রূপ, রস, গন্ধাদি সমস্তই তদ্রূপ অন্তরে আছে এবং অন্তরেই জাগে। রূপ, রস, শব্দ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাহা কিছু, সবটার বেলাতেই ঐ একধারা। আমাতে যেন বোধ বলিয়া একটা সমুদ্র আছে; বাহির হইতে যেমন ঢেউ আসিয়া তাহাতে লাগিতেছে, সেই রক্রমেরই একটা ঢেউ আমাতে উঠিতেছে, আর আমরা সেই রকমটার একটা একটা আখ্যা দিতেছি বা যে ভাবের ঢেউ উঠিতেছে, বাহিরেরটাকে সেই ভাবের ঢেউ বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। অর্থাৎ যেটা একটা রূপের ঢেউ তুলিতেছে, সেইটাকে আমরা নাম দিতেছি রূপ, যেটা একটা শব্দের ঢেউ তুলিতেছে, সেইটার নাম দিতেছি শব্দ।

কথাটা আর একবার বলি।—আমি রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, অথবা জগৎ বা জগদ্ধর্ম্ম বলিয়া যাহা অনুভব বা বোধ করিতেছি ও যাহা কিছু লইয়া মাতিয়া আছি, সেইগুলি আমারই বোধের নানা আকারের ভঙ্গিমামাত্র বা আত্মধর্ম্ম মাত্র—এটা বেশ ভাল করিয়াই আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। আমি মাতিয়া

আছি আমার বোধ লইয়া; আমি জাগিতেছি, ঘুমাইতেছি, জন্মাইতেছি, মরিতেছি,—আমার বোধে। আমি আমার বোধে গড়া স্ত্রীতে মত্ত হইতেছি, পুত্রকে কোলে করিতে যাইয়া বোধে-গড়া ছেলেকেই আঁকড়াইয়া ধরিতেছি, শত্রুকে মারিতে গিয়া আমার বোধে-গড়া শত্রুকেই তাড়া করিতেছি। মৃত পিতার তর্পণ করিতে গিয়া আমি আমার বোধে গড়া পিতারই তর্পণ করিতেছি। আর বাহিরের যে স্ত্রী, যে পুত্র, যে শত্রু, যে পিতা আমার বোধকে স্ত্রী, পুত্র, শত্রু ও পিতার আকারে গড়িয়া তুলিয়াছিল, অথবা আমার ভিতরে বোধের স্ত্রী, বোধের পুত্র, বোধের শত্রু, বোধের পিতা ফুটাইয়াছিল—বাহিরের তাহারাও পরমাত্মার বোধেতেই অবস্থিত, পরমাত্মার বোধেরই পুতুল; কেন না, বাহ্য বলিয়া যাহা বুঝি, তাহা পরমাত্মার বোধেরই রূপান্তর; অন্তর্বাহ্য সমস্তই বোধ। তবে আমার বোধকে নানা আকারে ফুটিতে দেখিয়া বাহিরে জগৎ আছে, অবশ্যই স্বীকার করি। বোধের জগৎ ভোগের সঙ্গে সঙ্গে তাহাই যেন ভোগ করা হয় এবং সে জগৎ পরমাত্মার বোধ গঠিত বলিয়া পরমার্থতঃ বোধ ভিন্ন কোথাও কিছুই নাই।

তাহা হইলে আমার ভিতরে ও বাহিরে যাহা কিছু পাইলাম তাহার সত্য নাম বোধ। আর তেমনই বাহিরের জগৎটাও একজনের বোধ, একজনের লীলা, সত্য কল্পনা—আর এ অন্তর বাহির যিনি, তিনিই ব্রহ্ম।

সত্য মিথ্যা, এই দুইটীই তদ্রূপ বোধের তারতম্য বা

বোধেরই দুই রকম আকার। কিন্তু আর একটা কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে। এই যে বাহিরের জগৎ আমাদের বোধকে নানা রকমে গড়িতেছে, ভাঙ্গিতেছে, কখনও প্রিয় বা ঈপ্সিত বোধ, কখনও অপ্রিয় বা অনীপ্সিত বোধ ফুটাইয়া তুলিতেছে, এ বোধাবর্ত্তনে যদি আমরা সর্ব্বদা আমাদের প্রিয় বা ঈপ্সিত বোধকেই ফুটাইয়া রাখিতে চাহি, তাহা হইলে দুই রকমে আমাদিগকে তাহার জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে। প্রথম, আমার সেই ঈপ্সিত বোধের ছবিটি সর্ব্বদা বুকে ফুটাইয়া রাখিয়া দিতে হইবে, আর দ্বিতীয়, বাহিরের জগৎ হইতে যেখানে সেই রকম বোধ ফুটাইবার তরঙ্গের অনুকূল স্রোত পাইব, সেইখানে সেইখানেই চক্ষু ফেলিতে হইবে, তাহার প্রতিকূল বোধ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। অথবা যদি সম্ভব হয়, তবে বাহিরের সকল ঢেউগুলিকেই অনুকূল ঢেউ করিয়া তুলিয়া লইতে হইবে। কার্য্যতঃ আমরা চেষ্টার সাহায্যে এইটাই বুঝিতে পারি, যে যতক্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সজীব থাকে, ততক্ষণ তাহারা তাহাদের মত ঢেউ আনিবেই আনিবে, অর্থাৎ চক্ষু রূপবোধ ফুটাইবে, কর্ণ শব্দবোধ ফুটাইবে, জিহ্বা রসবোধ ফুটাইবে, বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান ফুটাইবে ইত্যাদি।

এখন দেখা চাই—আমাদিগের সত্য বোধ। যতক্ষণ শরীরের বোঝা বহিতে হইবে, ততক্ষণ বাহিরের জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ছুটিবে না, এইটা খুব পাকা কথা। আর ততক্ষণ ইন্দ্রিয়-গুলি তাহাদের স্বভাবমত ঢেউ আনিবেই আনিবে। যদি আমার

প্রিয় বা ইপ্সিত সত্যবোধ সর্ব্বদা পাইতে হয়, ভোগ করিতে হয়, বুকে ধরিতে হয়, তবে বাহিরের ইন্দ্রিয়-বাহিত ঐ ঢেউ-গুলিকে "সত্য" ঢেউ বা "সত্যের" ঢেউ বলিয়া ধারণা করিতে হইবে। যদি মিথ্যা বা বিরুদ্ধ দেখি বা সত্য নয় বলি, তাহা হইলেই মিথ্যাবোধ ফুটাইয়া তোলা হইল, সত্যবোধের অপলাপ করা হইল বলিতে হইবে। আর এই সত্য চাওয়া বা সত্য পাওয়া মানেই, যে কোনও রকমে সত্যবোধে জাগিয়া থাকা ভিন্ন কিছু নহে। বিশেষতঃ সত্য বলিয়া যাঁহাকে আমরা ডাকিতেছি, খুঁজিতেছি, তিনি ঐ বোধস্বরূপই বা তাঁহার ধর্ম্ম—বোধ। ইন্দ্রিয় যত কিছু বোধই আমাতে ফুটায়, সে সবগুলিই যখন বোধ, আর সেই বোধস্বরূপই যখন আমাদিগের ঈপ্সিত, তখন বিষয়ের চিন্ময়ত্বের দিকে চাহিয়া, তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে করিতে যাওয়াই ঠিক পথ। আর মাত্র নামরূপের দিকে চাহিয়া ও সেই নামরূপকে মিথ্যা মিথ্যা বলিতে গেলে একটা মিথ্যা আকারের আবর্ত্তন রচনা করা হইবে। বিশেষতঃ যখন নামরূপ, এইগুলিও বোধ ভিন্ন আর কিছু নহে এবং সেইখানেও সত্য ভিন্ন মিথ্যা কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শোন ঋষির বাণী—"তদেতৎ ত্রয়ং সৎ একম্, অয়মাত্মা একঃ সন্ এতৎ ত্রয়ং, তদেতদমৃতং সত্যেন ছন্নং প্রাণো বা অমৃতং নামরূপে সত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ছন্নঃ।"—বৃহদারণ্যক। নাম রূপ কর্ম্ম—সৎ আত্মারই প্রকাশ মাত্র—তাঁহারই সত্য মূর্ত্তি।

সেই জন্য ঋষি আরও স্পষ্ট করিয়া সত্য দর্শনের নির্দ্দেশ

করিয়াছেন। পরিণামময় জগদ্‌বিবর্ত্তন দেখিয়া যে অনিত্যতা, যে অনৃতত্ব আমাদের বোধের চক্ষে ভাসিয়া উঠে, তাহাও প্রবাহ আকারে নিত্য ও সত্য বলিয়া ঋষি সত্যদর্শনের জন্য সত্য শব্দের এইরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"স ইত্যেকমক্ষরং তীত্যেক-মক্ষরং যমিত্যেকমক্ষরং প্রথমোত্তমে অক্ষরে সত্যং মধ্যতোঽনৃতং তদেতদনৃতমুভয়তঃ সত্যেন পরিগৃহীতং সত্যভূয়মেব ভবতি নৈনং বিদ্বাংসমনৃতং হিনস্তি।"—বৃহদারণ্যক। সত্য শব্দের আদি অক্ষর 'স' অর্থ সত্য, মধ্য অক্ষর 'ত' অর্থে অনৃত এবং শেষ 'য' অর্থ নিয়ামক। মধ্যের সাময়িক মিথ্যাবোধ, আদ্যন্তের উভয়তঃ সত্যবোধের দ্বারা পরিগৃহীত। সুতরাং এ জগৎকে সত্যময় বলিয়াই দেখিবে, এ জগৎ সত্যবহুল ; যে সত্যময় দর্শন করে, মিথ্যা তাহাকে হনন করে না। বিন্দুমাত্র মিথ্যাদর্শন অবভাসিত হইলেও সেইটুকু মৃত্যুপ্রবেশের রন্ধ্র। যাহারা জগৎকে মিথ্যা বলিয়া দেখিতে উপদেশ দেয়, তাহারা আদিতে বা মূলে সত্য দর্শন করিলেও অন্তে মিথ্যা দর্শনের জন্য মিথ্যাতেই লয় হয়।

সার কথা—সত্যবোধ বুকের ভিতর ফুটাইয়া রাখিতে হইলে এ জগৎকে সত্য বলিয়াই দেখিতে হইবে—মিথ্যারূপ বিশিষ্ট-তাকেও সত্যেরই রূপান্তর বলিয়া, সত্যসাধনায় সত্যমগ্ন হইয়া থাকিতে হইবে এবং সে অনুভূতিকে একলব্যের মত, সীতার মত, ব্রাহ্মণপত্নীর মত সত্যানুভূতি করিয়া তুলিতে হইবে।

ঋষিরা ছিলেন এ সত্যসিদ্ধির জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁহারা যাহা ভাবিতেন, যাহা বলিতেন, তাহাই হইত, হইতে বাধ্য।

ঋষি দুই প্রকার—লৌকিক ঋষি ও আছ্য ঋষি। যাঁহারা সত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়েন অর্থাৎ সত্য ভিন্ন বলিব না, সত্য-পথ হইতে, সত্য-সেবা হইতে চ্যুত হইব না—মিথ্যার দিক্ দিয়া চলিব না, এই ভাবে যাঁহারা আপনাদিগের চেতনাকে অনুশাসিত করিয়া জগতে বিচরণ করিতেন, সেই সত্যসেবী ঋষিরা লৌকিক ঋষি। আর যাঁহারা সত্য মিথ্যা বিচারের বহিভূর্ত, নির্ব্বিচার ভূমা সত্যবোধে সংসিদ্ধ, তাঁহাদিগকে বলিত আছ্য ঋষি। আছ্য ঋষি অর্থেই সত্যবোধ-সিদ্ধ ঋষি। সত্য মিথ্যা, সম্ভব অসম্ভব, এ সব বিচার তাঁহাদিগের প্রাণে খেলে না। যাহা ভাবিব যাহা বলিব, তাহাই হইবে—কেমন করিয়া হইবে বা, হইতে পারে, তাহা তাঁহাদের লক্ষ্য নহে। লৌকিক ঋষি শাস্ত্রবিধান, কর্ম্মজনিত পুরুষকার ও অদৃষ্ট কর্ম্মসংস্কার, এই সকলের সমন্বয় ও গণ্ডীর মধ্য দিয়া সত্যের অনুধাবন করেন। আছ্য ঋষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সত্য ধাবিত হয়। কোন বিধান, কোন কর্ম্ম বা কর্ম্মফলাধীনতা তাঁহার সত্যবোধকে সঙ্কুচিত করিতে পারে না। তিনি যদি রাত্রিকে বলেন দিবা তবে রাত্রি দিবারূপেই প্রতিপন্ন হইবে। ঋষিবৃন্দের অলৌকিক শক্তির যে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পুরাণাদিতে জানিতে পারা যায়, সে শক্তি এই সত্যবোধ-সিদ্ধিরই ফল। সত্যকাম সত্য-সঙ্কল্প, এই সকল ঋষি মাত্র জগদ্ব্যাপার ভিন্ন যাহা ইচ্ছা করিতে পারিতেন। ঋষির আশীর্ব্বাদ অন্ধকে চক্ষুদান করিতে পারে, মৃতকে প্রাণদান করিতে পারে, পাপীকে পুণ্যময় করিতে পারে, দরিদ্রকে রাজ-

রাজেশ্বর করিতে পারে। ঋষির অভিশাপ দেবতাকেও পশু-যোনিতে নিক্ষেপ করিতে পারে। তোমরা বহু অখ্যায়িকা এ সম্বন্ধে জান। আমি শুধু লক্ষ্য করিতে বলিতেছি, বোধ কত দৃঢ়তা লাভ করিলে এরূপ অঘটন ঘটাইতে সমর্থ হয়—বোধের সেই গভীরতা, সত্যবোধের সেই অবিচলতা। সত্যবোধ কত ঘনীভূত, কত সত্য হইলে, তবে তোমার আমার মত একজন মনুষ্য জগৎনিয়মকে পদদলিত করিয়া, আপনার সঙ্কল্পের শিরে সার্থকতার নিত্যসিদ্ধ মুকুট পরাইতে পারে। কোন্ সত্যভূমিতে চেতনাকে প্রতিষ্ঠা দিতে পারিলে আমাদিগেরই মত একজন মনুষ্য দেবতাদিগেরও উপর আধিপত্য করিতে, তাঁহাদিগের অনুশাসন অবনমিত করিতে সক্ষম হয়? সে ভূমি কি আমা-দিগের মত দুর্ব্বলচিত্ত, ক্ষীণপ্রাণ, বাসনার দাস, ইন্দ্রিয়সেবী, মনুষ্য নামের অযোগ্য মনুষ্যের পক্ষেও লাভ করা সম্ভব?

সম্ভব—অবশ্য সম্ভব, যদি আমরা সত্যবোধ অনুশীলন করি। আরও অধিকতর সম্ভব, অধিকতর সহজভাবে তাহা লভ্য হয়। যদি আমরা জগতের পরম সত্যে সে সত্যবোধের প্রতিষ্ঠা দিই। যে মহান্ সত্য আত্মা সর্ব্বান্তরে বিরাজ করেন, সেই সত্যে সত্যবোধ ফুটাইয়া তুলিলে মনুষ্য, মহিমায় দেবতারও আকাঙ্ক্ষিত আসন লাভ করিতে সক্ষম হয়। আমি সেই কথা এইবার বলিব।

কোন ভাববিশেষ সত্য করিয়া তুলিতে হইলে, সেই ভাব-বিশেষের সত্যতার অনুকূলে যত কিছু, তাহাই জানিবে, মানিবে

এবং স্বীয় ব্যবহারকেও তদনুসারে পরিচালিত করিতে হইবে। অচর পরম সত্যে সত্য-বোধ সম্বুদ্ধ করিতে সমস্ত বিশ্ব সম্বন্ধেই সত্যবোধ ও সত্য ব্যবহারময় হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। সত্যবোধের ইহাই উপজীব্য। কিন্তু সত্যশব্দের যে সাধারণ ধ্রুব অবিচল ভাবাত্মক অর্থ, সেই অর্থ বা জ্ঞান লক্ষ্য করিয়া সত্য শব্দের উপর সত্যবোধ করা অভ্যাস থাকিলে তবেই সত্যবোধ-সিদ্ধির প্রধান অনুশীলনটী করা হয়, এবং ইচ্ছামত ভগবদুদ্দেশ্যে বা তুচ্ছ কামনা উদ্দেশ্যে সে সত্যবোধকে ব্যবহার করিতে পারা যায়। এই জন্য সত্যশব্দ অবলম্বন করিয়া তাহার মিথ্যাত্ব ও পরিবর্ত্তনীয়তাদির বিপরীত ভাব-বোধক যে সাধারণ অর্থ, সেই অর্থ মনে করিয়া, তাহা বোধ করিতে চেষ্টা করিবে। সত্য শব্দের সত্যানুভূতি ফুটাইয়া তুলিবে। এ কথা মন্ত্রচৈতন্য বলিবার সময় বিশদভাবে বলিব।

সত্যে সত্যবোধ

বা

ধ্রুব জ্ঞান

শুধু সাধারণ বিষয়ে সত্যবোধ সংসিদ্ধ হইলে যদি পূর্ব্বোক্ত-রূপ অলৌকিক ফল সকল পাওয়া যায়—যদি সে কোন ক্ষুদ্র বিষয়ে সত্যানুভূতি এইরূপ মহিমা প্রকাশে সমর্থ হয়, তবে

যিনি নিজে সত্য—সাক্ষাৎ সত্যই যাঁহার স্বরূপ—সেই সত্য পরমাত্মায় এই প্রকার সত্যানুভূতি সম্বুদ্ধ হইলে, তাহার ফল আরও কত অলৌকিক—কত মহিমময় হইতে পারে ? কোন বাহ্য বিষয়ে প্রাণের ভাববিশেষ সত্য বলিয়া ধারণা করিলে তাহাতেও সত্যানুভূতি ফুটে, আবার এই সমস্ত জগৎকে সত্য সত্যই সত্যস্বরূপ পরমাত্মার মূর্ত্তি বলিয়া ধারণা করিলেও সেইরূপ সত্যানুভূতি ফুটাইয়া তুলা যায়। আবার নিজ অন্তরের চেতনাসত্তাকেও সত্য বলিয়া ধারণা করিলে তদ্রূপই সত্যবোধ ফুটিয়া উঠিতে পারে। তবেই যাহারা সত্যান্বেষী, তাহারা সর্ব্বত্র সত্য অনুভূতি ফুটাইয়া তুলিতে—সর্ব্বত্রই সত্যকেই দেখিতেছি—জানিতেছি, এইরূপ ধারণা উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়াস করিবে ; আর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখিবে, সে অনুভূতি সত্য হইতেছে কি না, সে অনুশীলনে মাত্র একটা ভাবের নকল করা হইতেছে অথবা সত্য সত্যই যাহাকে সত্য বলিতেছি, তাহাতে সত্যধারণা সত্যই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, সত্য বলিতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝায়। "সত্য" এই শব্দের দ্বারা বিশ্বাত্মাকেই বুঝিতে হয়। তাঁহার যে অচল সনাতন অস্তিত্ব—এ বিশ্বের ও আমার সমস্ত সত্তার আশ্রয়—শত মিথ্যা ভাবে আবর্ত্তিত হইলেও এ বিশ্ব, অথবা "আমি" কেহ যে তাঁহার সে সত্তা হইতে কখনও বিচ্যুত হইতে পারি না ও হইব না, সেই সত্তাই যে সকলকার একমাত্র সত্য আশ্রয়,—আমার চেতনাশক্তিরও সেই সত্তাই যে আশ্রয় অর্থাৎ

তাঁহারি চেতনাশক্তিই আমার চেতন ও চেতনার যত প্রকার বিষয়-রূপ বৈচিত্র্য, সমস্তের মূল—সুতরাং সেই চেতনসম্পন্ন বা চিন্ময় আত্মাই একান্ত ভাবে সকলকার সত্য আশ্রয়—সত্য শব্দের দ্বারা এই রকম স্থূল অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্তু একেবারে এইরূপ ব্যাপক ভাব না ফুটিলেও অবিচল, অপরিবর্ত্তনীয়, সনাতন সংস্থান, এইরূপ ভাব সত্য শব্দের দ্বারা প্রধানভাবে ফুটে। আর সেই রকম ভাব যদি সত্যস্বরূপ পরমাত্মার সম্বন্ধে আসে, যদি তোমার দৈনন্দিন সাধারণ জীবন-ব্যবহারের ভিতর দিয়া দেখিতে পাও যে, পরমাত্মা রহিয়াছেন, এবং তাঁহার অস্তিত্ব মানিতে মানিতে তুমি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতেছ, তবেই বুঝিবে, তোমার সত্য সম্বন্ধে সত্যানুভূতি হইতেছে।

যাহা বলিতেছি, জানিতেছি বা ভাবিতেছি, এটা যে একান্তই সত্য, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ সংশয় বিচার কখনও উঠিতে পারে না বা উঠিতে পারে বলিয়া ধারণাই আইসে না, এই আকারের বোধকে বলে সত্যবোধ ; আর যিনি সত্য, তাঁহার সম্বন্ধে ঐ রকম অনুভূতি ফুটাইয়া তুলিতে পারিলেই, সত্যে সত্যানুভূতি হইতেছে বলা যায়। "সত্য সত্যই আমি সেই পরমাত্মার আশ্রিত—সত্য সত্য তিনিই আমার আত্মা—আমার সর্ব্বস্ব সত্যই, আমি তাঁহারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—সত্যই আমি জগৎ বলিয়া, চন্দ্র সূর্য্য ধরিত্রী বলিয়া, আকাশ বায়ু অগ্নি জল ভূমি বলিয়া, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বলিয়া, সুখ দুঃখ শীত গ্রীষ্ম বলিয়া যাহা কিছু জানিতেছি, বুঝিতেছি, এ সমস্ত অনুভূতি

আমার চেতনারই সত্য অনুভূতি, আমার আত্মারই মূর্ত্তি; তাঁহাকেই দেখিতেছি, জানিতেছি, বুঝিতেছি—অহো! আমি তাঁহাকে লইয়াই সর্ব্বকর্ম্মে সর্ব্বভাবে মত্ত রহিয়াছি—একমাত্র সত্যই তিনি, তাঁহারই এই সব রূপ, তিনি এ সকল প্রকাশ করিতেছেন—আমার ভয় নাই, মৃত্যু নাই, আমি সত্যসংস্থ”—এই প্রকার অনুভবই সত্যে সত্যানুভূতি। আমি অচেতন পৃথিবীর বক্ষে অবস্থিত নহি—এ পৃথিবী চিন্ময়ী সত্য, আমি পৃথিবীরূপ চিন্ময় সত্যের বক্ষে অবস্থিত—অচেতন জল আমায় জীবন দিয়া আপ্যায়িত করিতেছে না—ইহা জলমাত্র নহে, সেই অবিচল চিন্ময় সত্যই আমায় জলরূপ ধরিয়া আপ্যায়ন করিতেছেন—ইহা অচেতন অগ্নিমাত্র নহে—সত্যই অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়া রহিয়াছেন—আমাকে তেজোময় বাঙ্ময় করিয়া রাখিয়াছেন—বায়ু—বায়ুমাত্র নহে—এ আমার সত্যেরই পুণ্য পরশ; এ শব্দ-ব্যঞ্জনা আমার সত্য আত্মারই শব্দময় বিকাশ—এ দিগন্ত-বিস্তার গগন সত্যেরই বিস্তার; ওগো, আমার অন্তরে এ ইন্দ্রিয়, এ মন, এ প্রাণ, এ বুদ্ধি, এ চৈতন্য, এ সেই সত্য—সেই সর্ব্বান্তর, সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ সত্য, যে সত্যে আমি নিত্য-প্রতিষ্ঠ”—সত্যে সত্যানুভূতি এই প্রকার।

এই অনুভূতি গাঢ়তর কারয়া তুালতে হহবে। সমস্ত সংশয় সন্দেহ ইহার অঙ্গ হইতে বিদূরিত করিতে হইবে। এমন অবস্থায় এই অনুভূতিকে তুলিয়া লইতে হইবে—যে অবস্থায় আর বিচার পর্য্যন্ত উঠিবে না, সহজ স্বাভাবিক জগদনুভূতির মত

এ অনুভূতি সত্য হইবে—সমগ্র বিশ্বচেতনা তাহার বিরুদ্ধে ঘোষণা যদি করে, তবুও এ অনুভূতি অচল অটল হইয়া দীপ্তি পাইতে থাকিবে; তবেই জানিব, সত্যে সত্যানুভূতি সংসিদ্ধ হইয়াছে।

আবার বলি, কোন বোধ অবিচল হইয়া স্বাভাবিক সত্যতায় পরিণত হইলে তাহাকে বলে সত্যবোধ। আর সত্যস্বরূপ বোধশক্তিসম্পন্ন সর্ব্বআশ্রয় আত্মায় তদ্রূপ বোধ প্রতিষ্ঠা হইলে তাহাকে বলে সত্যে সত্যবোধ বা সত্য-প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু এই সত্যে সত্যবোধ করিবার সময় বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে, কাহাকে সত্য বলিতেছ; তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ কি। সত্যবোধ করিতে গিয়া এই ভুলটি অধিকাংশ সময় হইয়া পড়ে। সত্যবোধ হয় ত করিতেছ; কিন্তু কাহাকে সত্য বলিতেছ, কে সেই সত্য, তোমার সহিত তাহার সম্বন্ধ প্রধানতঃ কি, সেটির দিকে লক্ষ্য থাকে না—কাজেই শুধু সত্যবোধই হয়; কিন্তু সত্যে সত্যবোধ করা হয় না। সত্য সত্য তোমার যিনি আত্মা অর্থাৎ তুমি বা তোমার "অহং" বোধ যাহাতে জন্মিয়াছে, যাহাতে অবস্থান করিতেছে—সত্যই একান্ত-ভাবে অবস্থান করিতেছে—যাহার অস্তিত্বটি তুমি স্বীয় অস্তিত্ব-রূপে ভোগ করিতেছ, সেই একান্ত চিৎশক্তিসম্পন্ন চিন্ময় আত্মাই সত্য এবং আমার সেই আত্মাকেই সত্য বলিতেছি ও তাঁহারই এ বিশ্বমূর্ত্তি দেখিতেছি—এ জ্ঞানটি ঠিক করিয়া ধরিয়া রাখিয়া, তাহাতেই সত্যবোধ ফুটাইবার চেষ্টা করিবে।

তোমরা ধ্রুবের উপাখ্যান জান? নারদ তাহাকে এই সত্যে সত্যবোধ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। যাহা কিছু দেখিতেছ, এ সমস্তই তোমার পদ্মপলাশলোচন হরির মূর্ত্তি। তুমি সর্ব্বত্র তাঁহাকেই দেখিতেছ; তোমার সম্মুখে যাহা দেখিবে, তাহাকেই তোমার পাদ্মপলাশলোচন হরি বলিয়াই বুঝিবে। তাই সে ধ্রুব-জ্ঞানে সচেতন ধ্রুব শিশু বিপুল অরণ্যে ব্যাঘ্র সিংহ যাহা দেখিত, তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিত,—"কে আসিলে—ওগো তুমি কি আমার পদ্মপলাশলোচন হরি?" সে শার্দ্দুলের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিত, সিংহের মুখ চুম্বন করিত, পক্ষীর কূজনে তাহার হরি ডাকিতেছে বলিয়া উত্তর দিত। সে আকাশে দেখিত তাহার পদ্মপলাশলোচন, বৃক্ষে দেখিত 'পদ্মপলাশলোচন, তৃণে পুষ্পে ভূমিতে—সর্ব্বত্র সে দেখিত তাহার অন্তরের ধন পদ্ম-পলাশলোচন। তার ধ্রুব-জ্ঞানের পদ্মপলাশলোচনে—পদ্মপলাশ লোচনই জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ফুটিয়া উঠিত রে! এই মহা-জ্ঞানই যে পদ্মপলাশলোচন। তাই সে পদ্মপলাশলোচন ধ্রুবের নয়নে ধ্রুব-পদ্মপলাশলোচনই অহরহ দেখা দিয়াছিল। আর শেষে তাহাকে বক্ষে লইয়া লোকলোচনের সর্ব্বোচ্চ সীমায় সে পদ্মপলাশলোচন হরি তার প্রাণের মহাজ্ঞানী পদ্মপলাশ-লোচন ধ্রুবকে ধ্রুবলোক রচনা করিয়া দিয়াছিল।

সত্যে সত্যবোধ বা এ বিশ্ব সত্যেরই মূর্ত্তি—এই জ্ঞানে সত্য-প্রতিষ্ঠা করাই—ধ্রুবজ্ঞান। অধ্রুব অনিত্য মিথ্যা জ্ঞানে জগৎ দেখিলে এই ধ্রুবজ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। প্রত্যক্ষ

বিশ্বকে প্রত্যক্ষ ধ্রুব-সত্য ঈশ্বর জ্ঞানে দর্শন কর
কর—ঋষির এ ধ্রুবদৃষ্টি তোমাদিগের জ্ঞানচক্ষুকে পদ্মপলাশ-
লোচন করিয়া দিবে। তোমাদের চক্ষে সে পদ্মপলাশলোচন
চক্ষু মিলাইয়া সর্ব্বদা তোমায় তাহার ধ্রুবলোকের দিকে আকর্ষণ
করিবে।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যতি ॥—গীতা।

যে সর্ব্বত্র আমাকে দর্শন করে, সমস্তকে আমাতেই দর্শন
করে, তাহার চক্ষের অন্তরাল আমি কখনও হই না। সেও
আমার চক্ষের অন্তরাল কখনও হয় না—এ মহাবাক্য সেই
পদ্মপলাশলোচনেরই অমৃত-গাথা।

সত্য-প্রতিষ্ঠা

——:•:——

বাহিরে ও অন্তরে

আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সারা বিশ্বটা ব্রহ্মের যজ্ঞাগার, ঋষিরা এ কথা বার বার বলিয়া গিয়াছেন। একটা ধূলিকণার সঞ্চালন হইতে সমগ্র বিশ্বের বিবর্ত্তন পর্য্যন্ত সবটাই যেন এ যজ্ঞকর্ম্মে ব্যস্ত। চেতনে অচেতনে যেখানে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সবটাই একটা কর্ম্মের প্রবাহ, একটা বিরামহীন চাঞ্চল্য অবিচ্ছিন্ন গতি। আর এ সকল চাঞ্চল্য বা গতি ব্রহ্মে আহুতি অর্পণ মাত্র। এ যজ্ঞ অবিচ্ছিন্নভাবে অনন্ত কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, আর অনন্তকাল চলিতে থাকিবে। ব্রহ্ম অনন্ত, তাঁহার যজ্ঞও আদি অন্তশূন্য। ব্রহ্মাই এ যজ্ঞের হোতা, ব্রহ্মাই হবিঃ, ব্রহ্মাই অগ্নি এবং ব্রহ্মাই অর্পণ। ঋষিরা এ কথা বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন এবং ভগবান নিজে অবতীর্ণ হইয়া এই কথাই বলিয়াছেন।

এ যজ্ঞের কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ ও সম্বোধন সকল বিভক্তিই—ব্রহ্ম। তিনি আপনাকে নানাভাবে, নানা রূপে, নানা নামে বিভক্ত করিয়াছেন। এই রকম বিভক্ত করিয়া নানা রকমের ভাবের হোমকুণ্ড জ্বালিয়া দিয়াছেন মাত্র। আর সকল হোমকুণ্ডে একই অগ্নি সংস্থাপন করিয়াছেন। সেই

অগ্নির নাম ভাব, কিন্তু তাহার শিখার নাম অভাব। সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের ইচ্ছারূপ তপস্যা বা তাপ, অভাবের শিখার আকার লইয়া ধূ ধূ জ্বলিতেছে। ধূলিতে ধূলিতে, জীবে জীবে, গ্রহে গ্রহে, ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে শুধু অভাবের শিখা, অভাবের জ্বালা। ধূ ধূ ধূ তাহার বাহ্য মূর্ত্তি, হু হু হু তাহার তপ্ত শ্বাস। ভাবের অগ্নি, অভাবের শিখা!

ভাব বা বোধরূপী অগ্নিকে সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া যাঁহারা চিনিয়া লইতেছেন, তাঁহাদের যজ্ঞে পূর্ণাহুতি নিষ্পন্ন হইয়া যাইতেছে। তাঁহারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে লিপ্ত হইয়া যজ্ঞের ভোক্তা হইতেছেন,—যজ্ঞেশ্বর হইতেছেন। আর যাহারা তাহা পারিতেছে না, তাহাদের অভাবের, অচিদ্‌বোধের শিখা আকাশ ফুঁড়িয়া, শূন্য ছাপাইয়া দিগ্‌দিগন্তে লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিতেছে। ভাব বা বোধ না দেখিলেই অভাব বা অচিৎ।

ঋষির কথা গুরুবাক্য করিয়া যাঁহারা অগ্নিকে চিনিতেছেন, চিনিতে স্বরু করিয়াছেন, তাঁহাদের শিখা সংযত হইয়া আসিতেছে। তাঁহাদের শিখা শুধু আলোক, দীপ্তি, বিকাশ ও জীবন প্রতিদান করিতেছে; তাঁহাদের উঠিতেছে—অমৃত; আর সেই অমৃতের উৎস পাইয়া, অমর হইয়া আনন্দে নির্ব্বাণের দিবে চলিয়াছেন—তাঁহারা হইলেন সুর। যাহারা চিনিতেছে না, চিনিতে চেষ্টা করিতেছে না, শুধু শিখাকে শিখা বলিয়া, অভাব বলিয়া, অচিৎ বলিয়া বুঝিতেছে, সত্যের ইচ্ছারূপ তপস্যা বলিয়া যাহারা ধরিতে পারিতেছে না, তাহাদের শিখা শূন্যে শূন্যে

ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে ; শূন্যের পর শূন্য জ্বালাইয়া দিতেছে—শূন্যের পর শূন্য বিস্তার করিতেছে। অসংযত, অদমিত, উচ্ছৃঙ্খল অভাব বা অনাত্মবোধের শিখায় তাহারা দিগ্‌দিগন্ত দগ্ধ করিতেছে— আপনাদিগকে পোড়াইতেছে। তাহাদের উঠিতেছে গরল, পাইতেছে গরল, আর দিকে দিকে শুধু গরল উদ্গীর্ণ করিতেছে। তাহারা পাইতেছে শুধু দহন, শুধু জ্বালা, শুধু ধূম—তাহাদের নাম অসুর।

একজনেরা পাইতে চাহে—পূর্ণ, পাইতেছে—পূর্ণতা। অন্যেও পাইতে চাহে—পূর্ণতা, পাইতেছে—শূন্য। একজনেরা আপনাদের পূর্ণ করিতে চাহে, পূর্ণের মুখ চাহিয়া তাহারা পূর্ণের পূর্ণত্বই দেখে। তাহারা পূর্ণকে পূর্ণ অধিকার দিবার জন্য আপনাদিগকে রিক্ত করিয়া সর্ব্বস্ব পূর্ণে যুক্ত করিয়া দেয়, পূর্ণের অধিকার বিস্তৃত করিয়া দেয়, আপনাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পূর্ণের অধিকার সসীম করে না; অসীমের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আপন আপন সত্তা হারাইয়া ফেলে; আপনার আসনে পূর্ণকে বসাইয়া দেয়। আর একজনেরাও আপনাদের পূর্ণ করিতে চাহে; আপনাদের অধিকার বিস্তৃত করিয়া, অভাবের দৃষ্টি বাড়াইয়া অভাব আবিষ্কার করে, শূন্যের পর শূন্য রাজ্য তৈয়ারী করে, আর এই রকমে শূন্য বিস্তার করিয়া পূর্ণ হইতে যাইয়া শূন্যেই তাহাদের পূর্ণের মরীচিকা তৈয়ারী হয়—শূন্যেই লয় পায়। আপনাদের তাহারা পূর্ণের আসনে বসাইতে চাহে।

বলিয়াছি, ভাব বা বোধই এ যজ্ঞের অগ্নি, শিখা তার

অভাব বা অনাত্মবোধ। সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম খেলার ইচ্ছায় অনন্ত ব্যাপ্তি লইয়া, একদিকে আপনার পূর্ণতা দেখাইতেছেন; আর একদিকে দেখাইতেছেন—শূন্য, শূন্য, শূন্য! যাহারা ভাব দেখে, তাহারা অভাব দেখে না। যাহারা অভাব দেখে, তাহারা ভাব দেখিতে পায় না। যাহারা অভাবদর্শী, তাহাদের শুধু জ্বালা, শিখা,—আর রব—ত্রাহি ত্রাহি।

রব—ত্রাহি ত্রাহি, কিন্তু তারে কে? ত্রাণকর্ত্তা কোথায়? কে আছ তারক, কে আছ পরিত্রাতা! শুধু কুণ্ডলীকৃত অগ্নিধূম! আঁধার অন্তহীন, নিশ্চলতা প্রান্তহীন, শুধু ধূ ধূ শূন্যের বিস্তার! দৃষ্টি ধূমাচ্ছন্ন, শ্বাস ধূমরুদ্ধ—কণ্ঠ ধূমময়!

ত্রাতার সাক্ষাৎ নাই—শুধু প্রতিধ্বনি! তুমি আছ? প্রতিধ্বনি—"আছ"! "কই তুমি?" প্রতিধ্বনি—"তুমি।" "কোথায়"? প্রতিধ্বনি—"কোথায়!" "কৈ?" "ওই"।

সাংঘাতিক যজ্ঞ! যজ্ঞ ঠিক হইতেছে, যজ্ঞেশ্বরও ঠিক রহিয়াছেন, অভাবদর্শীলোক ভাবিতেছে—গৃহদাহ, দহনশালা। হেথা হইতে পালা, পালা। যাবে কোথায়? তা' জানি না। মূল না দেখিলে এই রকম হয়।

ঋষিরা বলিলেন—বৎস! এ পালাপালি ছুটাছুটি করিতেছ কেন? যজ্ঞেশ্বরকে দেখ। সেই দিকে চহিয়া থাক। চোখে ধোঁয়া লাগিবে না। ইহা গৃহদাহ নহে—যজ্ঞাগার।

"কই—কই যজ্ঞেশ্বর?" এই তোমাতেই—তোমার অন্তরে, আমাতেই—আমার অন্তরে, এ যজ্ঞতেই—যজ্ঞের

অন্তরে, এই শিখাতেই—শিখার অন্তরে, ওই জ্বালাতেই—জ্বালার অন্তরে।

এ জগৎকে, এ ব্রহ্মযজ্ঞাগারকে, এ সত্যস্বরূপ চিন্ময় ব্রহ্মের চেতনার লীলাক্ষেত্রকে যদি চেতনবিলাস, জ্ঞানের লীলার অঙ্গ, বোধের বিবর্ত্তন বা চিন্ময় আত্মার নামরূপ ক্রিয়া প্রকাশ বলিয়া চিনিতে পার, জানিতে পার, মানিতে পার অনাত্মদর্শনের চক্ষুতে জ্ঞানের অঞ্জন দিয়া যদি আত্মদর্শনের দিব্যদৃষ্টিলাভ করিতে পার, যদি সত্যস্বরূপ পরমাত্মরূপী যজ্ঞেশ্বর রহিয়াছেন—এইটা জানিয়া, মানিয়া, তাঁহার সার্ব্বভৌমিক সত্তাবোধ এ বিশ্বের স্থূলতম প্রকাশ পর্য্যন্ত বিসর্পিত করিয়া দিতে পার, যদি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম অথবা শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ অথবা মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার অথবা এ সমস্ত বিকারের মূল ক্রিয়াশক্তি পর্য্যন্ত আত্মারই মন ও প্রাণ-প্রকাশ বা বোধেরই নামান্তর, রূপান্তর, ক্রিয়ান্তর বলিয়া উপলব্ধি করিতে পার, তবেই হইবে তোমার যজ্ঞেশ্বর দর্শন, যজ্ঞদর্শন। আর যতক্ষণ তাহা না পারিবে, ততক্ষণ মিথ্যা, শূন্যতা অভাবের মরীচিকা প্রভঞ্জনের মত তোমায় শূন্যে শূন্যে উড়াইয়া লইয়া বেড়াইবে। মৃত্যুর জ্বালাময় লেলিহান জিহ্বায় তোমায় বার বার নিক্ষিপ্ত করিবে। মরণের ক্ষুধা নিবারণের জন্য তোমায় বার বার জন্মাইতে হইবে আর জ্বলিতে হইবে।

তবেই মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে, মোহের বন্ধন হইতে আপনাকে উন্মুক্ত করিতে হইলে, অগ্নিশিখার দহন

হইতে কোটিচন্দ্রসমশীতল পরশ লাভ করিতে হইলে, সত্য-প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইতে হইবে—সত্যদর্শনে প্রাণ-পণে আপনাকে সত্যময় করিয়া তুলিতে হইবে। মৃত্যু যে অমৃতেরই অন্য মূর্ত্তি; বোধময় তোমার আত্মাই যে মৃত্যু ও অমৃত, উভয় মূর্ত্তিধারী। অন্তর ও বাহির—এ যে তোমার সত্য আত্মারই বোধযুগ্ম—এ কথা শ্রুতিতে ঋষিরা দেখাইয়া দিয়াছেন এবং এই মহাবাক্য অবলম্বন করিয়া তুমি তোমার বোধকে তদাকারীয় অনুভূতিতে পূর্ণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইবে। কি অন্তরে, কি বাহিরে, অন্য কোন সত্তা অনুভব করিবে না বা হইলেও তাহাকে আত্মারই সত্য মূর্ত্তি বলিয়া অনুভব করিবে—এই উপদেশই সর্ব্বশ্রুতির সার মীমাংসা। ইহাই "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" বলিয়া ঋষি ঘোষণা করিয়াছেন। এ জগৎকে—এ জগদ্‌ভোগকে সত্যসম্ভোগে পরিণত কর। ইহাকে সত্য বলিয়া দেখ। আপনাকে সত্য বলিয়া বোধ কর। সত্য ভিন্ন অন্তরে বাহিরে কোথাও কিছু তুমি জানিতেছ না—ইহারই অনুশীলন কর। জগৎকে মিথ্যা বলিয়া দেখিও না। বল—"আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা।" বল—"স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ম্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়োঽতেজোময়ঃ কামময়ঃ অকামময়ঃ ক্রোধময় অক্রোধময়ো ধর্ম্মময়োঽধর্ম্মময়ঃ সর্ব্বময়স্তদ্‌যদেতদিদম্ময়োঽদোময়ঃ।" সেই আত্মা বা আমার এই আত্মাই প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ যাহা কিছু সমস্তময়। তিনি

পৃথিবীময়, জলময়, বায়ুময়, অগ্নিময়, আকাশময়। তিনি বোধময় বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়। তিনি তেজোময়, অতেজোময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময় অক্রোধময়, ধর্ম্মময়, অধর্ম্মময়—সর্ব্বময়, সর্ব্বই তিনি—তিনিই সর্ব্ব। সত্য সত্য তিনিই রহিয়াছেন। কি অন্তরে, কি বাহিরে, সত্যই রহিয়াছেন। মিথ্যা নাই, মরীচিকা নাই, অচেতনমূর্ত্তি ধরিয়া সত্য সত্যই তিনি বিরাজ করিতেছেন। ওরে, আমি সত্যে মগ্ন হইয়া রহিয়াছি, আমার অন্তরে সত্য, বাহিরে সত্য, এ জগৎ সত্য, আমার মন সত্য ইন্দ্রিয় সত্য, প্রাণ সত্য, আমিও সত্য। সত্য এ বিশ্ব, সত্য এ জীব, সত্য এ দেবতা-সংঘ। সত্য তিনি, যিনি সকল সত্যের সত্য। আমি সত্যে জাত, সত্যে অবস্থিত, সত্যে আমি লীন হইব। শোন শোন বিশ্ববাসী, শোন অমৃতের বরপুত্রগণ, আমি সে মহান সত্যকেই দেখিতেছি, জানিতেছি, মানিতেছি। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—নানা জন নাই। একজনই নানা হইয়া রহিয়াছেন। ওরে আমায় সত্য ভিন্ন আর কে ধরিবে রে—আমায় সত্য ভিন্ন আর কে বক্ষে তুলিয়া লইবে! সত্য ভিন্ন অন্য কাহার অন্ন আমি গ্রহণ করিব, কাহার সলিলে আমি অবগাহন করিব, কাহার অগ্নিতে, কাহার দীপ্তিতে আমি চক্ষুময় বাঙ্ময় হইব, কাহার বায়ুতে আমি জীবন ধারণ করিব, কাহার গগন-শ্রোত্রে আমি আমার আদরের স্নেহের, প্রীতির, ভক্তির, অনাচারের আব্দারের স্তুতি অভিযোগ ঢালিয়া দিব? সে ভিন্ন—জন্মাদ্যস্য যতঃ—যাহা হইতে এ সব জন্মিয়াছে, যাহা হইতে আমি জন্মিয়াছি—সে ভিন্ন

কাহাকে আমি আমার প্রাণের প্রাণ দিয়া বরণ করিব? সে ভিন্ন অন্য কাহার ধন, কাহার বিষয় আমি ভোগ করিব? ওরে, কাহারও ধন গ্রহণ করিস না। বিষয়-ধন তাহার ধন বলিয়া গ্রহণ কর। মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্। সত্যই বিষয়-সকল তাহারই মহিমা। তাহার মহিমা বলিয়া সে সকল ভোগ কর। অন্য কাহারও ধন গ্রহণ করিও না। সত্য আত্মা হইতে অন্য বলিয়া যাহা জানিবি—তাহাই বিষ, তাহাই মৃত্যু।

অন্তরে ও বাহিরে বিষয়-সকলকে আত্মার সত্য-মূর্ত্তি বলিয়া এইরূপে গ্রহণ কর। মিথ্যা বুঝিতে গিয়া মিথ্যার মরীচিকা রচনা করিস না। তোর প্রাণের দেবতাকে বিষময় আবরণে আবৃত করিস না। বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবাইয়া দে—তোর মিথ্যাবুদ্ধি অনন্ত কালের জন্য।

এই সত্যে সত্যবোধই সত্য-প্রতিষ্ঠা।

সত্যানুভূতি

অন্তরে

এই সত্যে সত্যানুভূতি দুই দিক্ দিয়া করিতে হয়, আর ইহারই নাম দিই সত্য-প্রতিষ্ঠা বাহিরে ও অন্তরে। অন্তরে সমস্ত বিষয়ই যে বোধের মূর্ত্তি, আর সেই পরম সত্য বোধস্বরূপ বা বোধধর্ম্মী আত্মা যে অন্তরে অবস্থান করিতেছেন, প্রতি বিষয় আমার অন্তরে যে ইহাই দেখাইয়া দিতেছে। যখন

বায়ু প্রবাহিত হয় না, তখন আমার চারি ধারে বায়ু অবস্থান করিলেও তাহা বুঝিতে পারি না ; কিন্তু হস্ত-সঞ্চালনে বায়ুতরঙ্গ উত্থিত হইয়া বায়ুর অস্তিত্ব যেমন আমায় বুঝাইয়া দেয় তেমনই সর্ব্বদা আমার চেতনা রহিয়াছে, ইহা জানা থাকিলেও বিষয়ের প্রতিঘাত তাহার অস্তিত্বকে যে আমার উপলব্ধিতে স্ফুটতব করিয়া দিতেছে—ইহা লক্ষ্য করিয়া নিজ অন্তরস্থ আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। এই তুমিই জলরূপে প্রকাশ পাইলে, এই তুমিই অগ্নিরূপ ধারণ করিলে—জল, অগ্নি আদি বিষয়দর্শনে এইরূপে বাহ্য জগৎ হইতে অন্তর্জ্জগতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। অন্তরেই যে সেইগুলি দেখিতেছ, ইহা জানিবার দেখিবার বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ধূম যেমন অগ্নি অনুমান আনিয়া দেয়, অন্তরের এই বিষয়ানুভূতিরূপ ক্রিয়া তেমনই বোধস্বরূপ আত্মাস্তিত্বজ্ঞানে হৃদয় পূর্ণ করিয়া দেয়। এই রকম দেখিবে আর বলিবে—তুমি আত্মা—তুমি সত্য—তোমার এ ক্ষুদ্র মূর্ত্তি ছাড়িয়া, মহান্ পরমাত্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার বোধগম্য হও—তোমায় বোধ করি : 'ওগো, তুমি আমার চেতনায় আবির্ভূত হও। 'সত্যং পরং বিদ্মহে সত্যং পরং ধীমহি, তন্নঃ সত্যং প্রচোদয়াৎ।'* আমি জানিতে না পারিলেও তবু জানিতেছি, তুমি রহিয়াছ। আমি দেখিতে না পাইলেও তবু দেখিতেছি, তুমি অবস্থান করিতেছ। তুমি সত্য—আমায় মহাসত্য-মূর্ত্তিতে দেখা দাও। শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক বাল্যলীলা দেখিয়াও যেমন যশোদা তাঁহাকে চিনিতে

পারে নাই—জগদীশ্বর বলিয়া, তেমনি আত্মাকে হৃদয়ের মাঝে বোধরূপে পাইয়াও চিনি না, জানি না যে, এই আমার অন্তরই পরমাত্মা। গীতায় তিনি বলিয়াছেন,—

'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥'

আমার সর্ব্বভূতমহেশ্বর পরমভাব না জানিয়া, মানবতনু-আশ্রিত আমাকে মূঢ়েরা অবজ্ঞা করে। তোমরা অবজ্ঞা করিও না—এ বোধশক্তিময়ী মাকে, এ বোধরূপী আত্মাকে, এ জ্ঞান-মূর্ত্তি পরাগতিকে। তুমি আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে, সর্ব্বদা বাহ্য হইতে অন্তরে ফিরিয়া দাঁড়াইবে। তাঁহাকে আহার করাইলাম—তাঁহাকে স্নান করাইলাম, তাঁহাকে শয়ন করাইলাম—নিজের শয়ন স্নান আহারে এই রকম বোধ উজ্জীবিত করিতে থাকিবে। দেখ, বোধ যদি তৃপ্তিময় না হয়, তাহা হইলে তুমি তৃপ্তি অনুভব কর না—অর্থাৎ তৃপ্তি অনুভব করা অর্থেই বোধের তৃপ্তি আকার পরিগ্রহণ করা। এইরূপ আহার বিহার শয়ন—সমস্তে তুমি যে তৃপ্তি পাও, তাহা তাঁহার শক্তির বা তাঁহারই তৃপ্তির প্রতিবিম্ব। তিনি সুখী হইলেই তুমি সুখী হও, তিনি আনন্দিত ভাব গ্রহণ করিলেই তবে তুমি আনন্দিত হও।

আর এই রকম অন্তরে বিষয় অর্পণ অভ্যাস করিতে করিতে এক দিন তুমি দেখিবে, অন্তরেই সমস্ত বিষয় রহিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বিষয়-মূর্ত্তি ধরিয়া যাহার শক্তি প্রকাশ পাইতেছে,

তিনিই বিষয়ের ভোক্তা। অন্তরেই বিষয় ফুটিতেছে এবং অন্তরেই তাহার ভোক্তা রহিয়াছেন। এখন দেখ, যদি তুমি এই বোধকেন্দ্রে এমন অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হও যে, বাহিরের গন্ধ না পাইলেও তুমি গন্ধবোধ আপনাতে ফুটাইয়া তুলিতে পার, বাহিরের মিষ্টাস্বাদীয় কিছু না লইয়াও তুমি বোধে মিষ্ট আস্বাদ উদ্বুদ্ধ করিতে পার, তবে আর বাহিরের পদার্থের উপর তোমার আসক্তি থাকিবে না। তুমি আপনাতে সর্ব্ব গন্ধ, সর্ব্ব রস, সর্ব্ব রূপ, সর্ব্ব শব্দ, সর্ব্ব প্রাণ, সর্ব্ব শক্তি দেখিয়া আর বাহিরের সে সকলে অভিভূত হইবে না; আত্মরত, আত্মতৃপ্ত, আত্মসুখী হইবে। ইহাকেই শাস্ত্রে আপ্তকাম পুরুষ বলে। অন্তরে সত্যপ্রতিষ্ঠা সিদ্ধ হইলে এইরূপ আপ্তকাম পুরুষ হওয়া যায়। এ কথা আমি বলিতেছি ভাবিও না। শ্রুতিতে ঠিক এই কথাই আছে। অন্তরাকাশে সমগ্র বিশ্ব সমাহিত, এ কথা শ্রুতি বলিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে,—"যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং...যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি—সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতম্।" দেহরূপ এই ব্রহ্মপুরে অন্তর্হৃদয়াকাশ আছে, তাহাতে ত্রিভুবনে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু নাই, সমস্তই সমাহিত। অন্তরাকাশ সম্বন্ধে শ্রুতিতে বহু স্থলে এইরূপ স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। ইহাই বোধাকাশ। যদি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে চাহ, তবে তার্কিকের তর্কে ভুলিও না। সত্য বলিয়া সত্যজ্ঞানে ঋষির এ উপদেশ

ধারণা কর, যাহা তুমি অন্বেষণ করিতেছ—যাহা লাভ করিলে তুমি কৃতার্থ হইবে—তাহা তোমাতেই—অন্য কোথাও নহে। তিনিই তোমার অন্তরের অন্তররূপে—অন্তর্য্যামিরূপে ; এ কথা প্রাণ-প্রতিষ্ঠা বলিবার সময় ভাল করিয়া বলিব। এখন শুধু অন্তরে তিনিই যে রহিয়াছেন, তোমার অন্তর সত্য সত্য তিনিই—এইরূপে অন্তরে সত্য-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, ইহাই ধারণা কর। 'তুমি সত্য, তুমি আমার অন্তর'—যেখানে সত্য-প্রতিষ্ঠা করিবে, তাহাকে অন্তর বলিয়া এইরূপে বোধ করাই অন্তরে সত্য-প্রতিষ্ঠার প্রধান অঙ্গ। তুমি আত্মা, সত্যই তুমিই পৃথিবীর অন্তর, তুমিই এ বায়ুর অন্তর, তুমিই আকাশের অন্তর এই আমার অন্তর, আমার প্রাণের অন্তর, আমার মনের অন্তর—আমার হৃদয়ের অন্তর, তুমি অন্তর, সর্ব্বান্তর আত্মা তুমি, আমার আমিত্ব তোমাতেই জাত। "আমি" বলিয়া এই যে বোধ, ইহাই আমি এবং এ আমার অন্তর তুমিই। তুমি সর্ব্বান্তর—তুমি সর্ব্বান্তর অন্তর্যামী সত্য। এইভাবে অন্তর শব্দের ভাবার্থ অনুভব করিতে প্রয়াস করিবে। তবেই বাহির ও অন্তর যেখানেই সত্যবোধ ফুটুক, অন্তরকেই দেখা হইবে। তাঁহাকে "অন্তর"রূপে বোধ করিবার প্রয়াস করা ও তৎসাহায্যে অন্তর্দ্দর্শী হইতে যাওয়াই অন্তরে সত্য-প্রতিষ্ঠা।

তিনি সচ্চিদানন্দ। এ বাহ্য অচেতন জগৎ সৎ বা অস্তিত্ব-বোধ-প্রকাশ-প্রধান ; অর্থাৎ "রহিয়াছে" এই ভাবটিই প্রধান ভাবে বাহ্য জগৎদর্শন হইতে জাগিয়া উঠে। আর জীব চিৎ-

প্রধান বা জ্ঞানপ্রধান। জ্ঞানপ্রধান বলিলে অস্তিত্ব ও চিন্ময়তা—উভয়ই একত্রে অনুভব হয়। কেন না, অস্তিত্বশূন্য চেতনা হইতে পারে না। আর তিনি স্বয়ং আনন্দপ্রধান। আনন্দপ্রধান বলিলে "অস্তিত্ব" ও "চিন্ময়ত্ব" তৎসঙ্গেই বুঝা যায়। কেন না, অস্তিত্বশূন্য অথবা জ্ঞানশূন্য আনন্দ হয় না। সেই জন্য বাহ্যে সত্য-প্রতিষ্ঠা প্রধানতঃ অস্তিত্বভাবপ্রধান হয় এবং অন্তরে সত্যপ্রতিষ্ঠা চিন্ময় অস্তিত্বভাবপ্রধান হইয়া থাকে। অবশ্য সর্ব্বত্রই আনন্দময় সত্যেরই অন্বেষণ করিবে, ইহা সত্য, কিন্তু প্রধানতঃ বাহ্যে ও অন্তরে ওইরূপ অস্তিত্ব ও চিন্ময়ত্বরূপ বিশেষত্ব অনুভব করিবে।

সেই জন্য প্রথমে বাহ্যে সত্তাবোধকভাবে এবং অন্তরে চিন্ময় সত্তাবোধকভাবে সত্যপ্রতিষ্ঠার অনুশীলন করিবে। বাহিরে সমস্ত পদার্থের এই যে "থাকা", এই "থাকা"ই তাঁহার থাকা—এই অস্তিত্বস্বরূপ সত্যমূর্ত্তি দর্শন করিবে এবং অন্তরে "মনপ্রাণ-ক্রিয়াময় অস্তিত্ব"রূপে তাঁহাকে বরণ করিবে। আর বাহ্য সত্য-প্রতিষ্ঠাকে অন্তরেরই প্রকাশ বলিয়া অন্তর্বুদ্ধি আরোপ করিয়া অন্তরস্থ হইবার চেষ্টা করিবে।

সত্যানুভূতি

বাহিরে

যেমন অন্তরে, বাহিরের আস্তিক্যবোধে সত্যপ্রতিষ্ঠাও ঠিক এই রকম সত্যজ্ঞানে করিবে। যখন অন্তর বাহির বিশেষভাবে লক্ষ্য না করিয়া শুধু সত্য-প্রতিষ্ঠা করিবে, তখন আগে যেমন বলিয়াছি, তেমনই করিতে হইবে। ভাবিবে, তুমি রহিয়াছ,—এইখানে, এই জলে, এই ধরণীতে, এই অগ্নিতে,এই আকাশে তুমি রহিয়াছ,—তুমিই রহিয়াছ। আমি যেখানে শির নত করি না কেন, তোমার চরণে করিতেছি—এ জ্ঞান থাকিলেই সে প্রণাম সত্য সত্যই তোমার চরণে করা হইবে। আমি যদি অন্ধ হই, আর কোন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই, তবে সে লোক কোথায় রহিয়াছে—এইটুকু স্থির জানিয়া, সেইখানে যাইয়া উপস্থিত হই, আর আমার যাহা কিছু তাহাকে বলিবার আছে বলি; তবে তাহাকে দেখিতে না পাইলেও যেমন আমার বলা ব্যর্থ হয় না, তেমনই তুমি সব স্থলে রহিয়াছ, আমি বোধচক্ষুহীন অন্ধ, আমি দেখিতে পাইতেছি না; কিন্তু তুমি রহিয়াছ—এ ত ধ্রুব সত্য। আমি তোমায় দেখিতে না পাইলেও, আমি তোমার উদ্দেশ্যে যাহা করিব, যাহা বলিব, নিশ্চয়ই তাহা ব্যর্থ হইবে না—তুমি তাহা দেখিবে, শুনিবে

এ মহাসত্য আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। সত্যপ্রতিষ্ঠার এই সাধারণ ভাব সর্ব্বদা গ্রহণ করিবে। আর যখন বাহিরে কোন পদার্থে, কোন প্রতিমাদিতে বা পৃথিবী, সূর্য্য, আকাশ— এমন কোন কিছুতে সত্যপ্রতিষ্ঠা করিবে, তখন ভাবিও না, এই যে পৃথিবী, এই যে সূর্য্য, এই যে আকাশ, ইহার অন্তরে তিনি অবস্থান করিতেছেন—যিনি সত্য, যিনি আত্মা, যিনি আমার ও বিশ্বের জন্ম-স্থিতি-লয়ের আশ্রয়—তিনি ইহার অন্তরে আছেন, ইনি নহেন—এরূপ ভাবিবে না। যেমন পিতা মাতা প্রভৃতি কাহাকেও যখন প্রণাম কর, কি সেবা কর বা পুত্রাদিকে যখন স্নেহ কর, তখন যেমন ভাব না যে, "এই দেহের অন্তরস্থিত আত্মাই আমার পিতা মাতা বা পুত্র এ দেহ পিঞ্জর মাত্র—ইহাকে আমি সেবা বা স্নেহ করিতেছি না—এই দেহের অন্তরস্থিত আত্মাকে সেবা করিতেছি—স্নেহ করিতেছি—" তেমনই পৃথিবী সূর্য্য প্রতিমা আকাশ, যেখানে সত্যপ্রতিষ্ঠা করিবে, ভাবিবে—ইনিই সেই। ইহার অন্তরে যে আত্মা আছেন তাঁহাকেই মাত্র লক্ষ্য করিতেছ, এরূপ ভাবিবে না। জগতের অন্তরে তুমি—ইহা শুধু অন্তরে সত্যপ্রতিষ্ঠার সময় ভাবিতে পার, কিন্তু বস্তুবিশেষে সত্যপ্রতিষ্ঠা করিবার সময় ভাবিবে, এই জগৎই তুমি—তুমিই সূর্য্যরূপী—তুমিই জলরূপী—প্রতিমা-রূপী—আকাশরূপী। তবেই সত্যবোধ সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে। অন্তরে সত্য উজ্জীবিত হইয়া তোমায় সত্যবোধময় করিয়া দিবেন।

বিশ্বরূপে এ সত্যপ্রতিষ্ঠার অভ্যাস করিবে। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মগায়ত্রী সত্যপ্রতিষ্ঠার চরম মন্ত্র। ব্রাহ্মণেতর অন্যে এ ভাব লইয়া স্বচ্ছন্দে সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে। ওরে, যেমন প্রদীপালোক ধরিয়া সূর্য্য দেখিতে হয় না, সূর্য্য দিয়া সূর্য্য দর্শন হয়, তেমনই সত্যবোধ দিয়া সত্যকে দেখিতে হয়, আত্মা দিয়াই আত্মাকে জানিতে হয়। ইহা মেধার কোন কৌশলের কথা বলিতেছি না। এমন সত্যভাবে তোমার বাহিরের পদার্থে সত্য-বোধ করিতে হইবে বা সে জ্ঞানকে এমন সত্য করিয়া তুলিতে হইবে যে, তোমার প্রাণে সে পদার্থের নামরূপ বা কোন কিছু অসত্য, এমন বোধ না থাকে। ইহাতে কার্য্যতঃ যদিও মনে হইবে, প্রতীক উপাসনা হইতেছে, অর্থাৎ নামরূপাত্মক খণ্ড আত্মার সাধনা হইতেছে, তবু তাহাই জানিও—অখণ্ড বা ব্রহ্ম উপাসনার উপক্রমণিকা। অর্থাৎ সেই খণ্ডপদার্থে সত্যবোধ ভাসিয়া উঠিলেই তোমার সমস্ত চেতনা তাহাতে তন্ময় হইয়া যাইয়া, অন্য কোন বস্তু আর বোধ করিবে না; অখণ্ড সত্য-বোধই তদাকারে ফুটিতে থাকিবে এবং তখন নামরূপাদি প্রচ্ছন্ন হইয়া বোধকেন্দ্র অথবা সত্যবোধই স্ফুটতর হইবে।

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, কাহাকে তুমি সে বাহ্য পদার্থের আকারে দেখিতেছ, সে কে, তোমার কে—এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ওরে, তুই তোর সত্য আত্মাকেই সত্য সত্য পৃথিবী আকারে দেখিতেছিস্, তোর সত্য আত্মাকে তুই জলরূপে প্রত্যক্ষ করিতেছিস, তোর সত্য অমৃত চিন্ময় আত্মাকেই

তুই অগ্নিরূপে দেখিতেছিস্, তোর সত্য অমৃত চিন্ময় আত্মাকেই তুই বায়ুরূপে, আকাশরূপে, শশী সূর্য্যরূপে, সর্ব্বরূপে দেখিতেছিস্। সর্ব্বরূপে তুই তোর সত্য জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানময় আনন্দময় সর্ব্বান্তর আত্মাকেই দেখিতেছিস্—যিনিই তোর অস্তিত্ব—তোর সত্তার আশ্রয়। তুই রহিয়াছিস্ বলিয়া যে সত্তাবোধ করিস, সেই জ্ঞানময় সত্তারই বিভূতিময় মহিমময় সত্য মূর্ত্তি এ বাহ্য বিশ্ব—তোর আত্মা হইতে অন্য কেহ নয়—অন্য কেহ নয়। তোর প্রাণের প্রাণ সত্য চিন্ময় আত্মাই—যিনি বিশ্বের ত্রাতা, পাতা, হর্ত্তা, তিনি সত্যই এ পৃথিবী আদি রূপে রহিয়াছেন—এ জ্ঞানে সত্যবোধ জাগিলে তুই কি স্থির থাকিতে পারিবি রে! যখন যেখানে সেরূপ বোধ হইবে, তখনই তুই তাহাতে না লুটাইয়া থাকিতে পারিবি না। বক্ষের ভিতর তাহাকে পাইবার জন্য তুই নির্ব্বিচারে সে পদার্থের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে উন্মুখী হইবি। ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া তুই তাহাকেই আলিঙ্গন করিতে থাকিবি—যখন তাহাকেই ভূমিরূপে দেখিতেছি—এরূপে সত্যবোধ ফুটিবে। অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে তোর প্রাণ উন্মুখী হইবে—যখন অগ্নিতে সে সত্যবোধ জাগিবে। যাহারই সত্যপ্রতিষ্ঠা একটু উজ্জীবিত হয়, সেই ওইরূপ না করিয়া থাকিতে পারে না। আমি যাহাকে যাহাকে এ সত্যপ্রতিষ্ঠা অনুশীলন করিতে উপদেশ দিয়াছি, সকলেরই সত্যবোধের তারতম্যে অল্পবিস্তর এ ভাব আসিতে দেখি এবং এইরূপ দেখিলে তখনই বুঝি, সত্যবোধ সত্যই

ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রাণের প্রাণকে কি বাহিরে কেহ রাখিতে পারে রে? প্রাণের প্রাণকে কি আপনা হইতে ভিন্ন করিয়া কেহ দেখিয়া তৃপ্তি পায় রে? সত্য সত্য যিনি ঈশ্বর তাঁহাকে হৃদয় ভিন্ন অন্য কোন বৈকুণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কেহ কি স্থির থাকিতে পারে রে? সত্য ঈশ্বরমূর্ত্তিবোধে জগদ্দর্শনে হৃদয়ের সমস্ত মৃত্যুকুণ্ঠা, অচিৎকুণ্ঠা বিদূরিত হইয়া যায়। আর সেই বিগতকুণ্ঠ হৃদয়ের যথার্থ নাম বৈকুণ্ঠ—তোর সত্যঠাকুরের সত্যাসন। আর সেই বৈকুণ্ঠপতির রসলীলায় শক্তিরূপ সখীবৃন্দও তিনিই—বিশ্বরূপে নব প্রকৃতিরূপে বিরাজিত। তুই বাহ্যবিশ্বে সত্যপ্রতিষ্ঠা কর—হৃদয়েই এ বিশ্ব দেখিতে পাইবি। বুঝিবি, যাহা কিছু দেখিতেছি, এ সমস্ত হৃদয়েই—হৃদয়স্থ তিনিই; তোমার জ্ঞানই ওইরূপ অন্তর্বাহ্য আকারে আবর্ত্তিত হইয়া আত্মাকে বরণ করিতেছে।

আর এই ভাবই তোর প্রতীক উপাসনাকে ব্রহ্মোপাসনায় উন্নীত করিবে।

সত্য-প্রতিষ্ঠা

আস্তিক্য-বোধ

পূর্ব্বোক্তরূপে অন্তরে ও বাহিরে সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে বা সত্যের সত্যানুভূতি ফুটাইয়া তুলিতে হইলে তাহাতে যে ক্রম বা ঘনত্ব অনুসারে সাধনার যে স্তর পর পর অবলম্বন করিতে হয় অথবা স্বতঃ ফুটিয়া উঠে, তাহা প্রধানতঃ চারি প্রকার। (১) আস্তিক্য বোধ; (২) আশ্রয় আশ্রিত বোধ; (৩) আত্মীয় বোধ; (৪) আত্মবোধ। যে দিক্ দিয়াই সাধনা কর না কেন এই চারি স্তরের অনুভূতি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে বা ফুটিবেই ফুটিবে। যোগ কর, জ্ঞানচর্চ্চা কর, ভক্তি কর, কর্ম্মী হও, সন্ন্যাসী হও, তোমার বোধের ভূমি ক্রমশঃ এই চারি ভাবে পূর্ণ হইতে থাকিবে। যদি হয়, তবেই তুমি যে পন্থী হও না কেন, তোমার সাধনা সুসিদ্ধ হইবে। যদি না হয়, সাধনা বিফলতায় লুণ্ঠিত থাকিবে।

আমি প্রথমে সেই জন্য আস্তিক্যবোধের কথাই বিশেষ করিয়া বলিব। সাধারণতঃ লোকে সাধনাতৎপর হইবার সূচনায় মনে করে, আস্তিক্যবোধ যেন তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ আছেই, ইহার আর সাধনার কোন আবশ্যকতা নাই। কেহ সাধনা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে যদি বলি, "ভগবান্

যে রহিয়াছেন, ইহা মান কি?"—"আজ্ঞে, ভগবান্ আছেন মানি বই কি—তাহা না মানিলে তাঁহাকে পাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিব কেন? শুধু কি প্রণালীতে সাধনা করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়, সেইটি দয়া করিয়া বলিয়া দিন।" ইহাই সাধারণ উত্তর। আস্তিক্যবোধের যে আবার সাধনা করিতে হয়—"ভগবান্ রহিয়াছেন" এ জ্ঞানের যে আবার অনুশীলন প্রয়োজন, শুধু প্রয়োজন কেন, ইহাই যে সাধনার ভিত্তি, এ কথার উপর তাহাদের শ্রদ্ধা আসে না। এ জ্ঞান যেন অতি সামান্য এবং সকলেরই আয়ত্তের মধ্যে। শুধু একটা "ক্রিয়া" বা "পন্থা" পাইলেই মুক্তি তাহাদের সমীপস্থ! তোমরা বিশেষ করিয়া মনে রাখিবে, এই অস্তিত্ববোধের সাধনাই সকল সাধনার প্রাণ।

"আমার ভগবান্ আছেন" এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে সাধনার আর বিশেষ কিছু বাকি থাকে না। সমস্ত সাধনা আপনা হইতে হইয়া যায়। আর এ বোধে প্রতিষ্ঠিত না হইলে "যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত্তা নতু চন্দনস্য" হইতে হয়। যাক্, আমি আস্তিক্যবোধের কথা বলি।

ঋষি বলেন, "অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ। অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি॥"—কঠ। তাঁহার উপলব্ধি দুই প্রকারে করিতে হয়, "অস্তি—তিনি রহিয়াছেন"—এই ভাবে এবং তত্ত্বভাবে বা স্বরূপভাবে। কিন্তু এই স্বরূপ বা তত্ত্বভাবে উপলব্ধি তাহারই হয়, যে তাঁহার অস্তিত্বের

উপলব্ধি প্রথমে করে। তবেই দেখ, অস্তিত্বের উপলব্ধি না করিলে তত্ত্ব উপলব্ধির আশা নাই—ইহাই ঋষির উপদেশ। এখন দেখ, এই অস্তিত্বের উপলব্ধি বা আস্তিক্যবোধ কি? কোন কিছু রহিয়াছে, এইরূপ বোধ করার নাম সে বিষয়ের অস্তিত্ব বোধ করা। ভগবান্ রহিয়াছেন, এইরূপ বোধের নাম ভগবান্ সম্বন্ধে অস্তিত্ব বোধ। কিন্তু যাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে বলিতেছি, সে পরম সত্তা কে? কে তিনি—কাঁহাকে বলি ভগবান্—কি মূল সম্বন্ধ তাঁহার সহিত এ বিশ্বের বা আমাদের? আগে এ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান আবশ্যক। নতুবা তাঁহার অস্তিত্ববোধ কি প্রকারে ধারণা করিবে? ঋষি বলেন, যে পরম চিন্ময় সত্তা হইতে এই সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়—যাঁহাতে তুমি, আমি, এ অনন্ত ভুবন জাত, স্থিত ও লীন হয়, তিনিই পরমাত্মা ঈশ্বর। যাহা হইতে কোন কিছু জন্মায় ও অবস্থান করে, আবার যাহাতেই সেই কোন কিছু মিলাইয়া যায়, তাহাই সেই বস্তুর কারণ বা আত্মা। কারণ দুই প্রকারের, উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ। তুলা হইতে বস্ত্র হয়—তুলা বস্ত্রের উপাদান-কারণ। আর তুলাকে যে মনুষ্য বস্ত্রে পরিণত করে, সেই মনুষ্য বস্ত্রের নিমিত্ত-কারণ। পরমাত্মা এ বিশ্বের সর্ব্বতোভাবে উভয় কারণ। তিনি চেতনশক্তিসম্পন্ন ও চিন্ময়। চেতনা বলিতে যাহা তোমরা সাধারণতঃ বুঝ, উহা তাঁহারই নিত্যধর্ম্ম। তিনি বোধ করিয়া এ বিশ্ব হইয়াছেন। অর্থাৎ তোমার বোধে

তোমার কল্পনা-সকল যেমন জন্মায়, থাকে ও লয় হয়—তোমার বোধ বা চেতনশক্তিই যেমন সে কল্পনা-সকলের আত্মা—ঠিক তেমনই তুমি, আমি, এ বিশ্ব, সমস্ত তাঁহার বোধ-শক্তিতে জন্মাইতেছে, থাকিতেছে ও লয় হইতেছে। এ সকলই ঠিক তাঁহার বোধে গড়া বোধময় মূর্ত্তি, তিনিই এ সকলের আত্মা—মোটামুটি এখন এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখ। তবেই পরমাত্মা বা ভগবান্ সম্বন্ধে আস্তিক্যবোধ ধারণা করিতে হইলে, এক-জন চিন্ময়, চেতনা বা বোধ যাঁহার নিত্যধর্ম্ম এবং যিনি আমার, তোমার বা এ সমগ্র বিশ্বের একমাত্র জন্মস্থিতি-লয়ের কারণ, যাঁহাতে আমরা জন্মিয়াছি ও একান্ত ভাবে রহিয়াছি—সেই পরমাত্মা "রহিয়াছেন" এইরূপ ধারণা করাই আস্তিক্যবোধের লক্ষণ। চেতনা, জ্ঞান বা বোধক্রিয়া বলিয়া যে বিকাশ আমরা সর্ব্বদা আমাদিগের মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া জানি অর্থাৎ যে চেতনা বা জ্ঞানশক্তি রহিয়াছে বলিয়া আমরা আপনাদিগকে জীবিত সচেতন বলিয়া পরিচয় দিই, সেই চেতনা আত্মারই ধর্ম্ম। সুতরাং আমাদিগের চেতনা বলিয়া আমরা যাহা বুঝি, সেই চেতনার অস্তিত্বই প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহারই অস্তিত্ব দেখাইয়া দেয়।

দেখ, যদি কোন গৃহের মধ্যে কোন দীপ জ্বলিতে থাকে, আর সেই গৃহের বাতায়ন উন্মুক্ত থাকে, তবে দূরস্থ পথিক সেই বাতায়নের আলোকরশ্মি দেখিয়া যেমন নিশ্চয় করিয়া লয় যে, সেই গৃহের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন দীপ বিদ্যমান; দীপ না

দেখিয়াও দীপরশ্মি দেখিয়া যেমন সে দীপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়, তেমনই তোমাদিগের চিৎক্রিয়া-সকল লক্ষ্য করিয়া নিশ্চয় করিয়া লইবে যে, আত্মা তোমার অন্তরে রহিয়াছেন। আবার যেমন দর্পণে যখন মুখ দেখ, তখন মুখের বিম্বটিই লক্ষ্য কর, দর্পণের উপর চক্ষু সংন্যস্ত থাকিলেও দর্পণ তোমার লক্ষ্যের বিষয় হয় না ; কিন্তু যদি বিম্ব হইতে লক্ষ্য ফিরাইয়া সেই দর্পণের কাচখানিতে লক্ষ্য কর, তবে যেমন দর্পণ-জ্ঞান প্রধান হইয়া ওঠে, ঠিক্ তেমনই এই বিশ্ব-দর্শন যে আত্মরূপ দর্পণেই ঘটিতেছে, এইরূপ বুঝিয়া, বিশ্ব-বিম্ব তোমার যে চেতনায় হইতেছে, সেই দিকে লক্ষ্য ফিরাইয়া বুঝিয়া লইবে যে, চিন্ময় আত্মা তোমাতে অবস্থান করিতেছেন। আর এ বিশ্ব যখন তাঁহারই বোধেরই বিবর্ত্তন, তখন তোমার বাহিরেও তিনিই যে রহিয়াছেন, ইহাই ধারণা করিবে। এইরূপে নিজ চৈতন্য-সত্তা ও জগৎ-সত্তা, এই দুই লক্ষ্য করিয়া মাত্র তিনিই যে রহিয়াছেন, ইহা সর্ব্বদা জ্ঞানে ফুটাইয়া তুলিবে।

এই অস্তিত্ববোধ অনুশীলনের দ্বারা বুদ্ধিতে সুদৃঢ় করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, 'তিনি রহিয়াছেন—তিনি কেমন বা কিরূপ, তাহা আমি জানি না, কিন্তু আমি জানি, তিনি রহিয়াছেন—কেন না, আমার চেতনা বলিয়া যাহা আছে, যাহা আছে বলিয়া আমি আমাকে সচেতন বলিয়া বুঝি, সেই চেতনা তাঁহারই চেতন ধর্ম্ম—সুতরাং আমার যখন চেতনা আছে, তখন চেতনা একমাত্র যাঁহার ধর্ম্ম, তিনি যে রহিয়াছেন,

ইহাতে আর সংশয় নাই'—প্রথম এই ভাবে আপন চেতনার অস্তিত্ব-বোধ সাহায্যে তাঁহার অস্তিত্বে নিঃসন্দেহ হইবে। তাহার পর তিনিই যে বাহিরেও রহিয়াছেন, এই ধারণাও বদ্ধমূল করিতে থাকিবে। সমস্ত বিষয়ানুভূতি যে চেতনারই বৈচিত্র্য, জ্ঞানের নামরূপক্রিয়ার ভিন্নতা মাত্র—এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু বাহিরে জগৎ অবশ্যই আছে এবং সেই জগৎই আমার অন্তরে বোধের জগৎ গড়িয়া তুলিতেছে এবং আমি সেই বাহ্য জগতের সাহায্যেই স্বীয় চেতনায় জগৎ দর্শন করিতেছি, আমার চেতনার বাহ্যনামীয় মূর্ত্তি আমি দেখিতেছি—আর সেই যে বাহ্য জগৎ, উহা পরমাত্মার বোধে গড়া জগৎ। সুতরাং বাহিরেও প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় জগৎই অবস্থান করিতেছে বা পরমাত্মাই জগৎ ও জগদীশ্বর-মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। এইভাবে বাহিরেও পরমাত্মার ধারণা সুদৃঢ় করিবে। অন্তরে ও বাহিরে একমাত্র চিন্ময় পরমাত্মাই রহিয়াছেন। আমরা শয়নে স্বপনে জাগরণে একমাত্র তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও কখনও জানি না, দেখি না, বোধ করি না। জন্ম জন্মান্তর তাঁহাকে লইয়াই তাঁহারই নানা মূর্ত্তিতে মত্ত হইয়া রহিয়াছি,—এই জ্ঞান ধীরে ধীরে উদ্বুদ্ধ করিতে থাকিবে।

এই বার এই "অস্তিত্ব" বোধটিকে বিশেষভাবে অনুশীলন করিবার যে প্রণালী, তাহা বলি। "অস্তি" বা রহিয়াছে বলিতে এক প্রকার বোধের আকার ফোটে। এই "রহিয়াছে" নামীয় বোধ, ইহাই প্রকৃত "অস্তি" বোধ বা আস্তিক্যবোধ। কেন না,

প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার থাকাই আমাদের ও এ বিশ্বের থাকা। তাঁহার অস্তিত্বের অংশ লইয়াই আমরা আমাদিগের অস্তিত্ব অনুভব করি—আমরা আছি বলিয়া বোধ করি এবং তাঁহারই অস্তিত্ব অবলম্বন করিয়াই চেতন অচেতন সমস্ত স্বীয় স্বীয় অস্তিত্বে বিদ্যমান থাকে বা সকলকার "থাকাটি" তাঁহারই "থাকার" একদেশ মাত্র। সুতরাং এই যে "থাকা" ও এই "থাকার" যে বোধ অর্থাৎ অস্তিত্বনামীয় অনুভূতি, ইহা তাঁহার থাকা ও তাঁহারই নিজের নিজ সত্তা-বোধ। চন্দ্র সূর্য্য আকাশ জল বায়ু, এ সমস্তের নামরূপ-বৈচিত্র্য ছাড়িয়া দিলেও সত্তা-সামান্য অর্থাৎ "থাকা" রূপ সাধারণ সত্তাটি তাঁহারই। সুতরাং "থাকা" বলিতে যাহা বুঝায়, সেই বোধটী যদি বার বার অনুভব করিতে থাকি, তবে "অস্তিত্ব"নামীয় বোধটি অনুভব করা হইবে এবং প্রকৃত প্রধান "সত্তা" যিনি, তাঁহারই সত্তাকে দেখা হইবে, তাঁহারই সত্তাকে বোধ করা হইবে।

নিজের অস্তিত্ব ও অন্যান্য চেতন জীবের অস্তিত্ব বোধ এবং অচেতনরূপে প্রতীয়মান বিশ্বের অস্তিত্ব-বোধ অবলম্বন করিয়া তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিবে। আর রহিয়াছেন—"অস্তি" এইটুকু বলিতে যে সত্তাবোধ ফোটে, সেই সত্তাবোধ অবলম্বন করিবে। "অস্তি" এই বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা 'রহিয়াছে' এই প্রকারের চেতনা। সুতরাং প্রতি পদার্থের অস্তিত্ব দর্শন করিয়া যে সত্তাবোধ ফুটিতে থাকে, উহা চেতনারই অস্তিত্ববৎ একপ্রকার আকারবিশেষ এবং এই সত্তাবোধের আকারবিশেষ পুন

করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে—তুমি রহিয়াছ, তুমি রহিয়াছ—এই ভাবে প্রতি পদার্থে ও ভাবে তাঁহাকে দর্শন করিবে। রহিয়াছ, রহিয়াছ,—এইরূপ বলিতে বলিতে অথবা স্বীকার করিতে করিতে যে চিন্ময় আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছ, সেই চিন্ময় আত্মারই অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় অনুভূতি তোমার হৃদয়ে ফুটিতে থাকিবে। কেন না, তুমি জানিয়াছ, যাঁহাকে খুঁজিতেছ, তিনি অন্য কেহ নহেন—ঐ অনুভূতিক্রিয়ার আশ্রয়স্বরূপ চেতনাই বা চেতনধর্ম্মী আত্মাই। বাহিরেও দৃশ্যমানরূপে যাহা পতিত হয়, তাহা তাঁহারই অধিদৈব মূর্ত্তি এবং তোমার অন্তরে যে চেতনার অস্তিত্ব বুঝিতে পার, উহা তাঁহারই চেতন-শক্তি। সুতরাং বাহিরের পদার্থ লক্ষ্য করিয়া যখন তুমি বলিবে—তুমি রহিয়াছ, তখন দুই দিক দিয়া অস্তিত্ব-বোধ ঘন হইবে। এক বাহ্য জগৎ যে তিনিই এই বোধ হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ, সেই বোধের সাহায্যে তোমার অন্তরস্থ চেতনার "অস্তিত্ব" নামীয় বোধের আকারবিশেষ প্রকাশ পাইবে। "থাকা" বলিতে যে বোধ-বিশেষ বুঝায়, তাহা ফুটিয়া উঠিয়া "অন্তর্ব্বাহ্যে একজনই রহিয়াছেন, যাঁহাকে অস্তিরূপে অনুভব করিতেছি"—এই প্রকার জ্ঞান হইতে থাকিবে।

কার্য্যকারণ সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া চিন্ময় আত্মাই যে জগৎ কারণ, এ কথা ঋষিরা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন এবং ব্রহ্মসূত্রে এই কথা মীমাংসিত হইয়াছে। কার্য্য হইতে কারণ দূরে থাকে না, কারণের উপরেই জলে তরঙ্গেরমত কার্য্য ভাসমান ; সুতরাং

তুমি যেখানেই তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার কর, সে স্বীকার কখনও ব্যর্থ হয় না। চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, বিদ্যুৎ, জল, স্থল, বৃক্ষ, পর্ব্বত, যাহা কিছু দেখিবে, তাহাতেই বোধ করিতে প্রয়াস পাইবে তিনি রহিয়াছেন। তিনিই রহিয়াছেন,—যিনি এ দৃশ্যের চিন্ময় আত্মা, যিনি আমার চিন্ময় আত্মা, যিনি এ দৃশ্যের প্রাণ, যিনি আমার প্রাণ, যাঁহাতে ঐ দৃশ্য জাত, স্থিত, যাঁহাতে আমি জাত, স্থিত, যিনি ঐ দৃশ্যের মধ্যে সত্য সত্তা, যিনি আমার মধ্যে সত্য সত্তা, যিনি ঐ দৃশ্যের মৃত্যু ও অমৃতত্বে নিয়ামক, যিনি আমার মৃত্যু ও অমৃতত্বের নিয়ামক। "রহিয়াছেন" এই বোধ বার বার উজ্জীবিত করিয়া তুলিবে। অর্থাৎ "অস্তিত্ব" বলিতে যাহা বুঝায়—সেই আকারের বোধ উদ্বুদ্ধ করিবে।

শুন, যিনি তোমার আত্মা, তিনি ব্রহ্ম—এ বিশ্বরূপ তাঁহারই এ জগতের যে কোন ধূলিকণা স্পর্শ করিয়া যদি ভাব—বোধ কর, তুমি তাঁহাকেই স্পর্শ করিতেছ—তোমার সে ধারণা ভুল নহে। কেন না, তিনি সেখানে বিদ্যমান। "সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোঁকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥" সর্ব্বত্র তাঁহার চরণ, সর্ব্বত্র তাঁহার মঙ্গল কর, সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্র শির, সর্ব্বত্র মুখ, সর্ব্বত্র তাঁহার কর্ণ, সমস্ত আবৃত করিয়া তিনিই অবস্থান করিতেছেন। ঋষির এ মহাবাক্য —এ মহাসত্যনির্ঘোষ যখন তোমার কাণে পৌঁছাইয়াছে, তখন তাঁহার চরণ ধারণা করিয়া যদি তোমার শির ধূলিতৃণের চরণে নমিত কর, তবে তাঁহারই চরণে নমিত হওয়া হইবে। যদি

তুমি, তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিতেছি ভাবিয়া এ জগতের তুচ্ছ আবর্জ্জনাকেও বক্ষে ধারণ কর, তবে স্থির জানিও যে, তোমার অন্তরের অন্তরকে বক্ষে ধারণ করাই হইবে। সত্যবোধে উজ্জীবিত হইয়া সত্যই যে তাঁহাকেই স্পর্শ করিতেছি—তাঁহারই রক্ত চরণে শির লুটাইতেছি, এ ধারণায় সজীব সচেতন হইবে। তোমার বোধ যে পরিমাণে সত্য হইবে, বুঝিবে,—সেই পরিমাণেই তুমি তাঁহাকে লাভ করিতেছ। বোধের তারতম্য এ জগৎ, বোধের তারতম্য এ মোক্ষ, এ বন্ধন—বোধের তারতম্য তোমার জীবত্ব শিবত্ব, বোধের তারতম্যে তুমি মৃত ও সজীব। তুমি শুধু লক্ষ্য কর, তোমার মন নগ্ন হইয়া, সমগ্র আলস্য সংশয়ের আবরণ তিরোহিত করিয়া, সত্যকে অবলম্বন করিবার জন্য উন্নতশির হইয়া দাঁড়াইয়াছে কি না—শুধু লক্ষ্য কর, তুমি এ ধূলিধূসরিত মৃত্যুর কণ্টকময় শয্যা ছাড়িয়া অমৃতের স্নেহস্নিগ্ধ কোমল বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িতে ব্যাকুল হইয়াছ কি না। যদি হইয়া থাক— যদি তোমার প্রাণ অমর প্রাণের সন্ধানে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তবে অতি নিকট, অতি প্রকাশময়—অতীব প্রত্যক্ষ, তোমার অন্তর বাহিরের একান্ত সমীপে—সে সর্ব্বসত্যের আধার। শুধু বল, শুধু লুন্ঠিত হও—আর বল, "ওগো সর্ব্বতঃ চক্ষুময়, আমি জানিয়াছি, তুমি এখানে অবস্থিত, আমার শিরে তোমার একটী নয়নের স্নেহ বর্ষিত হউক। ওগো সর্ব্বতঃ শ্রুতিমন্, তোমার একটী শ্রবণে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার শব্দোচ্ছ্বাস শ্রবণ কর। ওগো সর্ব্বতঃ পাণিময়, তোমার একটী করের কোমল

পরশ, আমার এ তপ্ত ললাট শীতল করিয়া দিউক।" এমনি করিয়া দিকে দিকে, পদার্থে পদার্থে তোমার প্রাণ তাঁহাকে গ্রহণ করুক, আর সঙ্গে সঙ্গে ভাব, তুমি ধন্য, তুমি কৃতার্থ, তুমি সার্থক জীবন। তুমি সত্যই সে মহাসত্যকে হৃদয়ে বরণ করিয়াছ। তোমার প্রাণের প্রাণ—যাঁহাকে তুমি এতদিন হেলায় অশ্রদ্ধায় দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিলে—অবজ্ঞায় অনাদরে যাঁহাকে ভুলিয়া তুমি জগতে অবজ্ঞাত, অনাদৃত হইয়াছিলে, আজ তাঁহাকেই তুমি সত্যের শঙ্খ ঘোষণা করিয়া আদরে ঘরে তুলিয়াছ।

আস্তিক্যবোধের ইহাই লক্ষণ। যে জানে, যে বুঝিয়াছে,—তিনি রহিয়াছেন, সে স্থির থাকিতে পারে না। অন্তরে কি বাহিরে, দেখিতে পাউক বা না পাউক, সে শুধু লুটাইয়া পড়ে—সে শুধু বুকে ধরে—সে শুধু তাহার সোহাগময় প্রাণ তাঁহাকে বরণ করিবার জন্য দিকে দিকে বিস্তারিত করিয়া ধরে। অন্তরে, কি বাহিরে সে শুধু বলে, "ওগো, আমি জানিয়াছি, তুমি রহিয়াছ, আমি জানিয়াছি তুমি রহিয়াছ; আমার আর কোন ভয় নাই, সংশয় নাই, মৃত্যু নাই—মোহ নাই—সঙ্কীর্ণতা নাই—তুমি রহিয়াছ জানিয়াই আমার সমস্ত মৃত্যু—সমস্ত অবসাদ, সমস্ত গরল আজ অতীতের স্বপ্ন-ছায়ামাত্র। রহিয়াছে' বলিয়া এতদিন যাহাদিগের অস্তিত্ব ধারণা করিতাম, সে সমস্ত অস্তিত্বই আজ তোমার অস্তিত্ব বলিয়া বুঝিতেছি।

বলা ও ব্যবহার করা, এ শুধু মুখের বলা নহে, নকল ব্যবহার নহে। এই ব্যবহার—এই বলা কত সত্য, সে দিকে

বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখিবে। আর সে বলা—সে ব্যবহার যত সত্য বোধ হইবে, ততই বুঝিবে, তোমার আস্তিক্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সত্যপ্রতিষ্ঠার উপরেই ক্রিয়ার ফল নির্ভর করে। "সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।" তুমি জান—মিথ্যা কথা বলা দোষ, তত্রাচ যদি তুমি মিথ্যা কথা বল—তবে সে জানার যেমন কোন মূল্য নাই—তেমনই যদি তুমি জান—সর্ব্বত্র তিনি রহিয়াছেন, অথচ তোমার কায়মনোবাক্যের ব্যবহার যদি তদনুসারীয় না হয়, তবে বুঝিবে—তোমার সে জানার কোন মূল্য নাই।

জীব সত্যকে চাহে না—জানে না বলিয়া। এইরূপ ভাবে জানা তাহার হয় নাই—তাই সত্য জীবের নিকট অনাদৃত। জীব শুধু মৌখিক স্বীকার করে। কেন না, তাহার অস্তিত্ব শুধু শাব্দিক জ্ঞানে জানে—কার্য্যতঃ জানে না, ব্যবহারের দ্বারা ফুটাইয়া তুলে না। ভূমিতে সন্তরণ শিক্ষা করিয়া জলে যেমন সন্তরণ দেওয়া যায় না, জলে নামিয়া তবে যেমন সন্তরণ শিক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ বুদ্ধি দ্বারা জানিয়া লইয়া, তবে ব্যবহারতঃ তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিব, তাঁহাকে মানিয়া চলিব, এরূপ হয় না। ব্যবহারতঃ জানিতে জানিতেই তবে তাঁহাকে জানা হয়, মানিতে মানিতে তবে তাঁহাকে মানা হয়। আর এই ব্যবহারতঃ তাঁহার অস্তিত্ব মানা, জানা ও তদনুসারে আপনাকে পরিচালিত করা—ইহাই সত্যপ্রতিষ্ঠার মূল মর্ম্ম।

তাই শুধু অস্তিত্বের উপলব্ধি কর। শুধু জান, তিনি

রহিয়াছেন। বাক্য দিয়া জান, মন দিয়া জান, প্রাণ দিয়া জান, তোমার আমিত্ব দিয়া জান, তোমার নিজ অস্তিত্ব দিয়া জ্ঞাত হও—তিনি রহিয়াছেন। তোমরা শুধু বাক্যের সাহায্যে তাঁহাকে জানিতে চাও, তাই শুধু বাক্যেই তাঁহাকে লাভ কর। মন বুদ্ধি দিয়া জানিতে চাও, তাই শুধু মন বুদ্ধি তোমায় তাঁহার অস্তিত্বের আভাস বুঝাইয়া দেয়। ব্যবহার দিয়া জানিতে চেষ্টা কর—ব্যবহারতঃ তাঁহাকে পাইবে। প্রাণ দিয়া তাঁহাকে জ্ঞাত হও—প্রাণে তাঁহাকে লাভ করিবে। নিজের আমিত্ব দিয়া তাঁহার প্রতিমা রচনা কর—আমিত্বের মধ্যেই তাঁহাকে পাইবে। নিজ অস্তিত্ব দিয়া তাঁহার আসন নির্ম্মাণ কর, সে আসনে তাঁহার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

অস্তি বলিতে বোধস্বরূপ বা বোধশক্তিসম্পন্ন সত্য আত্মার অস্তিত্বই উপলব্ধি হয়। এ অচেতন জগৎ সৎ বা অস্তিত্বপ্রধান। অর্থাৎ অচেতন জগদ্দর্শনে "অস্তি" বা রহিয়াছে, এই থাকার ভাবটাই বিশেষরূপে ফোটে। তেমনই জীব চিৎপ্রধান অর্থাৎ অস্তিত্ব ও চেতনাপ্রধান এবং সত্যস্বরূপ পরমাত্মা আনন্দপ্রধান। অথবা অচেতন জগৎ সদ্বোধক, জীব চিদ্বোধক ও তিনি আনন্দবোধক। চিৎ বলিলে অস্তিত্ব ও চেতনা, উভয়ই বুঝায়। কেন না, অস্তিত্বশূন্য চেতনা হয় না। তদ্রূপ আনন্দ বলিলে সৎ, চিৎ ও আনন্দ একত্রেই বুঝায়। কেন না, অস্তিত্ব ও চেতনাশূন্য আনন্দ হয় না। এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং যাহা দেখিয়া সৎ বা অস্তিত্ব-বোধ উদ্বুদ্ধ হইবে, সেইখানেই—

সেই অস্তিত্বকেই আনন্দময় বলিয়া, তাঁহার বাহ্য নামরূপ মাত্র না দেখিয়া আনন্দময় সত্তার তদাকার বলিয়া ভাবিবে। যেখানে অস্তিত্ব সেইখানেই আনন্দ। তেমনিই যাহা দেখিয়া চেতনা-বোধ উদ্বুদ্ধ হইবে, সেইখানেই আনন্দবোধ উদ্বুদ্ধ করিবে। কেন না, আনন্দময়ের চেতনা ও অস্তিত্বই আমাদের চেতনা ও অস্তিত্ব। শ্রুতি বলেন, সেই আনন্দময় আত্মা বোধের দ্বারা এ বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন—এ বিশ্ব তাঁহার বোধই। আবার তিনি বোধের দ্বারা জীবরূপ ধারণ করিয়া এ বিশ্বের অনুভোক্তা হইয়াছেন। এ জীবমূর্ত্তি তাঁহারই। সুতরাং প্রতি বিষয়ের অস্তিত্ব তাঁহাকে দেখাইয়া দিতেছে এবং প্রতি বিষয়ের অস্তিত্ব-বোধ এক আনন্দময় সত্তার অস্তিত্ব-বোধই তোমার বোধে ফুটাইয়া তুলিতেছে। অথবা এক কথায় বোধসম্পন্ন আত্মাই নানা আকারে নিজ অস্তিত্ববোধ করিতেছেন। সূর্য্য রহিয়াছেন দেখিয়া আনন্দময় সত্তাই স্বীয় অস্তিত্ব সূর্য্যরূপে প্রকাশ করিয়া রহিয়াছেন—এইরূপ ভাবিবে। চন্দ্র দেখিয়া, আকাশ, জল, সমস্ত দেখিয়া, সেই আনন্দময়ই স্বীয় অস্তিত্ব তত্তৎরূপে প্রকাশ করিয়া রহিয়াছেন— এইরূপ বুঝিবে। জগতের অস্তিত্ব তোমার অস্তিত্ব-বোধ ফুটাইয়া দেখাইয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখায়, তাঁহার অস্তিত্ব—যিনি এই সমস্ত বোধভঙ্গিমাময়, জ্ঞানস্বরূপ বা জ্ঞানময়। তাই অস্তি—এই বোধ যাহা অবলম্বন করিয়া ফুটুক না কেন, বোধের অস্তিত্বই তাহা দেখাইয়া দেয় এবং এইরূপে বোধস্বরূপ সত্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে

করিতে তবে তাঁহার চেতন-ধর্ম্মের ও তাঁহার আনন্দের উপলব্ধি আসিতে থাকে এবং তখনই তত্ত্বতঃ সে অস্তিত্বের উপলব্ধি ...

সকল পদার্থ অবলম্বন করিয়া অস্তিত্ব-প্রতীতি ফুটাইয়া তোলা, আর সেই অস্তিত্ব-প্রতীতি যে চিন্ময় আত্মারই অস্তিত্ব-রূপ একটী বোধায়তন, ইহা জানা, এই হইল আস্তিক্যবোধের মূল কথা। দেখ, পদার্থ-সকল দেখিয়া সর্ব্বপ্রধান যে প্রতীতিটি ফোটে, সেটি "রহিয়াছে" এই আকারের। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ"—হে সৌম্য, একমাত্র সৎই প্রথম বিদ্যমান ছিলেন—এই যে শ্রুতি, ইহা একমাত্র "সত্তার" ধারণাই প্রধান ভাবে লক্ষ্য করে। তাই আছ বা আছি বলিতে যে বোধ বা প্রতীতি ফুটিয়া উঠে, সেই অস্তিত্ববোধকে প্রথম সর্ব্বদা জাগ্রত কর, আর তাহাই আনন্দময়েরই অস্তিত্ব বলিয়া ধারণা কর। আনন্দময়ত্বের উপলব্ধি প্রথমেই যদি না পাও, তাহাতে কুণ্ঠিত হইওনা। সত্তাবোধের দৃঢ়তা সে বোধ পরে ফুটাইয়া দিবে।

দেখ, একটি সুবর্ণ অঙ্গুরীয়কে যদি অঙ্গুরীয়মাত্র বল, তবে উহা আংশিক সত্যের ধারণা করা হইল। আর যদি সুবর্ণ অঙ্গুরীয় বল, তবে পূর্ণ সত্যের ধারণা হইল বুঝিবে। অর্থাৎ সে সুবর্ণ অঙ্গুরীয় পূর্ণ সার্থকতা তখনই পাইবে, যখন সেটীকে সুবর্ণ অঙ্গুরীয় বলিয়া বুঝিবে ও ব্যবহার করিবে। তদ্রূপ এ জগৎকে শুধু যদি বল জগৎ অথবা আপনাকে শুধু যদি "আমি" বলিয়া জান, তবে তোমার আংশিক সত্য জানা হইল বুঝিবে। আর যখন কারণ হইতে কার্য্য পর্য্যন্ত সমস্তটুকু তোমার বোধে

ও ব্যবহারে ফুটিয়া উঠিতে থাকিবে অর্থাৎ সত্যস্বরূপ জ্ঞানই জগৎ ও আমি সাজিয়াছেন, এই ভাবে বলিতে ও ব্যবহার করিতে পারিবে, তখনই পূর্ণ সত্য বলা ও সত্য ব্যবহার করা হইল বলিয়া জানিবে।

এ ব্যবহারের সময় সংশয় ও বিচার রাখিবে না। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার স্বরূপ নির্ণয়ে চেষ্টা করিবে না। কেন না, তাঁহাতে তোমার অধিকার এখনও আসে নাই। শুধু ব্যবহার কর আর ধন্য হও। আমি ধন্য—আমি সার্থক—আমি আজ জ্ঞানমূর্ত্তি তোমার চরণে প্রণত হইয়াছি—তোমার প্রতি নমস্কারে এইরূপ বোধ ফুটাইয়া তুলিতে থাক। ভুল নহে, সত্য। সত্যই আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছি—সত্যই তিনি রহিয়াছেন—আমার এ প্রণাম সত্যই তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে—আমার শির সত্যই তাঁহার পাদদেশে দেওয়া হইয়াছে—আমি ধন্য। আস্তিক্য-বোধের সাহায্যে এইরূপ সর্ব্বত্র সত্য-প্রতিষ্ঠা করিবে।

এই যে চিন্ময় সত্যের বিশ্বরূপ, ইহা জ্ঞানেরই বৈচিত্র্য বা জ্ঞানই। নামরূপের দ্বারা যাহা কিছু জ্ঞাত হও, সে সমস্ত সত্য বলিয়াই ধারণা করিবে অর্থাৎ তাহার দ্বারাই তোমায় সত্য-প্রতিষ্ঠার অনুশীলন করিতে হইবে। কেন না, জ্ঞানময় পরমাত্মার জ্ঞানের বা জ্ঞানক্রিয়ার বৈচিত্র্যই এ নামরূপময় বিশ্ব, ইহা বলিয়াছি। আর সে পরমাত্মা সর্ব্বান্তর—সকল অন্তরই তিনি। কিন্তু প্রথম তাঁহার সে বোধপ্রকাশ এ জগৎ, এ যে

অচেতন নহে—চেতনারই অচিদ্বিলাস বা অচিদ্‌বোধ, এ উপলব্ধি করিতে পারা দুঃসাধ্য। সুতরাং এ অচেতনরূপে প্রতীয়মান জগৎকে সত্যস্বরূপ পরমাত্মার মূর্ত্তি বা "সত্য" বলিয়াই ধারণা করিবে। ঋষিরা এইরূপ দেখিতেই আদেশ দিয়াছেন। "প্রাণো বা অমৃতং নামরূপে সত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ছন্নঃ।" প্রাণই অমৃত, আর নামরূপ সত্য। সত্যের দ্বারাই প্রাণ আবৃত। তুমিও এ বিশ্বের সমস্ত—যাহা কিছু দেখ, অনুভব কর, এ সমস্ত সত্যই তিনি। এ সত্য অচ্যুত। তুমি ত মুহূর্ত্তের জন্য এ সত্য হইতে—তোমার দেবতার হৃদয় হইতে বিচ্যুত নহ। আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে তুমি তাঁহাতেই রহিয়াছ—তাঁহাকেই পাইতেছ—তাঁহাকে লইয়াই জগদ্‌ব্যবহার করিতেছ। আর, মাত্র জগৎ দেখিও না, জগন্মূর্ত্তি সেই সত্যকেই দেখ—যিনি তোমার প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা—সকল সত্যের মহাসত্য।

কুণ্ঠিত হইও না। সাধারণ ভাল মন্দ কাজ লইয়াই মত্ত থাক, সুতরাং কেমন করিয়া সেই নিকৃষ্ট কাজগুলি তাঁহার চক্ষের উপর করিতেছি, তাঁহার সন্নিধানে থাকিয়া নিস্পন্ন করিতে হইতেছে, ইহা ভাবিয়া কুণ্ঠিত হইবারই কথা। তাঁহার সর্ব্বত্র বিদ্যমানতা মনে আসিয়া গেলে তোমার স্বাধীনতা, তোমার স্বেচ্ছাচার খর্ব্ব হইবে—সঙ্কুচিত হইবে। সুতরাং উহা মানা কর্ত্তব্য হইলেও ঐরূপ ভগবৎসান্নিধ্যযুক্ত জীবন অথবা তাঁহার সর্ব্বত্র অস্তিত্ববোধ প্রথমেই ত প্রিয় বলিয়া প্রাণ গ্রহণ করিবে না। কর্ত্তব্যপালনের মত গুরুভার ভাবিয়া প্রাণ যথাযথ এ

সাধনা অবলম্বন করিতে নমিত হইবে না। স্বেচ্ছাচারই সকল জীবের প্রিয়। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের সম্মুখে যেমন সংযত হইয়া থাকিতে হয়, আর সেইজন্য যেমন পিতামাতার সঙ্গ অপেক্ষা প্রিয় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গই মিষ্ট লাগে—সেই প্রকার অস্তিত্ব-বুদ্ধি সাহায্যে জগদ্ব্যবহার করিতে যাইলে সংযমের একটা আপাত অপ্রিয় গণ্ডীর মধ্যে যেন অবস্থান করিতেছি, এইরূপ বোধ হইবে, সুতরাং তাহা অপ্রিয় হইয়া পড়িবে। এরূপ ভাবিও না। না—সংযম নহে, পূর্ণ স্বাধীনতা—পূর্ণ নির্ভীকতা—পূর্ণ আশ্বাস—পূর্ণ নিঃশঙ্কচিত্ততা—পূর্ণ আনন্দ এ সাধনার লক্ষণ। দেখ—জগতে তোমার এমন কেহ নাই, যাহার নিকট অকপটে তোমার সকল কথা বলিতে পার, তোমার প্রাণের সকল কপাট খুলিয়া ধরিতে পার অথবা প্রাণের সকল ভাবের আদানপ্রদান বিনা সঙ্কোচে করিতে পার। প্রাণাপেক্ষা প্রিয় স্ত্রী অথবা বন্ধুর কাছেও পার না। ভাবিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। আরও দেখ, প্রত্যেক লোকের সহিত ব্যবহার করিবার সময় তাহার সহিত তোমার যে বিশিষ্ট সম্বন্ধ, যে বিশিষ্টভাবের আত্মীয়তা বা হৃদয়-বিনিময়, সেই ভাবটুকু, অবলম্বন করিয়াই করিতে হয়। মিত্রের সহিত শত্রুভাব, স্ত্রীর সহিত ভগ্নীভাব, ভ্রাতার সহিত পুত্রভাব—এ সব একান্ত বিসদৃশ হইয়া পড়ে। কিন্তু শুধু ঐ এক আশ্রয় আছে, যেখানে কিছু গুপ্ত থাকে না—কোন ভাব বিসদৃশ হয় না। তুমি যাহা ইচ্ছা, স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হইয়া

কর না কেন—তিনি সেখানে তার সাক্ষী আশ্রয়। ওরে, এমন ভূমি খুঁজিয়া পাবি না—তোর প্রাণের এমন কোণ বাছিয়া লইতে পারিবি না, যেখানে তাঁহার চক্ষু, তাঁহার কর্ণ নাই। তাই সে কপটতা চাহে না—সমাজের, মানব-ধর্ম্মের আবরণ সে গ্রাহ্য করে না। তাই শ্রুতি বলেন,—ব্রহ্ম সম্ভ্রম-রহিত, অনাদর। তুই যাহা করিস, সেই যে তাহার দাতা—প্রেরক! তুই কর আর দেখ, শুধু সে রহিয়াছে। আমি সমাজধর্ম্ম-মানবীয় ধর্ম্ম উপেক্ষা করিতে বলিতেছি না—যথাসাধ্য তাহা প্রতিপালন কর—কিন্তু শুধু তোর বুকের তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তোল—তোর প্রাণের কেন্দ্রে কেন্দ্রে সত্যের গম্ভীর দুন্দুভি বাজিয়া উঠুক, "তুমি রহিয়াছ" আর সঙ্গে সঙ্গে তোর পাপের ভয়—কর্ম্মফলের ভয়—চিত্তের মলিনতা—ক্লান্তি, চিন্তাজাল অপসারিত হ'ক। তুই বীর—তুই সত্যসেবী—তোর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের গুরুভার লঘু হইয়া যাইবে—এ বিচারবিভ্রমময় জীবনযাত্রা ক্রীড়ামাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। তাঁহাকে ত পাইতে হয় না—পাইয়াই ত রহিয়াছ—তোমার আমিত্বটুকু পর্য্যন্ত যাঁহাতে জাত ও স্থিত, সেই যে সে! সকলেই যে এইরূপে তাঁহাকে পাইয়াই রহিয়াছে। বরফ যদি জলের অন্বেষী হয়, তবে তাহা কি বরফের পক্ষে অন্বেষ্য? শুধু জান—শুধু জানিতে হয় যে, তাঁহাকে পাইয়াই রহিয়াছি। আর এ জানা শুধু বাক্যে নয়—কার্য্যে, বাক্যে, মনে, প্রাণে ব্যবহারে। ব্যবহারে জানাই তোমায় সত্যপ্রতিষ্ঠ করিয়া তোলে। সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার

জন্যই সত্যপ্রতিষ্ঠা। আর সেইরূপ সত্যপ্রতিষ্ঠ হইতে গেলে তাই সে সত্যের অস্তিত্ববোধ ও তদনুসারে ব্যবহার বা তাঁহাকে মানিয়া চলাই প্রথম সোপান।

কিন্তু আগে বিচার করিবে না। জিনিষ না পাইলে তাহার বিচার হয় না। জিনিষ না জানিলে তাহার সম্বন্ধে কোন বিবেচনা করা যায় না। আগে লাভ, তারপর বিচার। আগে বিচার, তারপর লাভ নহে। বিচার শুধু লব্ধ বস্তুকে বিশেষ করিয়া জানাইয়া দেয় অথবা তৎসম্বন্ধে যাহা জানিয়াছি, তাহার সত্যতা প্রতিপন্ন করে। বলিতে পার, অনুমান ও বিচার ত অনেক বস্তু লাভের সহায় হইতে দেখা যায়। কোন একটা অজানা দেশে যাইতে হইলে যেমন অনুমান ও বিচার সাহায্যে অনেক সময় দিক্ নির্ণয় করিয়া লইয়া, তবে সেখানে উপস্থিত হই, এ ক্ষেত্রেও তেমনই ত হইতে পারে? হাঁ ঠিক। কিন্তু সেই দেশের অস্তিত্ব ও তাহার দিক্ সম্বন্ধে একটা কিছু জ্ঞান থাকে, আর তাহা অবলম্বন করিয়াই তবে সে দেশমুখে তোমার গতি হয়। তেমনই আগে জান—"তিনি রহিয়াছেন", উপলব্ধি কর—"তিনি রহিয়াছেন" এ মহাসত্য। তাই আগে তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিও না,—"রহিয়াছ" ইহা বলিবার সময় তাহার সঙ্গে অন্য কোন ভাব ফুটিতে দিও না। শুধু অস্তিত্বের ভাবটি বাক্য হইতে মনে, মন হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে আত্মায় প্রেরণ করিতে থাক। দেখিবে, তুমি এই মৃত্যুময় কালরূপ বা বিশ্বরূপ হইতে আত্মস্থ, আত্মমূর্ত্তিতে গিয়া স্বস্থ হইবে।

আস্তিক্যবোধের উপলব্ধি কতটা সত্য হইল, তাহা পরীক্ষা করিবে—আপনার মৃত্যুভয় দিয়া। আমার মৃত্যু নাই, মরণেও আমি অমর, অস্তিত্বের ক্ষয় নাই, চ্যুতি নাই, এইরূপে যত মৃত্যুতে নিঃশঙ্ক হইতে থাকিবে, ততই বুঝিবে, তোমার অস্তিত্ববোধে সত্য-প্রতিষ্ঠা হইতেছে। তাই প্রতি পদার্থের বাহ্য আকার প্রকার উপেক্ষা করিয়া, নিজের বাহ্য আকার প্রকার উপেক্ষা করিয়া, "অস্তি",—"সৎ" এই ভাবটী অবলম্বন করিয়া সে অস্তিত্বের অমরত্ব বোধ করিবে। নামরূপ পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু সে নামরূপধারী সত্তা অমর, সনাতন।

এ অস্তিত্ববোধে সর্ব্বসময়েই যে সমস্ত চিন্তা বর্জ্জন করিয়া থাকিতে হইবে, তাহা নহে। পার, সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। কিন্তু সে অধিকার অনেক বিলম্বে আসে। এখন শুধু এই-মাত্র তোমায় করিতে বলি, যখন যে মুহূর্ত্তে তাঁহার অস্তিত্ব তোমার স্মরণে আসিবে, সে মুহূর্ত্তে তাঁহাকে প্রাণ দিয়া জড়াইয়া ধর। সে আলিঙ্গনে যেন বিন্দুমাত্র সংশয়, বিন্দুমাত্র অবহেলা, বিন্দুমাত্র উপেক্ষা, বিন্দুমাত্র প্রাণশূন্যতা না থাকে। প্রহরান্তে হউক, দিনান্তে হউক, পক্ষান্তে হউক, তবু ক্ষতি নাই; কিন্তু যখন সে তোমার বুকে আসিবে, তখন তাহাকে অনাদরে তোমার হৃদয়ের দ্বার হইতে ফিরাইও না। সে বড় আদরের কাঙ্গাল রে—সে বড় প্রাণের কাঙ্গাল; ওরে, প্রাণময় না হইলে কেহ প্রাণের কাঙ্গাল হইতে পারে না রে! শিবের ঘরে অন্নপূর্ণা, তাই শিব কাঙ্গাল রে! সে প্রাণের কাঙ্গালকে তোর কপটতার স্বর্ণমুদ্রা

দিতে চেষ্টা করিস না—তোর নগ্ন বুকের শাককণা দে,' উহাই আহার প্রিয়। অবশ্য প্রথমে কৃত্রিমতা থাকিতে পারে, কিন্তু সত্যের মহিমায় অচিরে তাহা বিলুপ্ত হইবে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এ কথা ভুলিও না।

বলিয়াছি, সত্যপ্রতিষ্ঠায় সকল সাধনাই বাহির ও অন্তর, উভয় অবলম্বন করিয়া করিতে হয়। বাহ্য জগৎ অবলম্বনে ও নিজের সত্তা অবলম্বনে, এই উভয়রূপে আস্তিক্যবোধ উজ্জীবিত করিবে। বাহিরের ব্যষ্টি পদার্থ অবলম্বন করিয়া অথবা সমষ্টি বিশ্বরূপ লইয়া বাহ্যে সত্যের আস্তিক্য-সাধনা করিবে। আবার নিজের প্রত্যেক বৃত্তি—প্রত্যেক অনুভূতি অবলম্বন কবিয়া অথবা নিজের সমষ্টি সত্তা লইয়া অন্তরে প্রতিষ্ঠা অভ্যাস করিবে। ইহাতে ক্রমশঃ অন্তর্ব্বাহ্য ভেদ তিরোহিত হইতেছে দেখিতে পাইবে এবং সমস্তই অন্তর বলিয়া বোধ হইবে। অন্তর্ব্বাহ্য এক হওয়ার ভাব উদয় হওয়া সাধনার একটী ঈষদুচ্চ স্তরে আরোহণ বুঝাইয়া দেয়।

ওগো, তোমরা যখন জলে নাম, তখন যেমন প্রথম ও প্রধান ভাবে তুমি জল দেখ, আর সেই জল বোধের উপর ফুটিয়া ওঠে তার বর্ণ, তার আয়তন, তার তরঙ্গাদির বোধ—তেমনই মাকে ডাকিতে গেলে তোমার প্রথম ও প্রধান ভাবে ফুটিয়া ওঠা চাই, —সত্য মাতৃবোধ। এ বিশ্ব দেখিয়া মাত্র স্বতঃসিদ্ধবৎ তোমার জ্ঞানে পরমাত্মাকে দেখিতেছি—এই ভাবে তাঁহার সত্তাবোধ ফুটিয়া উঠিলে, তবে বুঝিবে, তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমার ধারণা

দৃঢ় হইয়াছে, আস্তিক্য-বোধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই জন্যই বলি, চক্ষু চাহিয়াই যে মাকে দেখে, সে-ই মাকে দেখিতে পায়। আর মাকে অন্বেষণ করিতে যে প্রয়াস পায়, যে অব্যক্তের সাধক হয়—ইহা নহে, ইহা নহে, এই ভাবে অগ্রসর হইতে প্রয়াস পায়—তাহার পক্ষে আত্মলাভ দুষ্কর। ভগবান্ গীতাতে ঠিক এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। দেহজ্ঞান থাকিতে অব্যক্ত কূটস্থ আত্মসত্তা ধারণা ক্লেশযুক্ত। ইহা অচেতন জগৎ, ইহা অচেতন তন্মাত্রা, ইহা অচেতন মন, ইহা অচেতন বুদ্ধি, ইহা নহে—ইহা নহে, এই ভাবে যাহারা অন্বেষী, তাহাদিগকে নিজের পুরুষকারের উপর নির্ভর করিয়াই যেন এ দুরূহ মুক্তি-পথে অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু যাহারা আত্মার সত্যময় আয়তন ও বিশ্বরূপী ঈশ্বরমূর্ত্তির উপাসক, যাহারা তাঁহার ব্যক্ত মূর্ত্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, তিনি নিজে তাহাদিগের উদ্ধারকর্ত্তা হয়েন। এ ভব-সমুদ্রের তরঙ্গাবর্ত্তের মাঝে তাঁহার স্নেহময় কর তাহা-দিগের উদ্ধারের জন্য প্রসারিত হয় রে! ইহা তাঁহার নিজের শ্রীমুখের অমৃত-বাণী।

সাধারণ জীবের চেতন-সত্তার উপলব্ধি এত অল্প যে, বিষয় তাহাতে প্রতিফলিত না হইলে রহিয়াছে বলিয়া যেন জানাই যায় না। তোমরা যখন জাগ্রত থাক, তখন সর্ব্বক্ষণ বিষয়ানু-ভূতি থাকে বলিয়াই নিজেকে চেতনসম্পন্ন বলিয়া বুঝিতে পার; কিন্তু নিদ্রায় আপনাদিগকে তোমরা যখন সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেল, তখন তুমি যে রহিয়াছ, এ বোধটুকুও তোমার সম্বন্ধে

থাকে না। বিষয় সাহায্যে অনুভূতি-ক্রিয়া উজ্জীবিত না থাকাই সুষুপ্তির পরিপোষক। সূর্য্য-কিরণ পৃথিবীর উপর প্রতিফলিত হয় বলিয়াই আমরা আলোক উপলব্ধি করি। তেমনই সাধারণ জীবের অনুভূতি-ক্রিয়া বিষয় সাহায্যেই পরিস্ফুট থাকে। অর্থাৎ জগতের অস্তিত্বই তোমার নিজ অস্তিত্ব বোধকে ফুটাইয়া রাখে। সেই জন্য এ বাহ্য বিশ্বকে পরমাত্মার ঈশ্বরমূর্ত্তি বা তিনিই রহিয়াছেন, এইরূপ বোধ করিয়া, তাঁহার সত্তা ধারণা করিবে এবং তাহারই সাহায্যে স্বীয় সত্তার অনুভূতিও প্রকটিত হইতে থাকিবে। ইহার দ্বারা সত্তাবোধের তিন প্রকার বিশিষ্টতা পাইবে। প্রথম, এ বিশ্ব তাঁহারই মূর্ত্তি, এইরূপ ধারণা দ্বারা তাঁহার সত্তা স্বীকার করা হইবে বা তাঁহাকে বিশ্বরূপে দেখা হইবে। দ্বিতীয়, ওইরূপ দর্শনের সাহায্যে "অস্তিত্ব" বলিতে যাহা বুঝায়, সেই সত্তা-বোধ পরিস্ফুট হইবে এবং স্বীয় অন্তরস্থ সেই সত্তা-বোধে তন্ময় হইয়া অন্তর্ব্বাহ্য-ব্যাপী এক, অথবা অন্তর্ব্বাহ্যশূন্য ভেদশূন্য, দ্বিতীয়শূন্য বোধ-সত্তার আভাস আসিবে। সচ্চিদানন্দ আত্মার "সৎ"রূপী বোধটি এই প্রকারে তোমার উপলব্ধিতে প্রকাশ পাইতে থাকিবে। ওই সত্তাবোধই পরমাত্মার "সত্তা"নামীয় চেতনালোক।

ভাল করিয়া বলি। তিনিই যে এ বিশ্বরূপ, জগৎকে এই ভাবে দেখিলে দুই দিক্ দিয়া আস্তিক্যবোধ উদ্বুদ্ধ করা হয় প্রথম, তিনিই বিশ্ব, তাঁহাকেই দেখিতেছি—এই এক। আর এ বিশ্ব তিনিই, এইরূপ অনুভব করিয়া, আমার নিজের জগদ্-

বোধ, দেহবোধ, মনবোধ, প্রাণবোধ, অহংবোধ প্রভৃতির আশ্রয়স্বরূপ চেতনা রহিয়াছে, এই দ্বিতীয়। আর এই দ্বিতীয়টি অর্থাৎ চেতনা রহিয়াছে, এই যে জ্ঞানটি, ইহাই চেতনার অস্তিত্ব-বোধ বা চেতনার "অস্তিত্ব" নামীয় একটী আকার। আর এই দুইটিকে একত্র করিয়া লইলে সেই চিন্ময়ের সত্তা ও মহিমা একসঙ্গে অল্পবিস্তর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়া তোমার অচিৎদর্শন ক্রমশঃ বিদূরিত করিতে থাকিবে ও এ সমস্তই যে চেতন-বিলাস, এইরূপ প্রজ্ঞা ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে থাকিবে। ওগো, তিনি রহিয়াছেন, ইহা আমি অন্তরে অনুভব করিতেছি ; তিনি রহিয়াছেন, বাহ্যে আমি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি—আমার অন্তর্ব্বাহ্য ব্যাপিয়া তিনিই—শুধু তিনিই রহিয়াছেন, এইরূপ ব্যাপক সত্তাবোধে তোমার সমগ্র চেতনা পূর্ণ হইতে থাকিবে।

এই বাহ্য ও তাহা হইতে অন্তরে উপলব্ধিকেই বাহ্য সত্য-প্রতিষ্ঠা ও অন্তরে সত্যপ্রতিষ্ঠার অঙ্গস্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়। আমি বলিয়াছি, বাহ্যে অস্তিত্ববোধ সাহায্যেই অন্তরে অস্তিত্ব-বোধ ফুটিয়া ওঠে ও সমধিক উজ্জ্বল হয়। প্রকৃতপক্ষে সর্ব্ব-প্রকারবোধই অন্তরেই হয় ; বাহিরে কিছু বোধ করিতেছি যে বলি —সে অন্তরস্থ বোধেরই "বাহ্য" আকারীয় বিশিষ্টতা মাত্র। "বাহির" আকারে অন্তর্ব্ব্যাপ্তি প্রকাশ করিয়া "বাহ্য" কিছু বোধ করা হয় ; কিন্তু আমরা সাধারণতঃ যেন বাহির নামীয় অন্তর হইতে স্বতন্ত্র, অন্তরের সহিত সম্বন্ধশূন্য কোন কিছু বোধ করি—এইরূপ বুঝি। বাহ্য প্রকৃতপক্ষে আমার

"অন্তঃকরণের" বাহির হইলেও আমার যিনি প্রকৃত "অন্তর", তাঁহার বাহিরে নয়। সেই জন্য যতক্ষণ না অন্তর্বাহ্য ভেদ তিরোহিত হয়, ততক্ষণ বাহিরে তাঁহার অস্তিত্ববোধ করিবে এবং তাহা যে তোমার অন্তর বা তোমার অন্তরকেই বাহ্যে দেখিতেছ, এইভাবে বাহিরের উপর অন্তর্বুদ্ধি আরোপ করিবে। আবার সেই অন্তর্বোধ ঘন হইলে দেখিবে, সে বোধ—আস্তিক্যবোধ, অন্তর্বোধের সঙ্গে সঙ্গে তোমার অন্তরেই ঘুরিয়া আসিতেছে বা প্রকৃতপক্ষে সে অনুভূতি তোমার অন্তরেই প্রকাশ পাইতেছে। শুধু আস্তিক্যবোধে অনুভূতির বেলায় নয়—সকল অনুভূতিই এই ভাবে অন্তরে ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করা ভাল। কেন না, প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানময় পরমাত্মার সত্তা-বোধকে অন্তর্বাহ্যভেদবিহীন-রূপে পাওয়াই সাধনার উদ্দেশ্য।

এই দেখ্, তোর প্রাণের প্রাণকে শুধু তোর নিজের ঘরের ক্ষীণ আলোকে ম্লান করে দেখ্‌লে চল্‌বে না; বাহিরে অন্তরে তাহাকে দেখতে হবে, তার অনন্ত রূপ, অনন্ত শ্রী, অনন্ত শক্তিময় বিরাট্ ব্যক্ত-মূর্ত্তিকে দেখে তাতে মুগ্ধ হতে হবে। না হলে তাকে অন্তরের অন্তরে খুঁজে পাবি না। শুধু নিজের বুকের ভিতর তার অব্যক্ত মূর্ত্তি খুঁজে বাহির করতে গেলে আপনার ক্ষুদ্রতার আবরণে শূন্যে তাঁকে হারিয়ে ফেল্‌বি। শক্তি দেখে শক্তিমান্‌কে ধর। নতুবা তুই যতই প্রয়াস করিস্ না কেন, তোর স্বার্থান্ধ প্রাণ তাকে আত্মসমর্পণ করতে পারবে না। যতই ভালবাসার ভাণ নিয়ে তোরা বল্ না কেন যে, আমি

তার রূপ গুণ দেখ্‌তে চাহিনা, শুধু তাকেই আমার ক্ষুদ্র কুটীরের ক্ষুদ্র স্বামী করে, হৃদয়ে তাকে ধরে রাখ্‌তে চাই—সে কথা তোর ভাণ মাত্র হবে ততক্ষণ, যতক্ষণ তুই প্রকৃতপক্ষে তাকে জগৎময় দেখে তাতে মুগ্ধ না হ'স্। শ্রীরাধার মতও যদি তাকে পাস্, তবে শ্রীরাধারই মত আবার তাকে হারাবি। গীতায় এই জন্যই বিশ্বরূপ দর্শনের পর তবে ভক্তিযোগ অবতারণা করা হয়েছে। ওরে, তোমার জাগ্রৎ অবস্থায় যে প্রত্যক্ষ বিশ্ব আকারীয় চেতনা, ঋষিরা তাহাকেই অক্ষিগত পুরুষ বলিয়াছেন। এই অক্ষিগত পুরুষকে সেই পরমপুরুষ বলে নয়নে নয়নে রাখিয়া দাও। তোমার হৃদয়ের অনাদি-আবদ্ধ অন্ধকার তিরোহিত হবে।

বাহিরে সত্যপ্রতিষ্ঠার একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইব। মনে কর, সূর্য্যে তুমি সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতেছ। প্রথমে মনে করিবে, এই সূর্য্যরূপে পরমাত্মাই প্রত্যক্ষ রহিয়াছেন। যিনি আমার আত্মা, যিনি বিশ্বের আত্মা, যাঁহা হইতে আমি এবং এ বিশ্ব সত্য সত্য জাত হইয়াছে ও যাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে, তিনিই এই সূর্য্যরূপে বিরাজ করিতেছেন। ইনিই সূর্য্যরূপী আমার অন্তরের অন্তর, প্রাণের প্রাণ—সত্য। এই ধারণা দৃঢ়তর হইতে থাকিলে তোমার অনুভব হইতে থাকিবে, যেন তুমি ওই সূর্য্যে গিয়া উপস্থিত হইয়াছ, ওইখানেই রহিয়াছ, ওইখানে সূর্য্যময় হইয়া তোমার অন্তর অবস্থান করিতেছে। যদি এইরূপ অনুভূতি হয়, তবেই বুঝিবে, তোমার সত্য-বোধ উদ্বুদ্ধ হইতেছে এবং

যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত ওইরূপ ধারণা করিতে থাকিবে। তার পর কি করিতে হইবে, সে কথা পরে বলিব।

যেমন সূর্য্যে, তেমন যে কোন পদার্থে সত্যপ্রতিষ্ঠা অনুশীলন করিবার সময় ঠিক সেইরূপ করিবে। সর্ব্বদা এই ভাবে তাঁর অস্তিত্ববোধ করিতে থাক। বিরাম নাই—বিরাম নাই ততক্ষণ, যতক্ষণ না তুই সত্য সত্য তাঁর আশ্রয়ে রহিয়াছিস্—এ অনুভূতি তোর প্রাণে অচলরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ওরে, ততক্ষণ তোর কোন কাজ নাই, তোর তপ জপ, ধ্যান ধারণা উপাসনা কিছু নাই, যতক্ষণ না তুই এ সত্যে তোর অন্তরকে পূর্ণ করিতে পারিস যে—সত্য তিনিই রহিয়াছেন। শুধু কল্পনা নয়, অনুভূতি —অনুভূতিতে এ সত্য চাই। জান, শুধু তিনি রহিয়াছেন। ওরে, ঘরে অন্ন যদি না থাকে, তবে ক্ষুধার তাড়নার মাঝে তবু একটা নিশ্চিন্ততা থাকে যে, প্রকৃত আমার অন্নের অভাব। কিন্তু গৃহে যদি অন্নের অভাব না থাকে অথচ যদি ক্ষুধার তাড়নায় জর্জ্জরিত হইতে হয়, সে বড় অশান্তি রে। যিনি ভিন্ন কিছুই নাই, তাঁহাকে দেখিতে, তাঁহাকে ধরিতে শুধু রাশি রাশি বিচারের জাল মানুষ তৈয়ার করিতেছে। সত্যবোধে বিন্দুমাত্র ফাঁক থাকিলে যিনি গলিয়া পালান, তাঁকে চাহিস সহস্র গ্রন্থিময়, সহস্র কৌশলে বোনা, সহস্র রন্ধ্রযুক্ত জাল দিয়া ধরিতে! হায় অন্ধ মনুষ্য!

আশ্রয়-আশ্রিত-বোধ

কোন পদার্থের স্বরূপ বোধ করাকে সত্যবোধ বলে। বস্তুতঃ যাহা, সেইটীকে সেইরূপ বলা বা জ্ঞান করাই সত্য বলা—সত্য জ্ঞান করা, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সেই বলা ও জ্ঞান করা এমন মাত্রায় যদি হয় যে, সেইটির সম্বন্ধে আমার সমগ্র ব্যবহার সেই জ্ঞানের অনুশাসনে হইতে থাকে, আমার অন্তর্ব্বৃত্তি সেই জ্ঞানানুসারে আবর্ত্তিত হইতে থাকে, তবেই বুঝিব, সেইটীতে সত্যপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে বা আমি সেই জ্ঞানের আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছি। যেমন অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধে, তেমনই "সত্য" এই শব্দ সম্বন্ধেও এক রকম বিশিষ্ট বোধ আছে। সত্য বলিলেই একটা কিছু নিত্য অস্তিত্বের শাশ্বত ভিত্তি—যাহা ভাঙ্গে না, বিচ্যুত হয় না, নষ্ট হয় না, পরিবর্ত্তিত হয় না—এইরূপ সুদৃঢ় আশ্রয়বৎ ভাব বা বোধ উদ্বুদ্ধ হয়। সত্য বলিয়া যাহা বলিতেছি, সেই সত্তার অবিচল ভাব বা তৎসম্বন্ধীয় সর্ব্বভাবের অনতিক্রম্য আশ্রয়বৎ ভাবই সত্য শব্দের মর্ম্ম—বীর্য্য। কোন বিশিষ্ট বস্তুকে সত্য বলিলে, সেই বিশিষ্ট বস্তু সম্বন্ধে যত কিছু জানা আছে, সেইগুলি যেন অন্তরে প্রতিষ্ঠা পাইবার একটা আশ্রয় পায়—যেন সেই সব জ্ঞাত ভাবগুলি টানিয়া আনিয়া, এক জায়গায় গ্রথিত করিয়া রাখিবার একটী ভূমি, একটী চেতনা ফোটে। আর "সত্য নয়" বলিলে সে বিসয় সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিয়াছি, সব যেন নিরাশ্রয় হইয়া আকাশে লীন হইয়া যায়। তেমনই কোন বিশিষ্ট বস্তুকে লক্ষ্য না করিয়া যদি

নির্ব্বিশেষ ভাবে শুধু "সত্য" এই শব্দটীকেই ভাবি বা ধারণা করি, তাহা হইলে নির্ব্বিশেষ সত্তা, নির্ব্বিশেষ আশ্রয়বোধরূপ অন্তরের এক প্রকার বৃত্তি ফুটিয়া উঠে। সেই বোধকেই আশ্রয়বোধ বলে। পরমাত্মা সমস্ত জগৎকার্য্যের এইরূপ এক-মাত্র মূল সত্তা, মূল আশ্রয় বলিয়াই সত্য শব্দে তাঁহাকে অভি-হিত করি। তুমি সত্য—সত্য—তুমিই সত্য। তুমি কেমন, তাহা জানি না, কি রূপ তোমার, তাহা জানি না, জানি—কেবল তুমি সত্য, তুমিই নিত্য, সমস্ত সত্য মিথ্যার আশ্রয় তুমি, তুমি সত্য, তুমি সর্ব্বব্যাপী। আর সেই তুমি আমার জন্ম-স্থিতি ও লয়ের কারণ। আমি তোমাতেই জাত, স্থিত ও লীন হই। তুমি এ বিশ্বের জন্ম-স্থিতি-লয়ের কারণ। বিশ্ব তোমাতেই জাত, স্থিত ও লয় হয়। সত্য সত্য আমি ও এ বিশ্ব তোমাতেই জন্মিয়াছি, তোমাতেই অবস্থান করিতেছি—সত্য সত্যই তোমাতেই অবস্থান করিতেছি। তোমাতেই সত্য সত্য এ বিশ্ব ও আমি লীন হইয়া যাই। এই রকমে পরমাত্মরূপ সত্যে সত্যবোধ উদ্বুদ্ধ করিতে হয়। কেন না, যিনি যথার্থ আমার ও এ বিশ্বের মূল কারণ—পরমাত্মা, তাহাকে সত্য ও পরমাত্মা বা ব্রহ্ম শুধু এই জন্যই বলে। তাঁহাতে জাত, স্থিত ও লয় হয় বলিয়াই তিনি এ বিশ্বের সত্য আত্মা। তাঁহাতে আমি সত্য সত্য জাত, স্থিত ও লয় হই বলিয়াই তিনি আমার সত্য আত্মা। 'ওগো সত্য, আমি কিছু জানি না—জানি শুধু তুমি আমার জন্ম-স্থিতি-লয়ের আশ্রয়—মূল সত্তা। সত্য সত্যই তুমি

এ বিশ্বের জন্ম-স্থিতি-লয়ের মূল সত্তা। তোমার সঙ্গে এই সম্বন্ধই সত্য সম্বন্ধ। এই বোধই আশ্রয়-আশ্রিতবোধ।

সত্যস্বরূপ পরমাত্মায় সত্য আস্তিক্যবোধ যে পরিমাণে ঘনীভূত হইবে, সেই পরিমাণে পর পর আশ্রয়-আশ্রিত-বোধ, আত্মীয়-বোধ ও আত্মবোধ জাগিবে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সত্যপ্রতিষ্ঠার মাত্রার ক্রমানুসারে এই তিন ভাব উজ্জীবিত হয়। একটু বিশেষ ভাবে সত্যবোধ ঘন হইলে আশ্রয়-আশ্রিতবোধ ফোটে। তদপেক্ষা ঘন হইলে আত্মীয়-বোধে প্রাণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে থাকে। আর চরম ঘনীভূতিই আত্মবোধ—তিনি আমি এক হইয়া যাই। প্রথম স্তর অর্থাৎ আস্তিক্যবোধ একটু বিশেষভাবে প্রাণে সত্য হইয়া জাগিয়া উঠিলে, সালোক্য-মুক্তির মত ভাব প্রাণে আধিপত্য করে। তাঁহার সঙ্গে এক লোকে, এক ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছি, এইরূপ কতকটা অনুভব হইতে থাকে। সত্যপ্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ আশ্রয়-আশ্রিত-বোধ সত্য হইয়া উঠিলে সামীপ্য-মুক্তির ভাব জাগিয়া উঠে। যেন তাঁহার নিকটে রহিয়াছি, তাঁহারই কাছে কাছে ফিরিতেছি, এমনই মনে হয়। তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ সত্যপ্রতিষ্ঠার আরও ঘনীভূতিতে যখন আত্মীয়ভাব জাগে, তখন থাকিয়া থাকিয়া তাহাই হইয়া যাইতে হয়। আমিত্বটা হারাইয়া যায়, সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়া তন্ময় হইয়া, ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার ধর্ম্মে ধর্ম্মী হইয়া, চেতনা তদাকার গ্রহণ করে। ইহা সারূপ্য-মুক্তির ভাব। আর সাযুজ্য ভাব

তখনই হয়, যখন সেই সারূপ্য অবস্থান সম্যক্ হইয়া যায়—তাঁহাতে সমাধিস্থ হইয়া, চেতনা তাঁহাতেই বিলয় হয়।

সাধকদিগের তিনটী ভাব দেখিতে পাওয়া যায়,—জীব-ভাব, ভক্ত বা সাধক-ভাব ও ঈশ্বর-ভাব। কখনও দেখি, তিনি সাধারণ মানুষের মত ব্যবহার করিতেছেন, তাহারই মধ্যে কখনও বা ভগবানের স্মরণে তাঁহার প্রাণ আত্মস্থ হইবার জন্য অন্তর্মুখে গতিশীল হইয়া তাঁহাকে স্তব্ধ করিয়া দিতেছে অথবা হর্ষ অশ্রু-পুলকাদি তাঁহাতে প্রকাশ পাইতেছে, কিংবা তাঁহার প্রাণ বহির্মুখে লগ্ন থাকায়, প্রাণের সেই অংশটীর উদ্বেলনে তিনি নৃত্য বা অঙ্গবিক্ষেপাদিময় হইয়া পড়িতেছেন। আবার কখনও তিনি সারূপ্যবোধে মগ্ন হইয়া আপনাকে ঈশ্বর করিয়া ফেলিতেছেন ও তদ্ভাবীয় কথা বলিতেছেন। অথবা পূজাদি করিতে যাইয়া আপনার পায়েই ফুল দিতেছেন বা শালগ্রামাদির অথবা ঘটের উপর যাইয়া উঠিয়া পড়িতেছেন—এ সকল এই ঈশ্বরসারূপ্য-বোধের লক্ষণ। এই রকম লক্ষণ-সকল প্রকাশ পাইলে অজ্ঞ লোকে তাঁহাকেই ঈশ্বরের অবতার বলিয়া দুনিয়ায় একটা বিরাট্ হৈ-চৈ ফেলিয়া দেয়। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একটা নূতন দল, নূতন মত, নূতন কিম্ভূত-কিমাকার একটা কিছু করিয়া তুলে ও সাধনক্ষেত্রটা রহস্যময় করিয়া ফেলে। এ কিন্তু সকল সাধকেরই হয়। আর হওয়াই স্বাভাবিক। তবে তাহাতে ও রকম একটা অবতার গড়া ঠিক্ নয়।

যাহা হউক, আস্তিক্যবোধ যে পরিমাণে সত্য হইয়া পড়ে, সেই পরিমাণে ঐ সকল ভাব প্রকাশ পায়।

কিন্তু আমি বলিতেছিলাম, আশ্রয়-আশ্রিত-বোধের কথা। সত্য রহিয়াছেন—এইটা একটু মনে হইলেই 'তিনি যে একমাত্র আশ্রয়, সত্যই আশ্রয়, সত্যই আমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহাতেই রহিয়াছি, তাঁহারই দ্বারা চালিত হইতেছি, তাঁহার কর্ত্তৃত্বে এ সমস্ত বিশ্ব এবং আমি চলিতেছি, অন্য কর্ত্তা নাই, এ ত্রিভুবন তাঁহারই অনুশাসনে চালিত—এই রকমের ভাবগুলিতে ব্যবহারিক অধিকার আসে। ঐ রকম জ্ঞানের অধীনে জীবনের গতিটা নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে বা হইবার চেষ্টা করিতে থাকে। জীবনপন্থার প্রত্যেক মোড়ে তাঁহাকেই দেখে, প্রত্যেক কাজে তাঁহারই হাত দেখিতে পায়, প্রত্যেক ক্লান্তিতে তাঁহারই ক্রোড়ে মাথা পাতিয়া নিশ্চিন্ত হয়। শুধু মুখে নহে, সত্য-বোধে, জীবন তাহার ঐ রকম ভগবদাশ্রিত হইয়া পড়িতে থাকে ও সে নিজেকে সত্য বলিয়া অনুভব করে।

প্রতিমা, ইষ্টমূর্ত্তি, মন্ত্র অথবা জপ, যোগ, কীর্ত্তন, ধ্যান—সব সত্যের হয়; সবই তাহার সত্যের আশ্রয়ে হয়। আর সত্য সত্যই যে, যে পথে বিচরণ করুক, যে, যে ভাবেই তাঁহাকে উপাসনা করুক, সত্যপ্রতিষ্ঠা ও আশ্রয়-আশ্রিত-বোধ যদি না থাকে, তবে সব সাধনারই পথ তাহার পক্ষে মিথ্যা; সকল শ্রমই প্রায় পণ্ডশ্রম। আর সত্যপ্রতিষ্ঠা হইলে, আস্তিক্যবোধ একটু ঘন হইলে অথবা আশ্রয়-আশ্রিতবোধটা

সঞ্জীব হইয়া উঠিলে সকল প্রণালীই সার্থকতা আনিয়া দেয়। "ভগবান্‌কে পাইবার জন্য মাটি কাটিতেছি" বলিলেও আমি বলি না যে, তুমি ভুল পথে চলিয়াছ—যদি দেখি, সে জ্ঞানের উপর তোমার সত্যপ্রতিষ্ঠা আছে। কেহ এমন আশঙ্কা করিতে পারে যে, উন্মাদ "আমি রাজা, আমি রাজা" এই বলিয়া চিৎকার করিলে সত্য সত্য যেমন রাজা হয় না বা রাজত্ব পায় না—একটা ভাব-মোহ সত্যের আকারে তাহার চেতনায় অভিব্যক্ত হইয়া, তাহাকে ঐ রকম চিৎকার করায়—সত্যপ্রতিষ্ঠায় সেই রকমও ত হইতে পারে? অর্থাৎ "তুমি রহিয়াছ, তুমি রহিয়াছ" এই রকম ভাবকে সত্য করিবার জন্য বার বার প্রচেষ্টা করিলে, সেই রকম একটা ভাবমোহ গঠিত হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাতে কি যথার্থ আশ্রয় বা সত্য লাভ হইবে? এ আশঙ্কা অমূলক। কেন না, মিথ্যা একটা কোন ভাবে মুগ্ধ হইয়া সেইরূপ ব্যবহার করিলে, সেখানে ভাবের আশ্রয়টা হয় মিথ্যা, আর সে ভাবটা ক্ষণপরে ভাঙ্গিয়া যাইলে, সে আবার আপনাকে নিজ প্রকৃতিতেই ফিরিয়া আসিতে দেখে। সেটা একটা মোহের অভিভূতি—একটা তামসিক সমাচ্ছন্নতা। সত্যপ্রতিষ্ঠা তাহা নহে। সত্যপ্রতিষ্ঠা একটি সত্য সাত্ত্বিক প্রকাশ, একটি সত্য অনুশীলন. একটি প্রচ্ছন্ন-শক্তি উজ্জীবিত করা; সার্থকতামুখী বীর্য্যবত্তাই ইহার সমস্তটা। ইহা একটি লুক্কায়িত সত্যকে আবিষ্কার করিয়া লওয়া মাত্র। আর তদুপরে অভিভূতি থাকিলেও তাহা সত্য। কেন না,

বস্তুতঃ-সত্যপ্রতিষ্ঠার দ্বারা লাভ হইবে—সত্যবোধ। বোধ নিজে সত্য বলিয়া, কোন কিছুকে আত্মা বলিয়া মানিলে, বোধের সেই সত্যতাই জাগিয়া উঠে। সে স্বাধীনভাবে সেই বোধের সত্যতায় সত্য হইয়া উঠে এবং যেটিকে সে আত্মা বলিতেছিল, সেইটির সত্য-সাধনা হইয়া গিয়া, ফলাকারে তাহাই লাভ করে। সে সত্যে অর্থাৎ আত্মায় সত্যবোধ করে, তাই সে উন্মাদের মত মিথ্যায় অভিভূত হয় না—সত্যেই উজ্জীবিত হয়। অর্থাৎ বোধস্বরূপ আত্মাকেই সত্য বলিতেছে বলিয়া আত্মসত্তাই প্রকাশ পায়। সেই বোধকেই সে বাহ্যে সত্য বলিয়া দেখে, তাই তাহার এ বোধের সার্থকতা লাভ হয়। তামসিক অভিভূতিতে এ সত্যতার বিকাশ থাকে না। থাকে শুধু কল্পনার বিলাস, মোহ, আচ্ছন্নতা বা সত্যজ্ঞানের অভাব—সেইটা সে ক্ষণকাল ভোগ করিয়া অভিভূত হয়। তাহার পর মিলাইয়া যায়—সেইটা শূন্যে। একটা শূন্যতা প্রাণের উপর ছড়াইয়া পড়ে। অনেকের কীর্ত্তনাদির সময়ে ভাব হওয়া তোমরা দেখিয়া থাকিবে। তাহাতে বেশীর ভাগ এই মোহাভি-ভূতি থাকে, আর তাই সেইগুলি ফুরাইয়া যাইলে, বালির শুষ্ক তটভূমি ভিন্ন জল আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অবশ্য একেবারেই পাওয়া যায় না, তাহা বলিতেছি না—পাওয়া যায়; কিন্তু ততটুকুই পাওয়া যায়, যতটুকু সত্যতার প্রকাশ তাহার তলায় থাকে। বড় দুঃখ হয় দেখিয়া, অনেকেই বাঁটে মুখ দিয়া দুধ খাইতে পাইয়া থাকুক বা না থাকুক, নাচিয়া কুঁদিয়া পেট

ভরায়। অভিভূতিটার দিকে ফিরিয়া তাহারা মাকে ডাকে, মাকে ডাকিয়া অভিভূত হয় না। আশ্রয়বোধ সত্য হইলে অর্থাৎ সত্যবোধ আশ্রয়বোধের আকার লইলে, তখন ভীতি তাহার বুক হইতে দূর হইয়া যাইতে থাকে। মৃত্যুতেও ভীতি প্রকাশ হয় না। বিপদ্ তাহাকে বিচলিত করে না। বিফলতা তাহাকে হতাশে মগ্ন করিয়া ফেলে না। তাহার মনে হয়, পর্ব্বতও তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিবে। সে দেখে, একজন তাহাকে বুকে করিয়া রহিয়াছে, তাহাকে হাত ধরিয়া চালাইতেছে, অভয় কর তুলিয়া সমস্ত বিপদের মাঝেও তাহাকে অভয় আশ্বাস দিতেছে। তাহার প্রয়োজন হইলে সমস্ত বিশ্ব তাহার ইঙ্গিতে ফিরিয়া ঘুরিয়া বসিতে পারে। তাহার প্রতি পদক্ষেপে ছুনিয়া যেন সত্রাসে ফিরিয়া চাহিয়া দেখে—সে কি চাহে। সমস্ত শক্তি যেন তাহার আয়ত্তীভূত। তাহার আত্মা তাহাকে যেন বলিতে থাকে—তুই অমৃতস্বরূপ, অভয়স্বরূপ, তুই সত্যাশ্রিত, সত্যপুষ্ট, সত্যজীবী, তোর ক্ষয় ব্যয় নাই, বিনাশ নাই। সে গ্রাহ্য করে না, বিশ্বটা যদি তাহার পায়ের তলায় সরিয়া যায়, আকাশটা যদি খসিয়া আসিয়া তাহার মাথায় পড়ে। সব যদি যায়, সব যদি লুপ্ত হয়, তবু সে ঠিক আছে—সত্যে আছে—অবিকম্প স্থির। সর্ব্বপ্রকার পাপ করিয়া সে পাপী নয়। নরকে নামিয়াও সে সত্য—সে স্থির—দীপ্ত—দৈবসম্পৎ-সম্পন্ন—সত্যের কুমার;—বহু ঊর্দ্ধে—বহু ঊর্দ্ধে—সে মিথ্যার লাঞ্ছনা হইতে—পাপের অনুশোচনার গহ্বর হইতে—দৈন্যের

লুণ্ঠন হইতে—ভীতির মূর্চ্ছা হইতে—ভিখারীর রোরুদ্যমানতা হইতে। সে দেখে—না দেখিয়াও দেখে—নারায়ণ তাহার সারথি—স্বর্গে বা রৌরবে। ব্রহ্মা তাহার আশীর্ব্বাচক—আচারে বা অনাচারে। মহেশ্বর তাহার গুরু—প্রণিপাতে বা বিদ্রোহে। নগ্না শ্মশানবাসিনী সেই তারকব্রহ্মরূপিণী মেয়েটি তাহাকে বক্ষে লইয়া, তাহার নর্ত্তন ভুলিয়া, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে—দৃষ্টি অনিমিক—মুখে মা ভৈঃ! সেই মেয়েটি—যাহার মিথ্যার বসন অঙ্গে নাই—নগ্না সত্য—মিথ্যার রুধিরপানোল্লাসময়ী সত্য!

অবশ্য যাহার সত্যপ্রতিষ্ঠা যতটা হইবে, আশ্রয়-আশ্রিত-বোধ সেই পরিমাণে এই রকমের মূর্ত্তি লইতে থাকিবে।

আর সঙ্গে সঙ্গে এই বাহ্য বিশ্ব—যাহা অচেতন বলিয়া এত দিন জানিয়াছিল—বুঝিয়াছিল—দেখিতে থাকিবে—ইহার বায়ু, আকাশ, জল, ইহার মাটি, ইহার সূর্য্য চন্দ্র—এ সব অচেতন নহে—এক মহাশক্তি—তাহার আশ্রয়দাতা—তা'র পালক। ইহা "একটা" জগৎ নহে—"একজন" জগন্মূর্ত্তি। জীবন্ত সত্য, সত্য একজন মহাশক্তিসম্পন্ন মহান্ আশ্রয়।

আস্তিক্য-বোধে সত্য-প্রতিষ্ঠা ঘন হইয়া না উঠিলে আশ্রয়-আশ্রিত-বোধ ফোটে না। কোন কিছুই হয় না, কোন কিছুই ফোটে না—আস্তিক্য-বোধের সাধন অভাবে। সহস্র লোক আসিয়া বলে—"মনটা স্থির করিতে পারি না, ইহার কিছু উপায় করিয়া দিন।" মন কেমন করিয়া স্থির হইবে? আমি বলি, ওরে, মন আগে অস্থির হইয়াছে কি না দেখ্। মন অস্থির

আগে হউক, তারপর স্থির আপনা হইতে হইবে। আরও দেখ, কোন প্রিয়জনের চিন্তায় তোমাদের মন বেশ'ত একধারায় বহে। স্ত্রী পুত্র কেহ পীড়িত হইলে মনকে সেই দিক্ হইতে ফিরাইতেও পার না? পুত্রের উপর জননী যেরূপ মনঃসযোগ করে, সে রকম মনঃসংযোগ কই ভগবানে হয়? মা ত ছেলের উপর মনঃসংযোগ করিতে কোথাও যোগযাগ শিক্ষা করে না! চিত্তবৃত্তি একমুখী করিবার জন্য তাহাকে গুরুর উপদেশ লইতে হয় না! সে ত সহজভাবে হয়। যত আপদ্ ভগবানের বেলা! তাহার কারণ, এই সত্য-বোধের অভাব। তিনি যে সত্য রহিয়াছেন, সত্যই আমার ভগবান্ আছেন, এই বোধ যদি জগদ্বোধের মত ঘন হইত অথবা আমার সেই সত্য ভগবান্‌কে এই এখন আমি ডাকিতেছি—সত্য সত্য ডাকিতেছি—বোধ যদি এই-রূপ সত্যভাবে বুকে খেলা করিত, তাহা হইলে মন আপনা হইতে তাঁহাতে আত্মহারা হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া যাইত। প্রবাসে যাইয়া বাটীস্থ স্ত্রী-পুত্রের দিকে সকল কার্য্যের ভিতর দিয়া মনের একটা অন্তর্গতি থাকে, তেমনই ভাবে ভগবানের দিকে সত্যের একটা অন্তর্গতি সর্ব্বদা দেখিতে পাইতে। ধ্যান, মারিয়া ধরিয়া হয় না—আপনা হইতে আসে—এ কথা সত্য-প্রতিষ্ঠা হইলে নিজে নিজেই বুঝিতে পারিবে। আর যত এই রকম প্রাণ তাঁহার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে থাকিবে, ততই পরম আশ্রয়রূপে তুমি তাঁহাকে মর্ম্মের ভিতর আঁকড়াইয়া ধরিতে থাকিবে—ততই নিশ্চিন্ত হইবে—নির্ভীক হইবে।

অঘাসুর গিরিখণ্ডের আকার গ্রহণ করিয়া মুখব্যাদান করিয়া পড়িয়া আছে। রাখাল বালকেরা তাহার মুখটা পর্ব্বত-গহ্বর মনে করিয়া, খেলার জন্য তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ চলিতেছেন পশ্চাতে পশ্চাতে। সকলেই প্রবিষ্ট হইবার পর অঘাসুর উপযুক্ত সময় বুঝিয়া মুখ বন্ধ করিতে আরম্ভ করিল। রাখাল বালকেরা সেই অঘাসুরের অঙ্গসঞ্চালনে আপনাদের ভুল বুঝিয়া, ভীত হইয়া ছুটিয়া পালাইবার জন্য সচেষ্ট হইতেই তাহাদেরই একজন বলিল, "ভয় কি? কৃষ্ণ রহিয়াছে।" ভগবান্ বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তিতে সেই অসুর সর্পকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

এমনই যদি তুমি জানিতে থাক—তোমার আশ্রয় তোমার নিকটেই রহিয়াছেন, তোমাতেই রহিয়াছেন, সমস্ত পাপ, সমস্ত বিপদ্ বিদীর্ণ করিয়া তিনি তোমায় রক্ষা করিবেন, আশ্রয় দিবেন।

সত্য পদার্থ পাইলে তবে ত তাহাকে সত্য বলিব! কিছু দেখিতে শুনিতে পাইলে, আমার হৃদয়-দানের কোন হৃদয়ময় উত্তর পাইলে তবে ত সত্য বলিয়া ধারণা হইবে; নতুবা কিসের উপর জোর দিয়া কাহাকে সত্য বলিব? এই রকমের প্রশ্ন প্রাণে উঠিতে পারে। উঠিতে এই জন্য পারে যে, অচেতন-দর্শনশীল জ্ঞান-চক্ষু চেতনশীল বলিয়া এ জগৎকে সহজে ধারণা করিতে পারে না। করিতে চেষ্টা করিলেও সহজে হয় না। সেই জন্য সাধনার পথে চলিতে যাইয়া পদে পদে জীবের

সন্দিগ্ধ প্রাণ, পথ পরীক্ষা করিয়া চলিতে চায় ও প্রতিদান অন্বেষণ করে। কিন্তু তাহা করিবে না; কেন না, তাহাতে এখন অধিকার নাই। যাঁহাকে মান নাই, তিনি প্রতিদান দিলেও তাহা পাইতে পার না। আগে অধিকার হউক, দেখিবে—তোমা অপেক্ষা অনেক বেশী তিনিই তোমায় দেখিতেছেন। তিনি তোমাকে তাঁহার বুকটা সর্ব্বতোভাবে ঢালিয়া রাখিয়া দিয়াছেন—তোমার স্বাধীন ইচ্ছা-বিলাসের জন্য, তোমায় অহমিকার যদৃচ্ছা স্ফূর্ত্তি ভোগ করিতে দিবার জন্য। অতি অজ্ঞাতসারে, অতি অজ্ঞাতে তোমার অহমিকার তলায় তলায়, অজ্ঞাতে তোমার কর্ম্মের আবর্ত্তনে তিনি শুধু এক কর্ম্মফলরূপ ক্ষেত্র, আইনের মত ঠিক করিযা রাখিয়া দিয়াছেন—যাহাতে তুমি আপনার অহমিকায় আপনি ঊর্দ্ধে নিম্নে যাইবে, ভাঙ্গিয়া পড়িবে, আবার নূতন উদ্যমে বুক বাঁধিয়া ছুটিতে থাকিবে। আর প্রত্যেক ভঙ্গে ভঙ্গে প্রতিঘাত পাইয়া এক অনির্দ্দেশ্য চালকের অস্তিত্ব তোমার বুকের উপর ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। তাঁহার এই লুকানই—তাঁহার ভালবাসার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—তোমাতে আত্ম-দানের আদর্শ ব্যবহার। তিনি এমন করিয়া না লুকাইলে তুমি এমন করিয়া কর্ত্তৃত্ব ভোগ পাইতে না। আমি এ জগৎ-প্রকাশ-রূপ মহাশক্তিবিলাস অপেক্ষা তাঁহার এই লুকাইয়া থাকাতে অধিক মহিমা দেখিতে পাই।

দেখ, কেহ যদি তোমায় একটি পয়সা দিয়া একদিন উপকার করে, তুমি চিরদিন তাহাকে মনে পড়িলেই বা

দেখিলেই তাহার নিকট কৃতজ্ঞতায় নতশির হও। আর যেখানে তোমার সমস্তের জন্য তুমি ঋণী, সেইখানে সত্যের কৃতজ্ঞতাবোধ তুমি কতটা প্রকাশ করিতে সমর্থ হও? সত্য-রূপে না জানার জন্য এতটুকু কৃতজ্ঞতা তুমি প্রকাশ করিতে সমর্থ হও না, তবে কেমন করিয়া তুমি তাঁহার সাক্ষাৎ আদান-প্রদানে অধিকার লাভ করিবে?

এই জন্য ঐ ভাবে আগে ফলের দিকে দৃষ্টি দিবে না। দেখিবে, শুধু কি পরিমাণে সত্য হইয়া উঠিতেছে তাঁহার অস্তিত্ব-বোধ। কি পরিমাণে তুমি বুঝিয়াছ, সত্যই তোমার সত্য আশ্রয়। আর দেখিতে শুনিতে তাঁহাকে না পাইলেও তোমার সত্যবোধ উদ্বুদ্ধ করিবার কোন অভাব হয় না। কেন জান? সত্য—তুমি যেখানেই, যে পদার্থে সত্যবুদ্ধি আরোপ কর—কার্য্যতঃ সে বাহ্য পদার্থ—যাহাতে সত্যবুদ্ধি আরোপ করিয়াছ, সেইটি তোমার অন্তরের বোধশক্তি বা বোধময় আত্মাকেই সত্যমূর্ত্তিতে আবির্ভূত করায়। তোমার বোধই সত্যনামীয় আকার ধারণ করে। যেমন ফল ফুল জগৎ তোমার অনুভূতি—তোমার অনুভূতিকেই ঐ সকল রূপে দেখ—তেমনই সত্যনামীয় অনুভূতি তোমার অন্তরে ফুটাইয়া তোলাই এ সত্যপ্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। কেন না, উহাই প্রকৃত আশ্রয়-বোধ বুঝায়। বাহ্য পদার্থে বা প্রতিমাদিতে সত্যবুদ্ধি আরোপ করিলে জড়জ্ঞানসম্পন্ন সাধারণ অজ্ঞ জীব—সে সত্যবোধকে অতি সত্বর উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারে। আর ঐরূপ তুলিতে

তুলিতেই অন্তরনামীয় কেন্দ্রের আভাস বুকে ফুটিতে থাকে। তবে অন্তরে সহজে এ সত্যপ্রতিষ্ঠা করা যায় না। কিন্তু বিশ্বরূপাত্মক এ অসীম শক্তিবিলাস স্বতঃই প্রাণকে স্তব্ধ করিয়া দেয়, এক বিরাট্ মহিমা তোমার ক্ষুদ্রত্বকে খুব স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া তোমার আমিত্বটিকে নাস্তিত্বের মত করিয়া দেয়। আর ঐ আমিত্বটি যত প্রাণহীন হইয়া পড়ে, ততই সত্যের ভূমা বিস্তার তোমার চেতনায় আভাসিত হইতে থাকে ও অন্তরের সন্ধান মিলাইয়া দেয়। আমিত্বটি অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া রাখে বলিয়া অন্তরকে সহজে জীব ধরিতে পারে না। আর সেই জন্য সাধনমার্গের যত পন্থা, সব এই আমিটিকে হয় ছাড়িতে, না হয় তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া দিতে বিশেষ করিয়া বলে। তুমি তোমার বোধের বিশ্ব দেখিতেছ। তুমি যে বিশ্ব ভোগ করিতেছ, তাহা তোমার অনুভূতির বিশ্ব। অন্তঃক্ষেত্রে অধিকার পাইবার পূর্ব্বে এ কথা ঠিক্ করিয়া বলিতে না পারিলেও আর অন্তরের সন্ধান পাইয়া এ কথা বলিতে পারিলেও বাহ্য জগৎ বা ঈশ্বরের বিশ্বমূর্ত্তি যে রহিয়াছে—তোমার বিশ্বানুভূতি ফুটাইবার কারণ-স্বরূপ বিশ্বরূপে তিনি সত্যই যে রহিয়াছেন, এ কথা একান্ত সত্য। সুতরাং বাহ্যে সত্যপ্রতিষ্ঠা বস্তুতঃই সত্যে সত্যপ্রতিষ্ঠা এবং একান্ত করণীয়। সত্যপ্রতিষ্ঠা অব্যক্তাসক্তচিত্ত পুরুষের সহজে হয় না।

বিশ্বরূপই বাহ্য সত্যপ্রতিষ্ঠার আশ্রয়। ইহাতেই সত্যবুদ্ধি আরোপ করিবে। সূর্য্যে করিবে অথবা বিগ্রহাদিতে করিবে।

শ্রেষ্ঠ এই তিনটী। তবে সমস্তেই করিতে পার। আর যখন সত্যমন্ত্র মনে পড়িবে, তখন যেন অবহেলার পূজা দিয়া তাঁহাকে দূরে সরাইয়া দিও না। মরণজীবন পণ করিয়া তখন সত্য করিয়া তুলিবে তোমার সত্য-সাধনা। তিনি বলেন না যে, তোমাদের প্রাণ হইতে সমস্ত মুছিয়া ফেলিয়া আমার জন্য নির্জ্জন মন্দির নির্ম্মাণ কর, তবে আমি তোমায় দেখা দিব। তিনি বলেন, সব থাকুক—স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু বিষয়, যাহা আছে, থাকুক, তাহাদের সঙ্গে তাহাদেরই মত একজন করিয়া আমায় তোমার অন্তরে একটু স্থান দাও। তাহারা যেমন তোমার অন্তরে সত্য, ঠিক তেমনই করিয়া আমায় তোমার অন্তরাসনে বসিতে দাও। তাহাদের মত সত্য কর—বেশী নয়। তাহাদের মত করিয়া আমায় সত্য বলিতে পারিলেই তোমার সত্যভূমি লাভ হইবে।

শুন, যখনই "সত্য" মনে উদিত হইবে, তখনই যেখানে থাক, যে অবস্থায় থাক, "তুমি রহিয়াছ—তুমি রহিয়াছ"—এই অনুভূতি জাগাইয়া তুলিবে। "এ ভূমি সত্য, এ জল সত্য, এ অগ্নি সত্য, এ বায়ু সত্য, এ আকাশ সত্য, এ মন সত্য, এ প্রাণ সত্য, আমি সত্য, তুমি সত্য। সত্যই রহিয়াছ, সত্যই রহিয়াছ। হে একান্ত সন্নিহিত! দূর হইতে দূরে, নিকট হইতেও নিকটে, হে সর্ব্ব! হে সর্ব্বাশ্রয়! আমার অন্তরাত্মা! তুমিই এইরূপে রহিয়াছ—তুমিই রহিয়াছ। তুমিই আমার সত্য আশ্রয়। 'জন্মলয়াদির নিয়ন্তা' আকারীয় অনুভূতিকে যেমন সত্যানুভূতি

বলে, "অস্তিত্ব" আকারীয় অনুভূতিকে তেমনই অস্তিত্বানুভূতি বলে। তেমনই তুমি আমার আশ্রয়, আমি তোমার আশ্রিত এই অনুভূতিকে আশ্রয়-আশ্রিতবোধ বলে। কিন্তু যাহা বলিবে সেই আকারের অনুভূতি ফুটিয়া উঠা চাই—এ কথা পরে বলিতেছি।

আবার মনে করিয়া দিই, যখন সত্যপ্রতিষ্ঠা করিবে, তখন মাত্র অনুমান করিবে না যে, তিনি এখানে রহিয়াছেন; সাক্ষাৎ দর্শন করিবে। সত্যপ্রতিষ্ঠ পুরুষ চক্ষু চাহিয়াই মাকে দেখে। আর যে চক্ষু চাহিয়া আত্মাকে দেখিতে না পায়, সে সহস্র চেষ্টা করিয়াও পায় না। অন্বেষণ করিতে হয় তাহাদের, যাহাদের মিথ্যা জ্ঞানে বুক ভরিয়া থাকে—মিথ্যায় যাহারা ঢাকা পড়িয়া থাকে। সমুদ্রে নামিয়া জল অন্বেষণ তাহারাই করে, যাহারা বিকারগ্রস্ত। মা অন্বেষ্য নহে রে—দ্রষ্টব্য।

কিন্তু তবু পারে না—সত্যই পারে না। খণ্ড অস্তিত্বের মোহে মগ্ন প্রাণ তেমন করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিতে পারে না। দুর্ব্বল প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়ে—অবসাদে ভরিয়া যায়—তরঙ্গে তরঙ্গে আবর্ত্তিত হইয়া শুধু হাবুডুবু খায়—আর সন্তরণানভিজ্ঞ জলমগ্ন মানুষের মত শুধু ব্যর্থ উদ্যমে অবসন্ন হইয়া শেষে সাধনায় হতাশ হয়। তাই আগেই সত্যবোধ ফুটান আবশ্যক। সত্যকে জানিয়া শুধু ফেলিয়া রাখিলে হইবে না, অনুশীলন করিতে হইবে। আর সঙ্গে সঙ্গে গুরুমুখে জ্ঞান গ্রহণ করিতে হইবে। আত্মতত্ত্বজ্ঞান পাইবার জন্য গুরুসঙ্গ করিতে হইবে

তবে সত্যপ্রতিষ্ঠা শীঘ্র হইবে। সত্যব্যবহারময় হওয়াই সত্য-প্রতিষ্ঠার সার্থকতা। মাত্র জ্ঞানে তাঁহাকে ফেলিয়া রাখা যায় না, যদি এতটুকু সত্য বোধও হইয়া থাকে। যাহার বিন্দুমাত্র সত্য বোধ হইয়াছে, সত্যের সত্যানুভূতি যাহার বুকে একটুও উদয় হইয়াছে, তাহাকে সাধনা করিতে হয় না—সাধনা পায়। যেমন ঘুম পায়, ক্ষুধা পায়, তৃষ্ণা পায়—তেমনই সাধনা পায়। আর তখনই সত্যবোধ হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া একটা অসাধারণ বীর্য্য ফুটাইয়া তুলে। জলমগ্ন ব্যক্তি ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া তটদেশে পায়ে মাটি ঠেকিলে যেমন একটা নিশ্চিন্ততায় তাহার প্রাণটা পূর্ণ হয়, তেমনই সে এক অবিচল নিশ্চিন্ততায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠে। ইহাই বল। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" এইরূপ লব্ধভূমিক পুরুষ না হইলে শুধু সাধনার প্রণালীতে ঘুরিয়া বেড়ানই সার হয়।

সত্যপ্রতিষ্ঠার সময় প্রথম একটুকরা আকাশের মত চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠে। মনে হয়, সেটা যেন বাহিরে; কিন্তু বস্তুতঃ সেটা অন্তরে ফোটে। সেটা চিত্তাকাশ। অনেকে ভুলিয়া সেটাকে চিদাকাশ মনে করে, কিন্তু তাহা নয়—চিত্তাকাশ। সেটা ফুটিলে আনন্দ আসে—শান্তি আসে আর সেটাকে ক্রমশঃ বাড়াইতে হয় বা বাড়িয়া যায়—সর্ব্বশরীর-ব্যাপী হইয়া যায়—নানা বর্ণের জ্যোতির্ব্বিশিষ্টও হয়। সত্য-প্রতিষ্ঠা যত ঘন হয়, তত সেটা নির্ম্মল, স্বচ্ছ, শুভ্র ও প্রকাশধর্ম্মী হইতে থাকে। এই রকম আকাশের পর আকাশ

ভেদ হইয়া তবে চিদাকাশ প্রকাশ পায়। ঐ চিত্তাকাশ ফোটার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বাহ্য এক হইয়া যায়। ঐ আকাশটা প্রথম বাহিরে বলিয়া মনে হইলেও উহা ভিতরেই হয় এবং ভিতরে বলিয়া উপলব্ধি আসিলেই অন্তর্বাহ্য এক হইয়া একটা অনাবিল আকাশ ভাসমান থাকে। এই আকাশ ফুটিতে আরম্ভ হইলে সেইখানেই সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে পার। কিন্তু সত্যপ্রতিষ্ঠার সময় এখানে করি, এই রকম করিয়া করি, এ রকম ভাব কৃত্রিমতার পরিচায়ক। কৃত্রিমতা যত শীঘ্র পার দূর করিবে। জ্যোতি ফুটুক, আকাশ ফুটুক—এ সব তোমার দ্রষ্টব্য নহে—পথের ধারের দৃশ্য মাত্র। চাই তোমার সত্য, পরম সত্য—তোমার জন্মমরণের প্রাণময় নিয়ন্তাকে। তুমি জ্যোতিঃ বা আকাশে মুগ্ধ হইও না। তবে তাহাতেও সত্য-প্রতিষ্ঠা করিবে। সত্য বলিয়া, আশ্রয় বলিয়া জড়াইয়া ধরিবে—এই আমার তুমি, এই আমার সত্যপ্রাণ আত্মা—আমি সত্যকে দেখিতেছি—সত্যকে জানিতেছি—হে সত্যস্বরূপ, তুমি আমায় সত্য দাও। এই ভাবে বুদ্ধ হইবে। "সত্যং পরং ধীমহি" এই মহামন্ত্র সত্যগুরুর নিকট গ্রহণ করিয়া সাধনায় অগ্রসর হও।

সত্যপ্রতিষ্ঠায় সাধনার আরম্ভ—সত্যপ্রতিষ্ঠায় শেষ। যে মুহূর্তে তিনি রহিয়াছেন, এই বোধ সত্য করিয়া তুলিতে পারিবে সেই মুহূর্তে তাঁহাকে লাভ করিবে। পথ খুব সহজ অথচ বহু দূরব্যাপী। মাত্র একটু সত্যবোধ আভাসিত হইলেই সব

হইয়াছে মনে করিবে না। তুষ্টি সাধনার অন্তরায়। আরও অগ্রসর হও,—আরও অগ্রসর হও। একটু আলোক, একটু আনন্দ—একটু সিদ্ধি লাভ করিয়াই গুরু সাজিয়া বসিবে না। মনে রাখিও তখনও তুমি অন্ধ। তুষ্টিতে বুক ভরিয়া যাইবে—তবু তাহারই ভিতর দৃঢ়পদক্ষেপ করিতে হইবে—সত্যের মন্দির তখনও দূরে। মহাপুরুষ, সিদ্ধপুরুষ, অবতার—এ সব হওয়া আজকাল সহজ। দুটা অশ্রু, একটু অন্তরালোক, একটু স্বারূপ্য বোধ আসিলেই লোকে তোমায় মহাপুরুষ করিয়া তুলিবে হয় ত তুমিও সেই মোহে আপনাকে হারাইয়া ফেলিবে। সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া মিথ্যা-প্রতিষ্ঠায় ডুবিয়া যাইবে। মনে কর, সেই সত্যের যুগ, সেই কৃতযুগ, যখন ঘরে ঘরে সত্য-প্রতিষ্ঠ ঋষি বিরাজ করিতেন। যাঁহাদের মহিমা দেবত্বকে অবধি অতিক্রম করিত। দেবতারা সভয়ে যাঁহাদের নিকট শির নমিত করিতেন। অথচ তাঁহারা সাধারণ গৃহস্থের মত সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে বিমুখ হইতেন না।

আর আজ আত্মমহিমার বিন্দুমাত্র আভাস নাই। আভাস পাওয়া দূরে থাকুক, এখনও গুরুতেই হয় ত সত্যপ্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত হয় নাই, গুরুবোধই ফোটে নাই, অথচ নিজেই গুরু সাজিয়া পথ দেখাইতেছে। অথবা সন্ন্যাসের মোহে আক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মকর্ম্মময় এ জগৎকে মিথ্যার আগার বলিয়া শিক্ষা দিতেছে। অথবা নিজে তাহার আদর্শ হইয়া ধর্ম্মকে জটিল করিয়া তুলিতেছে।

এ সত্য-প্রতিষ্ঠা কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। কৃত্রিম সন্ন্যাসের বিষময় মোহে ধর্ম্ম-সমাজ আজ জর্জ্জরিত। সংসারের কর্ম্ম-ক্লান্তি, আলস্যের প্রতি দুর্ব্বলমনুষ্যের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আনিয়া দেয়—ভগবান্ কর্ত্তা, তাঁহারই ইচ্ছায় সমস্ত সম্পাদিত হইতেছে ইহা সত্য হইলেও, এই জ্ঞানের অনধিকারী যাহারা, তাহারাও ঐ শাব্দিক জ্ঞানের মোহকে আপনার কর্ত্তব্য পালনে অক্ষমতার দাঁড়াইবার একটা যুক্তিময় ভিত্তি করে, আর "বেশ শান্তিতে বসিয়া যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্ট হইয়া—তাঁহারই চিন্তায় ব্যস্ত থাকিব— এ কামিনী-কাঞ্চন-মোহময় সংসার যাত্রার কোন মূল্য নাই"— এই রকমের ধারণায় বুদ্ধির ভগবৎবাতিকটাকে বেশ আরামের একটা কল্পনা-কুঞ্জে গঠিত করে। এ প্রকার বুদ্ধি তামসিক বুদ্ধি। ইহা হেয় ও সাধন-পথের অন্তরায়। আজকালকার ভগবৎসত্তা-বোধশূন্য সংসারযাত্রাও যে হেয় এ কথা খুব সত্য হইলেও তবু তাহাতে কর্ম্ম আছে, পরিশ্রম আছে—অবসাদ আছে—সুতরাং আশ্রয়ের জন্য একটা স্বাভাবিক তৃষ্ণা আছে, স্থূলতঃ একটা শক্তির অনুশীলন আছে। শুধু সেইটাকে জ্ঞানময় করিয়া লইতে হইবে—ভগবদ্‌বোধময় করিয়া লইতে হইবে। আর সত্য-প্রতিষ্ঠা তাহাই করে।

যখন সত্য-সত্তা-বোধ ঘন হইয়া আশ্রয়-আশ্রিত-বোধে দাঁড়ায় ও মানুষ নিজেকে যথার্থই ভগবদাশ্রিত বলিয়া বোধ করে অথবা বোধময় ভগবানেই সে সর্ব্বদা লগ্ন—সত্যই সে তাঁহার অভয় বুকে অবস্থিত—এ ভাবের সত্যবোধ যখন প্রকাশ

পাইতে থাকে, তখন তাহার সদ্‌বৃত্তি সকল ফুটিয়া উঠিতে থাকে। সে তাহার সকল কর্ম্মকে ভগবানের কর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে থাকে আর তাঁহাকে পরম আত্মীয়রূপে দেখিতে আরম্ভ করে। মাতা যেমন পুত্রকে নানারকমে খাওয়াইয়া পরাইয়া সাজাইয়া সুখী হয়, তেমনি ভাবে হৃদয়ের সকল ভাব দিয়া, সকল ভাবকে কর্ম্মে ফুটাইয়া তুলিয়া, সে সত্যের সেবায় পরম-সত্যকে তৃপ্তি দিতে উদ্যোগী হয়। আর সেই রকম করিয়া তাঁহার প্রীতির সেবা করিতে করিতে ক্রমে সে তাঁহাতে বিভোর হইয়া যায়, আত্মহারা হইয়া যায়—দুইয়ের আর পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারে না—তখন তার সমস্ত কর্ম্ম বন্ধ হইয়া আসিতে থাকে। সেই প্রকৃত সন্ন্যাস, প্রকৃত নৈষ্কর্ম্ম্য। কিন্তু সে কথা পরে বলিব।

সর্ব্বান্তর সত্য উপাসনা বা প্রতীকে ব্রহ্ম উপাসনা

অধিদৈবে সত্য, অধ্যাত্মে সত্য, ইহাই তোমার সাধ্য। জ্ঞান-স্বরূপ বা জ্ঞানময়, বোধ-স্বরূপ বা বোধময় পরমাত্মাই যে অন্তর ও বাহ্যমূর্ত্তি লইয়া রহিয়াছেন—ইহাই শ্রুতির সার কথা। তিনি আপনাকে নানা আকারে সৃজিত করিয়া বাহ্য জগৎ হইয়াছেন আর তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া সেই সেইরূপ অভিমানী দেবতা বা জীব হইয়াছেন। আমি সূর্য্য, আমি অগ্নি,

আমি বায়ু, আমি দিক্—এই রকম অভিমান লইয়া তিনি এক এক বিশেষ বিশেষ আয়তন প্রকাশ করিয়াছেন। এইগুলিকে অধিদৈব পুরুষ বলে। আর সেই রকম হইয়া, তাহার বিশেষত্বগুলি ও অন্যান্য বাহ্য সৃষ্টির বিশেষত্বগুলি অনুভব করিবার জন্য জীবে যে বিশিষ্ট চেতনায়তন প্রকাশ পায়, সেইগুলি অধ্যাত্মপুরুষ। যেমন বাহ্যে সূর্য্য অধিদৈব পুরুষ, তোমাতে চক্ষু অধ্যাত্মপুরুষ। বাহিরে দিক্‌সকল অধিদৈব, তোমাতে শ্রোত্র অধ্যাত্ম। বাহিরে বায়ু অধিদৈব, তোমাতে ত্বক্ অধ্যাত্ম। বাহিরে বরুণ অধিদৈব, তোমাতে জিহ্বা অধ্যাত্ম। বাহিরে অগ্নি অধিদৈব—তোমাতে বাক্ অধ্যাত্ম। কি অধিদৈব, কি অধ্যাত্ম, সমস্তই চিন্ময় সত্যের ভিন্ন ভিন্ন আয়তন। আর এ সমস্ত যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই সর্ব্বান্তর আত্মা। তোমার আত্মাই সর্ব্বান্তর আত্মা। তোমাতে যিনি সত্যের সত্য, বাহিরেও তিনিই সত্যের সত্য। সুতরাং কি অন্তরে, কি বাহিরে, যেখানে যখন সত্য-প্রতিষ্ঠা করিবে, তখন তোমার যিনি অন্তর, যাঁহাতে তোমার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত, সেই সর্ব্বান্তর আত্মাকেই যে দেখিতেছ, এই বোধটী ভুলিবে না। প্রত্যক্ষ সত্য তোমার কাছে—তোমার ঐ অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা-ভূমি—যিনি তোমার চক্ষুর চক্ষু, যিনি তোমার প্রাণের প্রাণ, যিনি তোমার শ্রোত্রের শ্রোত্র—যিনি ভিন্ন কোথাও কেহ দ্রষ্টা নাই, শ্রোতা নাই, মন্তা নাই, বোদ্ধা নাই—সেই সাক্ষাৎ আত্মাই সর্ব্বান্তর আত্মা—তিনিই সত্য, তাঁহাকেই অন্তরে অধ্যাত্ম-

রূপে, বাহিরে অধিদৈবরূপে দেখিতেছে, সত্য-প্রতিষ্ঠার সময়ে এইরূপে সাক্ষাৎ আত্মাকে দেখিতেছ বোধ করিবে;—কোন অনির্দ্দিষ্ট কাহাকেও নহে। যদিও তিনিই অন্বেষ্য, তত্রাচ তিনি যেন আর অন্বেষ্য নহেন—প্রত্যক্ষ—এই ভাব অনুধাবন করিবে। এই অন্তর ও বাহিরনামীয় যাহা তুমি অনুভব কর, ইহাও সেই অন্তরতম সত্যেরই উভয় আয়তন। আমার অন্তরকেই বাহিরে দেখিতেছি, আমার অন্তরকেই অন্তরে দেখিতেছি—এই ধারণা ভুলিও না। মানুষের ভগবদ্-ধারণা সাধারণতঃ বাহিরে থাকে অর্থাৎ যেন সর্ব্বতোভাবে আমার অতীত কোন একজন আছেন, এই ভাবে থাকে। সত্য-প্রতিষ্ঠার ঘনত্ব যত বাড়ে, ততই তিনি নিকট হইতে থাকেন এবং শেষে তাঁহাকে এই আত্মাতেই পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাকে নিকটে পাইতে হইলে দেবতা-সকলকে তাঁহারই স্বরূপ ভাবিয়া উপাসনা করিতে হয়। অর্থাৎ পৃথিবী, সলিল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি অধিদৈব পুরুষ-সকল যে তিনিই এবং চক্ষু, শ্রোত্র, বাক্, মন, প্রাণাদি অধ্যাত্ম দেবতা-সকলও যে তিনিই—যিনি বিরাট্ ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্যামী সত্য আত্মা, ইহা জানিতে হয় ও এই ভাবে সত্য-প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। হে অগ্নি! তুমিই সত্য, তুমি প্রত্যক্ষ আত্মা, তুমি সর্ব্বব্যাপী মহান্, তুমি এ বিশ্বের প্রাণ, তুমি ভূত-সকলের একান্ত প্রিয় জীবনস্বরূপ আত্মাই, ভূতসকলও তোমার প্রিয়, একান্ত স্নেহের, আদরের, তুমিই সেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের আধার আত্মার সত্যমূর্ত্তি, এই

ভাবে অগ্নিরূপ প্রতীকে ব্রহ্মবোধ আরোপ করিয়া উপাসনা করিতে হয়। এই প্রকার সকল পদার্থে, সকল দেবতায় তাঁহাকে দেখাই প্রতীকে ব্রহ্ম উপাসনা। শ্রুতিতে সর্ব্বত্র এই প্রকার উপাসনার বিধান ভূয়োভূয়ঃ কথিত হইয়াছে। শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—যাহারা দেবতাদিগকে এইরূপ আত্ম-বোধে উপাসনা না করে, দেবতারা তাহাদিগকে গ্রাস করেন। তাহারাই দেবতাদিগের পশুস্বরূপ। যদি এই আকাশ, বায়ু, অগ্নি আদি বহির্দ্দেবতায় বা চক্ষু কর্ণাদি অধ্যাত্ম দেবতায় মিথ্যা অচেতন ইত্যাকার জ্ঞান থাকে, তবে ত কথাই নাই; আত্মা হইতে অন্য পুরুষ জ্ঞান থাকিলেও সে পুরুষ শ্রেয়চ্যুত হয়, বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ প্রত্যক্ষ আত্মদর্শনই শ্রুতির চরম শিক্ষা। প্রত্যেক শ্রুতিতে এইরূপ আদেশ স্পষ্টরূপে করা হইয়াছে। অথচ আজ জগতে সে ধর্ম্মভাবের কি বিকৃতি পরিলক্ষিত হয়। তোমরা সাধনা করিতে সূচনা করিয়াই প্রথম শিক্ষা পাও,—যাহা কিছু দেখিতেছ, এ সমস্ত মিথ্যা, অচেতন। আত্মা এ সকল হইতে অন্য। ওরে, নেতি নেতিরূপে যে স্থলে স্থলে তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে বলা হইয়াছে—ইহা নহে, ইহা নহে, এভাবে যে কোন কোন প্রসঙ্গে দেখিতে বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—"ন ইতিমাত্রং"—"মাত্র এই নহে"; ইহাও তাঁহার মহিমময় মূর্ত্তিই,—এতৎসংলগ্ন তাঁহার আরও রূপ আছে, আরও মহান্ প্রকাশ আছে। সেই মহান্ পাদ লক্ষ্য করিয়াই আপাত-প্রত্যক্ষ পাদকে "নেতি" বলা হয়,—এ প্রত্যক্ষ পাদকে তুচ্ছ

ও ব্রহ্ম হইতে দূরে বহিষ্কৃত বা অস্বীকার করিবার জন্য নহে।

শোন, নামরূপ দ্বারা যাহা কিছু দেখ, সে সমস্তই চেতনা-স্বরূপ, চিৎশক্তিসম্পন্ন, সত্য আত্মার ভিন্ন ভিন্ন আয়তন, চেতনার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপ্তি বা পাদ। এ সমস্ত পাদের আয়তন সেই সংজ্ঞা বা নামটীর অর্থ—জ্ঞানের যে বিশিষ্ট আয়তন রচনা করে, যে আকারে জ্ঞান ফোটে, তাহাই। আর সে সকল আয়তনেরই প্রতিষ্ঠা সেই আত্মায়, তোমার হৃদয়ে, অন্তরাকাশে, সত্যে, সত্য আত্মায়। "সূর্য্য" বলিতে যে জ্ঞানের আকার বোধে ফোটে, উহাই সূর্য্যের আয়তন, ইহা অবশ্য পরমাত্মার বোধ-ক্ষেত্রের কথা বলিতেছি। আর সেই সূর্য্য দেখিয়া তোমার অন্তরে যে জ্ঞানায়তন ফোটে, তাহাও সূর্য্যেরই আয়তন, এ উভয়ই এক। এখন তোমার সূর্য্য সম্বন্ধে যথার্থ স্বরূপ-জ্ঞান নাই, মাত্র ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধ সাধারণ জ্ঞান আছে, সেইজন্য প্রকৃত সূর্য্যায়তন তোমার অন্তরে ফোটে না; কিন্তু সত্যপ্রতিষ্ঠার সহিত সূর্য্যকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে সত্য আত্মা জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিলে তাঁহার প্রকৃত আয়তন অন্তরে ফুটিবে এবং সেই আয়তন অর্থাৎ প্রকৃত সূর্য্য তোমার অন্তরেই, ইহা উপলব্ধি করিবে। এইরূপ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে, সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে। ইহাই ঋষিদিগের মহিমময় আবিষ্কার, শিক্ষা ও উপদেশ।

যাহা হউক, এই ভাবে প্রতীকে বা পদার্থে পদার্থে প্রাণময়, চিন্ময় দেবতা দর্শন করিতে করিতে ও সে দেবতা যে অন্য কেহ

নহে, আমার জ্ঞানরূপে যাঁহাকে সর্ব্বদা দেখিতেছি, সেই আত্মাই—পরম সত্যই দেবতারূপে বিরাজ করিতেছেন, ইহা জানিতে জানিতে তবে আশ্রয়-বোধ সম্যক্‌ভাবে সম্বুদ্ধ হয় এবং এই সূর্য্য, এই চন্দ্র, এই আকাশ, এই বায়ু, এই অগ্নি, এই জল, এই পৃথিবী—ইহারাই প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ প্রাণ ও ভোগদাতা সজীব সচেতন দেবতা—মাত্র দেবতা নহে সর্ব্বতোভাবে প্রিয় আমার আত্মাই—এই ভাবে পরমাত্মার সজীব সচেতন আত্মীয়তাময় ভাব প্রাণে প্রকটিত হইতে থাকে। ওরে, এই যে বায়ু, এ ত সত্যই অচেতন বায়ুমাত্র নহে, এ যে সত্য সজীব সচেতন বায়ু-দেবতা, আদরে আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের উপাদান হইয়া আমার প্রাণকে প্রবাহিত রাখিতেছেন। এই যে সূর্য্য, এ ত জড় জ্যোতিঃপিণ্ড নহে—এ যে সজীব সচেতন সূর্য্য-দেব, আমায় সত্য সত্য প্রাণ আলোক দিতেছেন; সমস্ত, সমস্ত—যাহা কিছু অচেতন বলিয়া এত দিন বুঝিতাম, এ সবই যে সজীব সচেতন দেবতা, আমার প্রাণ হইতে অন্নাদি সমস্ত প্রকার ভোগ, আমার দেহ, ইন্দ্রিয়াদি ও তাহাদের সর্ব্বপ্রকার তৃপ্তি ইঁহারাই যে পরমাত্মীয়ের মত অহর্নিশ দান করিতেছেন। ওই পর্জ্জন্য, ওই বিদ্যুৎ, এই ধরিত্রী, এই বনস্পতি, সমস্ত—সমস্ত চেতনাময় পরমাত্মীয়। না না, শুধু আত্মীয় নহে—আমার অন্তরের জ্ঞানরূপী পরমাত্মাই এই সব বেশ ধরিয়া, মহিমময় হইয়া বিরাজ করিতেছেন। আত্মা ভিন্ন এত আত্মীয়তা কে দেখাইতে পারে রে—এমন করিয়া প্রাণদান করিতে কে পারে

রে ! এই ভাবে আশ্রয়-আশ্রিতবোধ আত্মীয়বোধে ও আত্ম-বোধে পরিণত হইতে থাকে।

ইহাই সত্যপ্রতিষ্ঠার অমৃতত্ব। বিশ্বভুবন আত্মীয়তাময় হয়—আত্মময় হয়। আর এতকাল না বুঝিয়া, না মানিয়া, কত মূঢ়, কত অকৃতজ্ঞ হইয়া জন্মের পর জন্ম অতিবাহিত করিয়াছি, তাহা স্মরণে আসিয়া, হৃদয়ে সর্ব্বপাপ-বিধৌতকারী অনুতাপ ও পূত কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকে। ওগো গুরু! তুমি আমার জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিয়াছ। আমি আমার প্রকৃত পিতা, প্রকৃত মাতা, প্রকৃত বন্ধু, প্রকৃত আত্মীয়কে দেখিতে পাইতেছি। অহো! আমি দরিদ্র নহি—ভিখারী নহি—পথভ্রান্ত, পীড়িত স্বজনশূন্য পথিক নহি—আমি রাজরাজেশ্বরীর বরপুত্র, আমি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরের সকল স্নেহের অধিকারী—তাঁহার নয়ন-পুতলী। হাঁ, নয়নপুতলী—সত্যই রে, আমি তাঁর নয়নপুতলী। পরম-করুণাময়ের স্নেহের করুণ ঈক্ষণেই আমার জন্ম, সে স্নেহের ঈক্ষণেই আমি পালিত—যথেচ্ছাচারী আনন্দদুলাল। যাহা চাহিতেছি, তাহাই পাইতেছি—সে কল্পঈক্ষণশীল কল্পতরুর কল্প ক্রোড়ে বসিয়া। তোরা দর্শন কর, সত্যদর্শন কর, যদি দুর্ভাগ্যের ধাঁধা ঘুচাইয়া সৌভাগ্যের শিখরে উঠিতে চাহিস্—তবে শুধু দর্শন কর--তাঁহার নয়নে নয়ন স্থাপিত কর, যে তোর অন্তরে ওই নানা বোধের আকারে দৃষ্ট হয়। এ দুর্ভাগ্য তুই আপনি চাহিয়া লইয়াছিস্—এ কথা ভুলিস্ না। যাহা চাহিবি, তাহাই পাইবি—ইহাই তোর সত্য আত্মার নির্ব্বিকার স্নেহের অসীমত্ব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি—এই প্রতীকে আত্মদর্শন বা সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে গেলে প্রথমেই সে প্রতীকের রূপটী যেন অন্তর্হিত হইয়া যায় ও সত্যের একটী আকাশবৎ ভাব ভাসিয়া উঠিতেছে বোধ হয়। সেটী চিত্তাকাশ। তুই সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য করিবি না। তুই যাহাতে সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতেছিস, তাহার নাম রূপকে ধরিয়া রাখিয়া, তাহার মহিমা উপলব্ধি করিতে প্রয়াস পাইবি। যত দৃঢ়তার সহিত সে প্রতীককে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইবি, ততই সে আকাশ নির্ম্মল হইতে নির্ম্মলতর হইতে থাকিবে—তাহার ব্যাপকতা বাড়িতে থাকিবে ও সেই আকাশের প্রান্ত ঘেরিয়া ফুটিয়া উঠিবে—তোর প্রতীকের মহিমা। আর যত মহিমা ফুটিবে, ততই সে আকাশ প্রকৃত অন্তরাকাশরূপে প্রকটিত হইতে থাকিবে। অবশেষে অর্থাৎ প্রকৃত চিদাকাশে প্রবিষ্ট হইলে তখন আর সে প্রতীকের খণ্ড মহিমা থাকিবে না বা থাকিলেও তোর দর্শনের আকাঙ্ক্ষাই হয় ত চলিয়া যাইবে। কিন্তু সে পরের কথা। এ প্রাথমিক অবস্থায় মহিমা ও আত্মীয়তাই তোর লক্ষ্য। কেন না, উহা না দেখিলে তাঁহাতে প্রকৃত প্রাণের আকর্ষণ জাগে না। তোরা মুখে বলিস্, তিনি সব দিতেছেন—সর্ব্বস্বই তাঁহার বা তিনিই—কিন্তু ইহার সত্য অনুভূতি যে কি, তাহা শুধু সত্যসিদ্ধ পুরুষই জানে। প্রকৃতপক্ষে একজন তোর এমনই আশ্রয় আছে—এমনই আত্মীয় রহিয়াছে, ইহার উপলব্ধি মানুষকে এ মনুষ্যক্ষেত্র হইতে অনন্ত মহিমমণ্ডিত ব্রহ্মক্ষেত্রেই টানিয়া লইয়া যায়—উহা বর্ণনা করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

আত্মীয়বোধ

সত্য বলিয়া যাঁহাকে ডাকিতেছি—তিনি যে মাত্র আমার অস্তিত্বের আশ্রয় নন—তিনি প্রিয়—অতিপ্রিয়—একান্ত আত্মীয় এই বোধ সত্যপ্রতিষ্ঠার যেন তৃতীয় মাত্রা। সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া যখন অন্তর্বাহ্য এক হইয়া যায়, তখন সেই অন্বেষ্য সত্যকে আরও একটু সুদৃঢ় করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিলে অন্তরবোধ ফোটে আর এই অন্তরবোধ ফুটিলেই আত্মীয় বোধ আসিয়া যায়—পরম আত্মীয় বলিয়া তাঁহাকে চেনা যায়। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, সখা, গুরু, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতিকে যখন ভালবাসি, অথবা কাহাকেও যখন ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা করি, সেই সময়ে হৃদ্‌গ্রন্থির ক্রিয়া স্পষ্ট দেখা যায়। হৃদ্‌গ্রন্থির ক্রিয়াই অনুভূতি-ক্রিয়া। আমরা মনে করি যে, আমরা সেই মানুষ-গুলিকে ঐ রকম করিয়া দেখিতেছি, ভালবাসিতেছি; উহারাই বস্তুতঃ আমাদিগের প্রিয়—প্রাণতুল্য। কিন্তু তাহা নহে। এগুলিও আমার অন্তরের পিতা, মাতা, ভ্রাতা বা তদাকারীয় অনুভূতি। আমার পিতৃ-অনুভূতি বা পিতৃবোধ আরোপ করিয়া আমি পিতাকে পিতা বলি—মাতৃবোধ আরোপ করিয়া মাকে মা বলি—এই রকম সব। মা বলিতে যে স্নেহময় মাতৃত্বের অনুভব হয়, উহাই মাতৃবোধ। পিতা বলিতে, ভ্রাতা বলিতে যে বিশেষ বিশেষ প্রকার জ্ঞান ও অনুভূতি ফোটে,

সেইগুলি পিতৃবোধ, ভ্রাতৃবোধ ইত্যাদি। সেই বোধগুলিই আমাদের প্রিয় বা দ্বেষ্য। আর সেই বোধগুলি যেমন ঘন, যেমন উজ্জ্বল হয়, তদনুসারেই আমরা আমাদের পিতামাতাকে ভালবাসা দেই। উহাদের যে আমি ভালবাসি, তাহা উহাদের মুখ চাহিয়া নয়—আমার অন্তররূপীসত্য আত্মার, ওই জ্ঞানমূর্ত্তির মুখ চাহিয়াই আমি উহাদের ভালবাসি। অর্থাৎ আমার জ্ঞান যে সত্যমূর্ত্তি গ্রহণ করেন, সেই মূর্ত্তিতেই মুগ্ধ হই, তাঁহাকেই দেখি, তাঁহাকেই বুকে জড়াইয়া ধরি, আর সেই বুদ্ধিটা বাহিরের মনুষ্যে আরোপ করা থাকে বলিয়া অর্থাৎ বাহিরের তাহাদের উপর সেই বুদ্ধির সত্যপ্রতিষ্ঠা থাকে বলিয়া, সেইখানে ঐ আত্মরতি প্রকাশ করি। আমার স্ত্রীপুত্র কন্যা ইত্যাদি আত্মীয় আমার অন্তরেই ; যেমন সূচিবেধের ব্যথা সূচিতে নহে—অন্তরে। অন্তরের আভাস পাইলে এইগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। আমি যখন আমার পুত্রকে আদর করি, তখন বস্তুতঃ আমি আমার অন্তরের পুত্রকেই বা আমার আত্মার পুত্রমূর্ত্তিকেই আদর করি। এই রকম সব। আমার অন্তরই আমার পুত্র, পিতা, মাতা, কন্যা, সখা। সেই আমার আত্মাই আমার সর্ব্বস্ব। তাই অন্তররূপী বলিয়া তাঁহাকে চিনিলে আমরা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলি,—"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥" ঋষি তাই বলিয়াছেন,—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি······ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো

ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি……ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।” তুমি ভিখারীর মুখ চাহিয়া ভিখারীকে ভিক্ষা দাও না, আত্মা তোমার ঐ রকম করিলে তৃপ্ত হ'ন—সেই জন্য তুমি ভিখারীকে ভিক্ষা দাও। তুমি পুত্রের মুখ চাহিয়া পুত্রকে স্নেহ দাও না, আত্মা তোমার ঐরূপে তৃপ্ত হয় বলিয়া তুমি পুত্রকে স্নেহ কর।

সত্য-প্রতিষ্ঠার সাধনা বাহিরে ও অন্তরে করিতে করিতে যত অন্তঃক্ষেত্রের বা বিষ্ণুগ্রন্থির নিকটস্থ হইতে থাকিবে, ততই দেখিবে, তুমি তোমার অন্তরের বিভিন্ন মূর্ত্তিকে লইয়াই জন্মের পর জন্ম, মরণের পর মরণ অতিক্রম করিতেছ। তুমি সত্য আত্মাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও কখনও জান না, জানিতে পার না। তোমার তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই—কেহ নাই, কেহ নাই। ওগো আমার সর্ব্বস্ব, সত্যই যে তুমি আমার সর্ব্বস্ব, এই অন্তরে আসিয়া তবে সে কথা দেখিতে পাইতেছি। সত্য সত্যই তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ নাই, কিছু নাই; তুমিই সত্য, তুমিই সত্য। আমার মিথ্যার ধাঁধাঁ ঘুচিয়া গিয়াছে; আমি তোমায় পাইয়াছি—আর আমার সমস্ত ব্যবহার মিথ্যা হইতে সত্য হইয়া উঠিতেছে। মৃত্যুশীলতা হইতে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছি। আমার সকল মিথ্যা সত্য হইয়া গিয়াছে। এইরূপ আত্মীয়ত্ববোধ ফুটিবেই ফুটিবে।

ওরে, ভাল করিয়া মনে রাখ—যেমন অগ্নি স্পর্শ করিলাম,

উত্তাপ পাইলাম না—ইহা হয় না। ঠিক তেমনই আত্মবোধের আভাস পাইলাম, আত্মীয়তা বোধ হইল না—ইহা হয় না। অনেকে যাঁহারা মৌখিক জ্ঞানবাদী—জ্ঞান না হইয়াও যাঁহারা জ্ঞানী—তাঁহারা বলেন--তিনি মাত্র প্রকাশস্বরূপ, তাঁহাতে এ সব কিছু নাই—শুধু প্রকাশ—প্রকাশ—স্বপ্রকাশ। হায়! অজ্ঞ তাঁহারা, প্রকাশ শব্দটার অর্থই তাঁহাদের ধারণায় নাই--প্রকাশ অর্থে তাঁহারা চাক্ষুষ প্রকাশবৎ একটা প্রকাশ মনে করেন। যেমন সূর্য্যাদি সমস্ত বস্তুকে ও নিজেকে প্রকাশ করে, আত্মার প্রকাশত্বও সেই রকম! ওরে, ও শুধু রূপপ্রকাশ। ওরূপ প্রকাশ-মাত্র যদি আত্মার ধর্ম্ম হইত, তবে তাহার জন্য আমি তোদের মাথা খুঁড়িতে বলিতাম না। আত্মপ্রকাশই সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ সর্ব্ববিধ প্রকাশ। দশ ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার আদি চতুর্দ্দশ করণ ও তদ্দ্বারা যে অনন্ত জগৎ অন্তর বাহ্যে প্রকাশ হয়—সেইগুলি, অনুভূতি গ্রন্থিতে যত কিছু সুখ দুঃখ শান্তি আদি প্রকাশ হয়—সেইগুলি, আর নির্ব্বিশেষ স্বসম্বেদন, এ সব তাঁহারই প্রকাশ। আর এ বোধ-প্রকাশ অর্থে—নিজে তাহা হওয়া, আপনি আপনাকে তদাকারে জানা আর সর্ব্ববিধ প্রকাশ-কার্য্যই প্রকাশ শক্তি প্রকাশ্যের আকার গ্রহণ করিলে তবে হয়। চিৎপ্রকাশ একান্ত ভাবে তাহাই; কেন না, সেখানে প্রকাশধর্ম্মী চিৎ ভিন্ন অন্য কিছু নাই। যেমন দর্পণের প্রতিবিম্ব প্রকাশে দর্পণের দর্পণত্বটা অর্থাৎ প্রকাশ-শক্তিটা বিম্বের আকার গ্রহণ করে—তেমনই বোধ-

স্বরূপ আত্মার বোধশক্তি সমস্ত আকার গ্রহণ করে। দর্পণের প্রকাশ-শক্তি বিশ্বের আকার লয়, এ কথাটা তাঁহারা তলাইয়া দেখেন না। বোধের প্রকাশ মানেই যে বোধ করা, এ কথা যাহারা না বোঝে, তাহাদের আত্মা সম্বন্ধে কথা কহাই বিড়ম্বনা। আর নির্ব্বিশেষ স্বসম্বেদন প্রকাশও আত্মবোধময় —বোধশূন্য নহে।

এই যেমন প্রকাশ ধর্ম্ম, তেমনই বোঝ, এই আত্মীযতা। আত্মদর্শন অর্থে আত্মবোধ বা আত্মত্ব বোধ। আত্মার ক্রিয়াত্মক প্রকাশ আত্মীয়তাময়, ভাবময়, এইরূপ বোধ লাভ হইলে তবে তাহার পর আত্মবোধ ফোটে। বাহির হইতে আত্মবোধে উপনীত হইতে হইলে আত্মীয়তা-বোধের উপলব্ধি না করিয়া যাওয়া যায় না। এই আত্মত্ববোধ কি, সেইটা বুঝিয়া দেখ। আমার আত্মা বা আমি তাহাই বা সেই আমি, এই ভাবে যাহাকে বলা যায়, সেই আমার আত্মা। আমিটার সমস্ত যা দিয়া গড়া, সেই আমার আত্মা। এখন দেখ, সাধারণতঃ আমার মমত্ববুদ্ধি যাহাতে আরোপ করি, তাহাকেই আমার আত্মীয় বলি। আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার কন্যা বলিয়া আমি সেইগুলি নিজের সত্তার যেন অংশ, এইরূপ বোধে তাহাদের সঙ্গে মমত্বটা জড়াইয়া দিই। তাহাদের বাদ দিলে আমার নিজের সত্তা যেন শূন্য বা আংশিক শূন্য হইয়া যায়; এই রকম বোধ করি, আর সেই জন্য তাহা-দিগের নাম আত্মীয়। আত্মবৎ ব্যবহার, আপনার সুখ-দুঃখের অংশীদার, আপনার জীবন-গতির কেন্দ্র, এইরূপ দেখাই আত্মীয়-

তার লক্ষণ। তুমি একটী অপরিচিত কন্যাকে বিবাহ করিলে; যাহাকে কখনও দেখ নাই—যাহার সঙ্গে অদ্যাবধি তোমার কোন সম্বন্ধ ছিল না। বিবাহের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত অবধি সে ছিল তোমার পর, আর বিবাহের পরক্ষণে সেই তোমার জগতে শ্রেষ্ঠ আত্মীয়। তুমি তোমার সর্ব্বস্ব তাহার হাতে সমর্পণ করিলে—যে সর্ব্বস্বের একটা কণা হয়ত তুমি প্রাণান্ত হইয়াও কাহাকে দাও নাই। কেন এমন হইল? তুমি আত্মীয়বুদ্ধি তাহাতে আরোপ করিয়াছ বলিয়া। তুমি ঠিক করিয়া লইয়াছ, এ-ই আমার একান্ত আপনার, আর সর্ব্বস্ব দিতে অমনি লালায়িত হইয়া উঠিয়াছ। তারপর সেই আরোপের সাহায্যে কৃত আত্মীয়—সেই স্ত্রী তোমার অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছে—তাহার বিপদে তুমি নিজের জীবন অবহেলায় ত্যাগ করিতে পার। আচ্ছা, বল ত, আত্মীয়বুদ্ধি আরোপ করিয়া পরকে আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিলে যদি এতটাই হইতে পারে, তবে সত্য সত্য আত্মা যিনি, অর্থাৎ যাঁহার মতন বলিয়া ভাবিয়া লইলে পর এত আপনার হয়—তাও আবার অনাত্মবোধসম্পন্ন জীব সত্যই আত্মার মত ঠিক কিছু ভাবিয়া লইতেই পারেনা, তবু সেই ধরণের কতকটা ভাব ভাবিলেই যদি পরও এতটা হয় তবে সেই সত্যের আত্মাকে কত প্রিয়, কত মমত্ব-ভরা বলিয়া বোধ হইবে? তাহাতে কতটা আত্মীয়বোধ ফুটিবে? সত্যের আত্মবোধ ফুটিবার পূর্ব্বে কত গভীর আত্মীয়তার মর্ম্ম-পরশ তাহাকে ভাবিতে গেলেই হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হইবে—কত আবেগ আকুল

আলিঙ্গনে হৃদয় তাঁহার স্মৃতিটিকে পর্য্যন্ত জড়াইয়া ধরিবে? কত একাত্মবোধ অর্থাৎ তিনি আমি এক, এই ভাবের বোধ হৃদয়কে তন্ময় করিয়া রাখিবে—তদাকার করিয়া দিতে থাকিবে?

এই আত্মীয়তা-বোধই প্রিয়ত্বের বোধ। ইহা আত্মবোধের কতকটা আভাস বহন করে—আর এই আত্মীয়বোধই আরও ঘন হইয়া একাত্ম-বোধে তুলিয়া লইয়া জীবকে আত্মবোধসম্পন্ন করে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই স্তরের মুক্তির অথবা সাময়িক অবস্থিতির নাম সারূপ্য-মুক্তি। এখানে প্রবেশ করিলেই জীব শিব হইয়া পড়ে। রাধা থাকিয়া থাকিয়া শ্যাম হইয়া পড়িত এই বোধে। সাধকদিগের এই একাত্মবোধ বা সাধ্যস্বরূপে নিজেকে দেখা—থাকিয়া থাকিয়া প্রকাশ পায়।

আবার বলি। আত্মত্ববোধ আত্মীয়তার সীমা। "তিনি আমার" এটি আত্মীয়তাসূচক সত্য; কিন্তু যতক্ষণ তাঁহাতে দ্বৈতবোধ থাকে, তিনি থাকেন আর আমি থাকি—ততক্ষণ তাঁহাকে সম্যকভাবে আমার বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহাকে ভাবিতে গেলে যখন আমি তাহাই হইয়া যাই, দ্বৈতবোধ আর থাকে না, তখনই পরম মিলনের সার্থকতা অনুভব করি। তিনি এতই আমার আপনার যে, কোনখানে তাঁহাতে আমাতে ভেদ নাই—এই রকম বোধই ভালবাসার চরম বোধ—আত্মীয়তার চরম ঘনীভূতি। অর্থাৎ বিলোমক্রমে আত্মত্ববোধ স্বাত্মীয়তারই বা আত্মরতিরই নির্ব্বিশেষ ভূমাক্ষেত্র। তাঁহার এ বিশ্বপ্রকাশ শুধু জড় প্রকাশের মত নয়—শুধু চিত্তের প্রকাশের মত

নহে—তাহার সঙ্গে আত্মীয়তাময় বোধ সংজড়িত থাকে—তাহারই বিন্যাসে এ জগতের প্রত্যেক পদার্থটী গ্রথিত। এমন একজন নাই—এমন একটা কিছু নাই, যেখানে আত্মার এ আত্মীয়বোধ খেলা করে না। আর ইহারই নাম—বিষ্ণুমায়া বা হৃদয়গ্রন্থি। মায়া অর্থে "অলীক" "মিথ্যাবৎ" এমন কিছু নহে, মায়া এই আত্মীয়বোধ—মমত্ববোধ। তাঁহার জ্ঞানচক্ষু শুধু আলোকের মত কিরণ বর্ষণ করিয়া জগৎ রচনা করে না, ভালবাসা ও প্রীতির অনন্ত সোহাগ তাঁহার জগৎ-প্রকাশের প্রত্যেক অণুতে অণুতে ক্রীড়া করে। "ইদং সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্য সত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু।" এই শ্রুতি মধুময় সম্বন্ধে বিশ্বকে বিশ্বস্রষ্টার সহিত সম্বদ্ধ করিয়া আমাদের দেখাইয়াছে; আমরা তাঁহার অন্তর—তিনি আমাদের অন্তর; আমরা তাঁহার প্রাণস্বরূপ—তিনি আমাদের প্রাণ-স্বরূপ। এ সাক্ষাৎ প্রাণময়ের প্রাণময় লীলা। তাই তাঁহার সত্তায় সত্যবোধ জাগিলে—আস্তিক্যবোধে সত্যপ্রতিষ্ঠা ঘনতর হইলে, তাঁহাকে আমরা আত্মীয়তার বন্ধনে না বাঁধিয়া থাকিতে পারি না। পিতা, মাতা, সখা, গুরু, স্বামী, ইত্যাকার নানাভাবে তাঁহাকে আমরা সত্যের বাঁধনে বাঁধিতে চাই। জগতে যে সব আত্মীয়তা আরোপ করিয়া আমরা তৃপ্তি অনুভব করি, আরোপ-সংস্কারে জন্মের পর জন্ম ধরিয়া আমাদের আত্মার এই আত্মীয়তাটা ফুটাইয়া তুলি—পরকে আপন ভাবিয়া ভাবিয়া বার বার বুকে জড়াই,—ছিঁড়িয়া যায় ছুটিয়া যায়—

মরণের বিস্মৃতি আসিয়া সব মুছিয়া দেয়—আবার নূতন হইয়া আসি—নূতন করিয়া আত্মীয়বোধের সূত্র দিয়া জগৎকে বন্ধন করি—আবার ছিঁড়িয়া যায়, ভাঙ্গিয়া যায়, আবার আসি, আবার বাঁধি—এই রকমে আত্মীয়বোধ অনুশীলন করি। ক্রিমি কীট হইতে সুরু করিয়া—স্তরের পর স্তর ভেদ করিয়া, ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর ক্ষেত্রে উঠি—শুধু এই আত্মীয়বোধ সম্প্রসারিত করিতে। মানুষ হইয়া সমস্ত বিশ্বকে আত্মীয়বোধে ঢাকিয়া ফেলিতে প্রাণ যেন উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে—সব আপনার, সব আপনার—এই জ্ঞান মনুষ্যক্ষেত্রে জীবন্ত হইয়া উঠে; পরোপকারাদি বৃত্তি এই বোধেরই বহির্বিকাশ। যখন আত্মা এই রকমে আপনার বিশ্বব্যাপী প্রসারণ অনুভব করিতে থাকে, অন্য দিক্ দিয়া পরমাত্মা গুরুরূপে হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া দেখাইয়া দেন—আমি বিশ্বকে ভালবাসিতে যাইয়া আপনাকেই, আপনার আত্মাকেই ভালবাসিতেছি—পরকে কোলে লইতে যাইয়া আমি আপনার এ আত্মাকেই বুকে জড়াইয়া ধরিতেছি। আত্মীয়তা-বুভুক্ষু আত্মা বিশ্বের পাছু পাছু আত্মীয়তার আদান প্রদান করিতে গিয়া তাহার অতি সামন্য সার্থকতাই ভোগ করে—ব্যর্থ হয়, নিরাশ হয়, ভগ্নমনোরথ হয়, হাহাকার করিয়া উঠে। কিন্তু গুরুজ্ঞান যখন দেখাইয়া দেন, ঐ মহাজ্ঞান দেখ—তোমার অন্তরে চাহিয়া তোমার বিষ্ণুগ্রন্থিতে, তোমার অনুভূতিকেন্দ্রে লক্ষ্য স্থির করিয়া দেখ; বৎস! তুমি তোমারই আত্মার সেবা ব্যতীত আর কাহারও সেবা কখনও কর নাই—তোমার আত্মাকে ব্যতীত আর

কাহাকেও কখনও ভালবাস নাই, আর কাহারও তৃপ্তিবিধানে তুমি কখনও যত্নবান্ হও নাই ; তুমি তোমার প্রাণেরই তৃপ্তির জন্য প্রাণেতেই ছুটিতেছ ; তোমার প্রাণ তোমার প্রাণেতেই আত্মীয়তা ভোগ করিয়াছে ; তুমি আত্মাতেই আত্মাকে বার বার জড়াইয়া জড়াইয়া চাপিয়া ধরিয়া আসিতেছ !—তখন সব ছুটাছুটির শেষ হইয়া যায়, সব হাহাকার লুপ্ত হইয়া যায় ; তোমার জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা এক অপরিমেয় সার্থকতায় পরিণত হইয়া যায়। তোমার অর্থহীন জীবন দেখ অর্থময়—তোমার মিথ্যা জীবন দেখ সত্য, তোমার মৃত্যুলাঞ্ছিত জীবনধারণা হইয়া যায় অমৃতসিঞ্চিত—অমৃত। তখন তুমি আত্মাতেই এ বিশ্ব দেখ, বিশ্বেতেই এ আত্মা দেখ—তখন তুমি আত্মার দৃষ্টির বাহিরে নিমেষের জন্য যাও না, আত্মাও তোমার দৃষ্টির বাহিরে নিমেষের জন্য যান না।

এই বিষ্ণুগ্রন্থির বা অন্তরাকাশের বিকাশই আত্মীয়-বোধের আকারে প্রথম অনুভূত হয়। সত্য-প্রতিষ্ঠা ঘন হইলে যে চিদাকাশ বুকের ভিতর ফুটিয়া উঠে, পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেই আকাশ খুব স্বচ্ছ হইয়া যায়—তাহার একটা জড় পদার্থবৎ ভাব কমিয়া যায়, আর একটা প্রাণময় ভাব প্রকাশ পাইতে থাকে। অবশ্য তখনও আকাশবৎ দৃশ্যত্ব থাকে ; কিন্তু তবু যেন প্রাণময় অনুভূতিময়, এই রকম মনে হয়। আরও ঘন হইলে, এই হৃদগ্রন্থিতে আর একটু অধিকার বাড়িলে তখন ক্রমশঃ আভাস পাওয়া যায়—শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদি বা সুখ-দুঃখাদি সব

ইহারই বিশেষ বিশেষ আয়তন—সব ইঁহারই এক একটা ভিন্ন ভিন্ন রূপ। আর মনে হয়, যেন আমি ইচ্ছা করিলে বা চেষ্টা করিলে আপনাতেই ঐ সমস্ত শব্দ-স্পর্শ-গন্ধাদি বা সুখ-দুঃখাদি ফুটাইয়া তুলিতে পারি বা পাইতে পারি। স্বপ্নের সময় মানুষ যেমন আপনাতেই রূপ-রস-গন্ধাদি বা সুখ-দুঃখাদি পায়, ঠিক তেমনি—অবশ্য স্বপ্নকালে অভিভূত হইয়া যেন কোন ঘটনার অধীনে সেইগুলি পায়—সেই রকম অন্তরে আপনাতেই সব পায়, কিন্তু অভিভূত হইয়া নহে—কোন ঘটনাপারম্পর্য্যে নহে—নিজের চেষ্টার সাহায্যে বা ইচ্ছায় ঐগুলি যেন সে পাইতে পারে, এই রকম মনে হয়। আর তাহা মিথ্যা নয়—কেন না, হৃদ্‌গ্রন্থির প্রকাশ আরও ঘন হইলে বস্তুতঃই ঐ সকল সত্যই পাওয়া যায়—আর উহাই তত্ত্বদর্শন।

চিত্ত মাত্র লইয়া যাহারা সাধনা করে—অর্থাৎ এ সত্য-প্রতিষ্ঠার দিক্ দিয়া না যাইয়া, যাহারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে যত্নশীল হয়, তাহারা পিতৃযানে পরিভ্রমণ করিতেছে বলিতে হয়। আর এই অনুভূতির পথকে দেবযান বলে। "সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ"—দেবযান সত্যের দ্বারাই প্রসপিত হইয়া রহিয়াছে। পিতৃযান দিয়া যাইলেও, চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইলে তবে এইখানে প্রবেশ করিতে পারা যায়—আর সংযম হইলে বা ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এক সঙ্গে অবস্থান করিলে তবে তত্ত্ব-দর্শন হয়। কিন্তু সত্য-প্রতিষ্ঠা ধরিয়া যাঁহারা অগ্রসর হন, তাঁহাদের সংযমের জন্য মনকে লইয়া অত ধরাধরি বাঁধাবাঁধি

করিতে হয় না—যেন স্বতঃ সুখাস্বাদ পাইয়া অন্তরে স্থিতিলাভ করিতে থাকে।

সত্য-প্রতিষ্ঠার এই আত্মীয়-বোধ প্রকাশ পাইতে থাকিলে বাহ্য ব্যবহারও তখন সত্য সত্য আপনা হইতে তন্মুখী হইতে থাকে। সত্যস্বরূপ পরমাত্মা যে আমারই অন্তরে অথবা আমি যে সত্যস্বরূপ পরমাত্মার অন্তরে, এই উভয় প্রকারে তাঁহার অস্তিত্বানুভূতি ফুটিয়া উঠিতে থাকে—অন্তর্বাহ্য-বোধ একটা ভূমাবোধে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে, আর প্রাণ-ধর্ম্মময় নিবিড় সুখানুভূতিতে হৃদয় পূর্ণ হয়—অন্তর জ্যোতির্ম্ময় হয়—আর যেন তাঁহাকে পাইয়াছি পাইয়াছি, এই রকম বোধ হইতে থাকে। গীতায় যে "অন্তঃসুখোঽন্তরারাম-স্তথান্তর্জ্যোতিরেবচ" বলা হইয়াছে, কতকটা তাঁহারই সাক্ষাৎ-কার হইতে থাকে। প্রিয়—একান্ত প্রিয়—প্রিয়তম—ইহাই তথাকার উচ্ছ্বাস। আর সেই জন্য বাহ্য ব্যবহারগুলি তাঁহার মুখ না চাহিয়া করিয়া উঠিতে পারা যায় না। খাইতে গেলে যেন তাঁহাকে—সেই অন্তরের মাঝে অন্তরকে না খাওয়াইয়া খাওয়া যায় না, স্নানাদি বা কোন কিছু শরীরপ্রসাধন করিতে যাইলে যেন তাঁহাকে সেইখানে না করাইয়া নিজের কোন তৃপ্তি আসে না—আর নিজের সকল তৃপ্তি যেন তাঁহারই তৃপ্তির প্রতিচ্ছায়ামাত্র, এই রকম বোধ হইতে থাকে। "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥" এই গীতা-শ্লোকের মর্ম্ম স্বতঃ ফুটিয়া উঠিতে

থাকে। আপনা হইতেই সেই ভাবের ব্যবহার প্রকাশ পাইতে থাকে। ব্যবহারমাত্রই যে সেই অন্তরস্বরূপ চিন্ময়কে লইয়া ও তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহাকেই করা হয়, ইহাই লক্ষ্য হয়। আবার এই সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্যপালনের মত করা হয় না, স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া সত্যবোধ-প্রতিষ্ঠা মানুষ করিতে থাকে। হায়! যাহারা শাব্দিক আত্মজ্ঞানের মোহে আত্মার প্রাণময়তা বুঝিতে পারে না—অন্তরাত্মার সেবায় যে কি সার্থকতা আছে, কি অমৃত লুকান আছে, তাহার আভাসও পায় না—তাহারা মুখে বলে—ঐ সব কর্ম্মের কোন মূল্য নাই, শুধু চিত্তশুদ্ধির জন্য বিহিত কর্ম্মসকল অনুষ্ঠেয়; আত্মা কিছু গ্রহণ করেন না। ওরে, গ্রহীতা যদি কেহ থাকে—দ্রষ্টা যদি কেহ থাকে, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা যদি কেহ থাকে কোথাও, তবে, সে তিনিই—এই সত্যবোধে সম্প্রাপ্ত সত্যই! এ কথা তাহারা বোঝে না। "এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা" শ্রুতি এ কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু যাক্—

এই আত্মীয়বোধে তাঁহাতে বিহার করা, ইহা কিন্তু তখনই হয়, যখন সত্যপ্রতিষ্ঠার সাহায্যে অন্তরের সন্ধান পাওয়া যায় বা অন্তরাকাশ ফুটিয়া উঠে। অন্তরে ও বাহিরে সত্যপ্রতিষ্ঠার সাহায্যে আশ্রয়-বোধ উদ্বুদ্ধ হইতে থাকিলে তখন অন্তর ও বাহ্য যে বস্তুতঃ এক অন্তরেরই উভয় প্রকার উপলব্ধি, ইহা হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে, এবং সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে গেলেই অন্তর বাহ্য এক হইয়া গিয়া এক সুনির্ম্মল আকাশ স্বীয় হৃদয়ে জীব

দেখিতে পায়; সে আকাশ অনুভূতি বা জ্ঞানক্রিয়াময়, সুখ দুঃখাদির কেন্দ্র। প্রথম প্রথম সম্যকরূপে উহা বোধ না হইলেও তদ্রূপ আভাস স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, উহাই যে সর্ব্বস্ব, উহা ভিন্ন, উহা হইতে অতিরিক্ত কিছু নাই, এইরূপ অনুভব হয়। সুতরাং সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে করিতে এইরূপ অন্তর্বাহ্য এক হইয়া যায় কি না, লক্ষ্য করিবে। যদি না হয় তবে বুঝিবে, সত্যপ্রতিষ্ঠায় দৃঢ়তা, সত্যতা এখনও হয় নাই। আর যদি হয়, তবে যত পার, সেই অন্তরাকাশেই অবস্থান করিতে থাকিবে। তোমার সকল ব্যবহার সেইখানে চক্ষু রাখিয়া সম্পন্ন করিবে। সাধনার জন্য নূতন করিয়া পূজা ধ্যান এ সব কর বা না কর, নূতন কোন বিশিষ্ট আয়োজন করিতে যদি নাও সক্ষম হও, তবু যে সব কার্য্যে শরীর ও সংসারযাত্রার মুখ চাহিয়া নিযুক্ত থাকিতে হয়, সেই সমস্ত কার্য্য করিবার সময় ওই অন্তরক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখিয়া করিবে। অবশ্য এরূপ অন্তর লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম তোমার চেষ্টা করিয়া বড় একটা করিতে হইবে না, স্বতঃ উহা হইতে থাকিবে; তবে সময়ে সময়ে সেরূপ নাও হইতে পারে, সেই জন্য লক্ষ্য করিবার কথা বলিলাম।

আর এইরূপ অন্তরে বিচরণশীলতা যত ঘন হইতে থাকিবে, ততই সকল তত্ত্বের সারতত্ত্ব, সর্ব্বদুঃখের পরিত্রাতা, সর্ব্বসুখের আস্পদ, সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইবে। পরমাত্মদর্শন পরমাত্মা হইয়াই করা যায়, সে কথা পরে বলিতেছি।

আত্মবোধ

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম

যাঁহাকে জ্ঞাত হইলে আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না, কিছু তাপ থাকে না, অভাব থাকে না, যাঁহাকে জানিলে জীব সর্ব্বজ্ঞ হয়, আপ্তকাম হয়, সত্যকাম হয়, ঈশ্বর হয়, যাঁহাকে জানিতে সে তাহাই হইয়া যায়, যাঁহাকে জানা অর্থেই তাঁহাকে পাওয়া, আর যাঁহাকে পাওয়া অর্থে আপনাকে পাওয়া, যাঁহাকে জানিতে স্তম্ব হইতে দেবতা পর্য্যন্ত জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে লালায়িত, সাধনতৎপর, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তৎসেবা-পরায়ণ, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহাতে রমণশীল, সেই সর্ব্বময় ও সর্ব্বাতীত, ত্রিকাল-সত্য ও ত্রিকালাতীত-সত্য সেই প্রাণময় ও প্রাণাতীত প্রাণকে নমস্কার করিয়া, তাঁহারই জ্ঞানে সেই জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞানময়, আনন্দস্বরূপ ও আনন্দভুক্ পরমাত্মার স্বরূপবোধের কথা একটু বলিতেছি ; তিনি আমাদিগকে চক্ষু দান করুন তাঁহাকে দেখিতে, প্রাণ দান করুন— তাঁহাকে প্রাণ দান করিতে, জ্ঞানদান করুন তাঁহাকে জানিতে। এস, সত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া নতশিরে, নতসর্ব্বাঙ্গে, প্রণতহৃদয়ে তাঁহাকে আত্মা বলিয়া বরণ করিয়া প্রণব-শঙ্খধ্বনি করিয়া ঘরে তুলি।

শ্রুতি বলেন, আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নাই, কেহ নাই; তিনিই সমস্ত। যাহা কিছু হইয়াছিল, যাহা কিছু হইয়া রহিয়াছে, যাহা কিছু হইবে, সমস্তই সেই আত্মা। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের যাহা কিছু, সব তিনিই। শব্দের দ্বারা যাহা কিছু বুঝান যায়, সে সব তিনি—যিনি বাক্যের ও মনের অতীত। এবং এই ত্রিকালাতীত যিনি, তিনিও এই আত্মাই। এই আত্মাই ব্রহ্ম—এই আত্মাই পরোক্ষানুভূত ও প্রত্যক্ষীভূত আমার আত্মা।

ভাল, আগে একটী কথা বলি। তোমরা এমন কোন কিছু জান কি, যাহাতে সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি আছে, অথচ ইন্দ্রিয় নাই—যাহাতে বিশেষভাবে কোনও শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদি নাই, অথচ যাহা সকল গুণেরই ভোক্তা—যাহাতে শব্দ-স্পর্শাদি লিপ্ত নহে, অথচ এ সমস্ত যাহাকে আশ্রয় করিয়াই সম্বুদ্ধ হয়। তোমাদিগের মধ্যে এরূপ কোন কিছু আছে বলিয়া ধারণা করিতে পার? যদি একটু ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখ, তবে নিশ্চয়ই বলিবে, আছে। জ্ঞানই পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসম্পন্ন। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শ, আস্বাদন, এ সমস্ত যে জ্ঞানই করেন বা জ্ঞানেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং জ্ঞানই যে এ সকলের ভোক্তা, জ্ঞানই যে এ সকলের আশ্রয়, ইহা স্বচ্ছন্দে বলিতে পার। সব স্থলে যিনি না যাইয়াও গমন করেন, যিনি অন্তরস্থিত হইয়াও দূরস্থ হয়েন, যিনি চক্ষু নাই—দর্শন করেন, শ্রবণ নাই—অথচ শ্রবণ করেন, চরণ নাই—গমন করেন, জিহ্বা নাই, আস্বাদন করেন, কর নাই—গ্রহণ করেন—এই সকল লক্ষণ

যদি কোথাও ঠিক প্রয়োগ করিতে পার বলিয়া মনে হয়, তবে সে মাত্র জ্ঞানেতেই সম্ভব নহে কি ?

হাঁ—এই জ্ঞানশক্তিসম্পন্নতা ও জ্ঞানস্বরূপতা বলিলে একমাত্র আত্মাকেই বুঝায়। জ্ঞানই তাঁর শক্তি এবং জ্ঞানই তাঁর স্বরূপ। শ্রুতি বলেন,—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।"

এই আত্মাই চারি পাদে বা চারি প্রকারে প্রকাশ হইয়া রহিয়াছেন। জাগরিতস্থান বা বহিঃপ্রজ্ঞা প্রথম পাদ। স্বপ্ন-স্থান বা অন্তঃপ্রজ্ঞা দ্বিতীয় পাদ। সুষুপ্তিস্থান প্রজ্ঞানঘন তৃতীয় পাদ। আর এ সকল অবস্থান অতিক্রম করিয়া, অথচ এগুলির আশ্রয়স্বরূপ অবাঙ্মনসগোচর শান্ত অদ্বৈত শিবস্বরূপ তুরীয় বা চতুর্থ পাদ।

এই চারি প্রকারে তিনি প্রকাশ পা'ন। আর এই চারি প্রকার প্রকাশের নাম বৈশ্বানর আত্মা, তৈজস আত্মা, অন্তর্য্যামী প্রাজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ আত্মা ও পরমাত্মা। ব্যবহারানুসারে এ নামভেদ।

বহিঃপ্রজ্ঞা বা বাহ্য বলিয়া যাহা কিছু ইন্দ্রিয় মন দ্বারা প্রত্যক্ষ কর, ইনিই বৈশ্বানর পুরুষ। পঞ্চ মহাভূতময় যে জগৎ-সৃষ্টি, আর সেই জগদ্ভোগ বোধ করিতে করিতে জাগ্রতভাবে তোমার যে অবস্থান, জ্ঞানের জাগ্রতনামে যে প্রকাশ, উভয়ই এক। জীবের জাগ্রত ভাব, ঈশ্বরের সৃজনভাব প্রায় একই। স্থূল বিষয়ভোগসম্পন্ন উহাই বৈশ্বানরনামীয় প্রথম পাদ। ইনিই আবার অক্ষিগত পুরুষ বলিয়াও উল্লিখিত হয়েন। অন্তঃপ্রজ্ঞা বা

অন্তরন্যামীয় যে জ্ঞানপ্রকাশ তুমি অন্তরে অনুভব কর, তোমার মনে মনে চিন্তা ও অনুভব করা বা স্বপ্নাবস্থায় বাহ্য জগৎ ছাড়িয়া অন্তর-ভোগ লইয়া যে অবস্থান, উহাই দ্বিতীয় পাদ বা আত্মার দ্বিতীয় প্রকার প্রকাশ। ইহা স্বপ্নস্থান। তুমি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়া মনে মনে, অন্তরে অন্তরে যে বিষয়-কল্পনা ও ভোগ কর এবং তাহাতে মমত্বময় হও, আর পরমেশ্বর সৃষ্টির যে কল্পনা ও তাহার মায়াময় সম্ভোগ করেন, এই উভয়ই এক এবং ইহাই আত্মার দ্বিতীয় পাদ।

তৃতীয় পাদ সুষুপ্তি বা প্রলয়স্থান। সুষুপ্তির সময় যখন জীব কিছুমাত্র দর্শন বা মনন করে না, এবং যখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-জ্ঞান লয় হইয়া একীভূত হয়, আর প্রলয়ে সমগ্র সৃষ্টি ও তাহার ভোক্তৃত্ব লীন হইয়া মাত্র জ্ঞানঘন আনন্দময়রূপে সর্ব্ব-প্রকাশশূন্য চেতনশক্তিময় হইয়া বিরাজ করেন, সেই উভয়ই এক, এবং উহাই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্য্যামী, সমস্ত ভূতের প্রভব ও প্রলয়ের একমাত্র কর্ত্তা বা কারণ। আর এই তিনটি কাল বা তিনটি অবস্থারূপে জ্ঞান-ক্রিয়াময় অবস্থা ব্যতীত কালাতীত, অবস্থাতীত, গুণাতীত, জ্ঞানময়, শান্ত, নিষ্ক্রিয় যে সত্তা যে চেতনসত্তার উপর পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি-রূপে চেতনক্রিয়া অথবা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ ঈশ্বরত্বের বিলাস প্রকাশ পায়, সেই একান্ত অদ্বৈত সত্তাই চতুর্থস্থান বা তুরীয়।

দেখ, তুমি জাগ্রত অবস্থায় যখন এই বিশ্বরূপ দর্শন কর, তোমার জ্ঞান বা চেতনশক্তি তখন বিশ্বের আকার গ্রহণ করে,

এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। জ্ঞান বিষয়াকার গ্রহণ করার নামই বিষয় দর্শন বা বিষয় ভোগ। তুমি বাহ্য জগন্মূর্ত্তি ইন্দ্রিয়-সাহায্যে দেখিতেছ অর্থেই তোমার জ্ঞান "বাহ্য জগৎ"রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ইহাই তোমার চেতনায় বহিঃপ্রজ্ঞানামীয় এক প্রকার প্রকাশ। তদ্রূপ পরমেশ্বর বহিঃ বা সৃষ্টিনামীয় চেতনাকারে বিশ্বরূপ সাজিয়াছেন ও আপনাকে বিশ্বরূপে জানিতেছেন। প্রভেদ এই, তুমি জান না বা লক্ষ্য করিতে পার না যে, তোমার জ্ঞানের বিশ্বরূপই তুমি দেখিতেছ; তিনি জানেন যে, তিনি আপনার বিশ্বরূপ আপনি দর্শন করিতেছেন। নতুবা তোমার ও পরমেশ্বরের এই বহিঃপ্রজ্ঞা একই। তিনি বিশ্বমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, আর তদনুসারেই তুমিও বিশ্ব অনুভব করিতেছ ও তদ্রূপ গ্রহণ করিতেছ। তাঁহার দর্শনের অনুসারে তুমি দর্শন করিতেছ, তাঁহার বাহ্য ভোগের অনুসারে তুমি বাহ্য ভোগ করিতেছ, তাঁহার সম্ভুক্তির অনুসারে তুমি অনুভূতি পাইতেছ। তিনি যাহা হইয়াছেন ও সমষ্টিরূপে ভোগ করিতেছেন, আমরা ব্যষ্টিভাবে তাহা অনুভব করিতেছি, এই পার্থক্য। যাই হউক, দশ ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার, এই চতুর্দ্দশ করণ ও পঞ্চ প্রাণ, এই ঊনবিংশ মুখে তুমি যখন বাহ্যজগদ্-ভোগময় হও, উহাই তোমার চেতনার জাগ্রত মূর্ত্তি।

যখন ইন্দ্রিয়-সাহায্যে বিষয় গ্রহণ না করিয়া, মনে মনে—অন্তরে অন্তরে বিষয় দর্শন ও বিষয় ভোগ কর অথবা নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখ, মনে মনে যখন কত কি দেখ, কত কি শোন,

কত স্থলে যাও, কত কি কর এবং তাহাতে প্রীতিময়, দ্বেষময়, মমত্বময়, আত্মীয়তাময় হও, সেই যে বহিরিন্দ্রিয়-ক্রিয়াহীন, ইন্দ্রিয় ও মন প্রাণাদির অন্তরেই ক্রিয়া, উহাই তোমার অন্তঃপ্রজ্ঞা-নামীয় চেতনার দ্বিতীয় প্রকার প্রকাশ। পরমেশ্বরও এইরূপ মানস সঙ্কল্প করেন ও তাহারই ফলস্বরূপ এই বিশ্বরূপ প্রকাশ পায়। আর বিশ্ব প্রকাশ করিয়া তিনিও অন্তঃপ্রজ্ঞাময় হইয়া ভোগ করেন। তবে প্রভেদ, তুমি বিষয়ে অভিভূত হইয়া অন্তঃপ্রজ্ঞায় বিচরণ কর, বিষয়ের অনুসরণে তোমার অনুভূতি হয়, আর তিনি স্বেচ্ছায় স্বীয় অন্তঃশক্তি পরিচালন করেন। নতুবা উভয়ই এক।

আর যখন তুমি সুষুপ্তি-সমাচ্ছন্ন হইয়া কিছুই কর না, কিছুই দেখ না, কেবল সুষুপ্তির শান্তি ভোগ কর, তাহাই তোমার চেতনার তৃতীয় প্রকার প্রকাশ। সুষুপ্তি সময়ে জীব পরমাত্মায় লীন হয়। কিন্তু সাধারণ জীব অচিদ্‌বোধপ্রধান বলিয়া সে জানিতে পারে না যে, পরমেশ্বরেই সে প্রবেশ করিয়াছে; সে শুধু সুষুপ্তিরূপ মূঢ়তাই অনুভব করে। অবশ্য তখনও তাহার জ্ঞান থাকে, সে সুপ্তিভঙ্গে বলে,—"বেশ নিদ্রা যাইতেছিলাম।" পরমেশ্বরও তদ্রূপ সমস্ত বিশ্ব স্বেচ্ছায় সংহরণ করিয়া, আপনাতে লয় করিয়া লইয়া, লয়ের শান্ত আনন্দের ভোক্তা হয়েন—মাত্র আনন্দময়, আনন্দের ভোক্তা স্বরূপে সমস্ত চৈতনশক্তি লয় করিয়া কারণরূপে অবস্থান করেন। এই শক্তির অব্যক্ত অবস্থান, আর জীবের এই সুষুপ্তি, উভয়ই এক। শুধু জীব সে অবস্থায় বিমূঢ় হইয়া থাকে, আর তিনি পরমেশ্বরস্বরূপ স্বীয়

সক্রিয় ভাবকে স্বেচ্ছায় অব্যক্ত করিয়া, স্বরূপভাবে প্রবেশ করেন বা মাত্র সত্তাবোধে সত্তারূপে অবস্থান করেন। আবার স্বেচ্ছায় সেই স্বীয় সত্তাবোধের উপর বিশ্ববৈচিত্র্য বোধ করেন ও বিশ্বরূপে প্রকাশিত হয়েন। পরমাত্মার পরমেশ্বরস্বরূপ চেতন-শক্তি এইরূপে একবার অব্যক্ত হইয়া মাত্র সত্তাবোধময় ও একবার বিশ্বক্রিয়াময় হয়েন। ইহাই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব, ঈশ্বরত্ব, অন্তর্য্যামিত্ব। প্রলয়ে আনন্দভুক্—আনন্দময়—নিষ্ক্রিয়। কেন না, তাঁহার সত্তাই ভূমা আনন্দস্বরূপ, ভূমা সুখস্বরূপ; আর বিশ্ব-প্রকাশে বিশ্বকর্ম্মানন্দময়। এইরূপ বিশ্বকারণত্বই তাঁহার তৃতীয় পাদ। প্রলয়ের বিশিষ্ট আনন্দের ভোক্তা।

এই যে তোমার জাগ্রদাদি তিন অবস্থার কথা বলিলাম, ইহাদিগেরই কেন্দ্রের নাম ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি। পরমাত্মার ওইরূপ তিন ভাব অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, লয়রূপ শক্তির নামই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। জাগ্রত অবস্থায় তোমার যে জগৎরূপ জ্ঞানায়তন প্রকাশ পায় অর্থাৎ যে জগৎ প্রভৃতির অনুভব কর, উহা পরমাত্মার সৃষ্টির অনুসারে হয় অর্থাৎ তিনি যেমন সাজিয়াছেন, সেই ধরণেই তুমি তাঁহাকে অনুভব কর। ব্রহ্মার কার্য্যানুসারে অনুভূতি হয়, এই জন্য উহাই তোমার ব্রহ্মগ্রন্থি। আর মনে মনে যে বিষয় ভোগ করা অথবা বিষয়াদি হইতে সুখ-দুঃখ-মমত্ব প্রভৃতি অন্তরের বেদন লাভ করা, ইহাই হৃদয়গ্রন্থি বা বিষ্ণুগ্রন্থি। বিরাট্ পরমেশ্বরের এইরূপ মায়াময় হইয়া থাকাই তাঁহার বিষ্ণুত্ব।

আর সুষুপ্তি অবস্থায় যে প্রকাশ, উহাই তোমার রুদ্রগ্রন্থি ও প্রলয় প্রকাশই পরমাত্মার রুদ্রত্ব। আমি এ গ্রন্থিগুলির কথা পরে ভাল করিয়া বলিতেছি।

আর চতুর্থ পাদ সেই সত্তামাত্র, শক্তিত্বের সর্ব্বলক্ষণশূন্য, কার্য্যকারণবোধহীন, এক অদ্বৈত-বোধ বা একাত্মপ্রত্যয়সার, শান্ত, ক্রিয়ার অগোচর, অবস্থার অগোচর, কালের অগোচর— যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এই পূর্ব্বোক্ত শক্তিবিলাসময় পাদত্রয় প্রকাশ পায়। যেমন মৃৎকুম্ভে মৃত্তিকা-বোধ ও কুম্ভত্ব-বোধ, উভয় বোধই ফোটে; কিন্তু মাত্র কুম্ভত্বের যখন বোধ কর, তখন মৃত্তিকার বোধ থাকে না; আবার মাত্র মৃত্তিকার যখন বোধ কর, তখন কুম্ভত্বের বোধ থাকে না; আবার মৃৎকুম্ভ বলিয়া যখন একসঙ্গে বোধ কর, তখন একসঙ্গে মৃত্তিকা ও কুম্ভ, উভয় বোধই থাকে, ইহাও তদ্রূপ। মাত্র সত্তা-বোধে কারণত্ব বা পরমেশ্বরত্বরূপ বোধ থাকে না। কিন্তু পরমেশ্বরত্বরূপ বোধে সত্তা-বোধেরই উপর ভাসমান জগৎকর্ম্ম-বোধ থাকে। আবার জীবরূপে সত্তাবোধ একান্ত প্রচ্ছন্ন হইয়া, মাত্র অনুভূতি-ক্রিয়াময় জীবত্বই বোধ হয়। কেহ যেন মনে করিও না যে, বিজ্ঞানমতে মন এক সঙ্গে দুই প্রকার বিভিন্ন ভাব ধারণ করিতে পারে না। মৃত্তিকা বোধের মুহূর্ত্তে তৎসঙ্গে কুম্ভত্বের বোধ অসম্ভব। মন অতিদ্রুত দুইটি বিষয় একের পর অন্য, এই ভাবে দেখে বলিয়া, সেই জন্য মনে হয়, যেন দু'টি বিষয় অর্থাৎ মৃৎ ও কুম্ভ একসঙ্গে বোধ করিতেছে। বস্তুতঃ কিন্তু উহা

ভিন্ন ভিন্ন সময়েই বোধ হইতেছে ; সুতরাং আপনার ও দৃষ্টান্ত ঠিক হইল না। না, এইরূপ আশঙ্কা মনের সম্বন্ধে করিতে পার, কিন্তু আত্মার সম্বন্ধে নহে। যিনি যুগপৎ অনন্ত বিশ্বক্রিয়া বোধ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে এ আশঙ্কা আসিতে পারে না। সে কথা দর্শনশাস্ত্র বলিবার সময় ভাল করিয়া বলিব। তাঁহার কথা ত দূরের—মুক্ত পুরুষও এক সময়ে একা বহু মূর্ত্তি ধরিয়া যুগপৎ বহু ভাব প্রকাশ ও বহু প্রকার ব্যবহার করিতে সক্ষম।

যাহা হউক, এই যে পরম অবাঙ্মনসগোচর বোধরূপ সত্তা, ইহাই আমাদিগের লভ্য। অস্তিরূপে সত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া ফুটাইয়া তোলা ইহার আরম্ভ এবং প্রাণপ্রতিষ্ঠা সাহায্যে হৃদ্‌গ্রন্থি ভেদ করিয়া, রুদ্রগ্রন্থিতে আমিত্বের লয় করিয়া, ইহার সম্যক্ লাভ হয়। কিন্তু এই সত্তা ধরিতে হইলে সেই সত্তার মহিমা অবলম্বন করিয়া তবে ধরিতে পারা যায়। সেই জন্য বিশ্বকে সত্য-বোধে দর্শন না করিলে সত্তা মিথ্যায় আবৃত হইয়া যায়। বিশ্বকে সেই জন্য সত্য বলিয়া এবং সেই সত্তারই মহিমময় মূর্ত্তি বলিয়া দেখিতে ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন। কেন না, বস্তুতঃ সে মহিমা বা কর্ম্ম অথবা শক্তিপ্রকাশ তাঁহারই নিজের তদাকারে প্রকাশ হওয়া বা তিনি নিজেই।

এই সত্তা-বোধ কেমন জান? তোমরা জল আহরণ করিতে অথবা অবগাহন করিতে যখন নদীতে নামিয়া যাও, তখন প্রধানতঃ তোমার কি বোধ হয়? নদীর উপর তরঙ্গ আছে, বিম্ব আছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহর আছে, জলের

স্বচ্ছতা মলিনতা আছে, কিন্তু প্রধানতঃ সেখানে কি দেখ ? জল—জলরাশি। জলের তরঙ্গ, জলের লহর, জলের স্বচ্ছতা, জলের মলিনতা—সব দেখ, কিন্তু জল-বোধই সেখানে প্রধান। তদ্রূপ চিন্ময় আত্মার সত্ত্ব-বোধ—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। চিন্ময় আত্মার সূর্য্যমূর্ত্তি, চিন্ময় আত্মার চন্দ্রমূর্ত্তি, চিন্ময় আত্মার আকাশ-মূর্ত্তি, অগ্নিমূর্ত্তি, এ সব বোধ চিন্ময় সত্তা-বোধের উপরই ওই তরঙ্গাদি-বোধের ন্যায় ভাসে। কিন্তু প্রধানভাবে সম্মুদ্ধ করিতে হইবে চিন্ময় সত্তা-বোধ। সন্তানকে সোহাগ দেখাইতে, আদর করিতে মাতা কত প্রকার ভাবেই বিভোরা হয়, কিন্তু সেই সমস্ত বোধের তলায় প্রধানভাবে থাকে যেমন সন্তান-বোধ, তদ্রূপ আশ্রয়-আশ্রিত-বোধ বা আত্মীয় বোধ করিতে যত প্রকার ভাবের বিপর্য্যয় হউক না কেন, প্রধানভাবে থাকিবে চিন্ময় সত্তা-বোধ। সত্যপ্রতিষ্ঠায় অন্তর্ব্বিকাশ লাভ হইলে অর্থাৎ অন্তর্ব্বাহ্য এক হইয়া এক সর্ব্বান্তর সত্তা-বোধ জাগিয়া উঠিলে দেখিবে, আপনার চেতন-সত্তাকেই বেড়িয়া বেড়িয়া তোমার সমস্ত বোধ উল্লাস পাইতেছে। আশ্রয় বলিয়া, আত্মীয় বলিয়া, প্রাণ বলিয়া তোমার অন্তরস্থ অথবা সকলের অন্তরস্থ চিন্ময়কেই সেবা করিতেছ। অহো! আমি আমি করিয়া এই যে আমরা বিশ্ববিপর্য্যয়ে মত্ত থাকি, এ যে তিনিই আমি আমি করিতেছেন। ইনি—এই আত্মাই যে আপনি আপনাকে নানা ভঙ্গিমায় রমণ করিতেছেন, বিলাস করিতেছেন। সুতরাং বিশ্ব-মহিমার সাহায্যে এই সত্তার দিকে স্থির চক্ষু সংস্থাপিত করিবে।

ওগো, তোমরা কেহ কখনও কি এমন অপূর্ব্ব নারীকে দেখিয়াছ, যে আপনি আপনার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া বিচরণ করে? যে আপনি আপনার নয়নে আপনার মুখ দর্শন করে? আপনি আপনার প্রেমে বিভোর হইয়া, আপনাকে কখনও খণ্ডে খণ্ডে দূরে ঠেলিয়া, বিরহ-ব্যথায় ব্যথিতা হইয়া, আবার আপনি আপনাকে গাঢ় আলিঙ্গনে সম্বদ্ধ করিয়া এক হইয়া যায়? আপনি আপনার মুখচুম্বন করিয়া তৃপ্তির মদিরায় আপনাকে প্লাবিত করে? আপনি আপনার জন্য কাঁদে হাসে, আপনি আপনাকে সৃজন করে, গ্রাস করে, আপনি আপনাকে হারাইয়া, আপনি আপনাকে খুঁজিয়া বাহির করে—আপনি আপনার মাতা হইয়া আবার আপান আপনার বধূ হয়! আর এত করিতে গিয়াও সে আপনি আপনাকে ভোলে না—আপন সত্তা বিকৃত করে না, আপনি ঠিক না থাকিয়াও ঠিকই থাকে! যখনই কিছু করে, তখনই আপনি আপনাতে থাকিয়াই আপনি আপনার বাহির হইয়া তবে করে। আর অন্য দিকে সকল সময়েই করাকরি বলিয়া কোন কিছুই সে জানে না! এস ত, একবার আমরা সে উন্মাদিনীকে সেই তার নৃত্যহীন শান্ত স্থির নিষ্কল মূর্ত্তিতে দাঁড়াইবার জন্য তার পদ-নখর একবার চুম্বন করি! সে চুম্বন অবশ্যই আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া পাইব, ইহা আমি জানি!

"স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম। স্বয়মেব আত্মানং আত্মনাহকুরুত।" তিনি আপনি আপনাকে জানেন, আপনি আপনাকে নানা করেন। "আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং"—মাণ্ডুক্য।

আপনি আপনাতে প্রবেশ করেন। ইহাই সে সত্তার মহিমা এবং সে মহিমা তাঁহা হইতে ভিন্ন না হইয়াও ভিন্ন হইয়া প্রকাশ পায়—তাই তিনি নির্লিপ্তভাবেই সর্ব্বকালে অবস্থান করেন। এই নির্লিপ্তাবস্থান সত্তাবোধের অপূর্ব্ব মহিমা। এই স্বসম্বেদ্যতা বা আপনি আপনাকে জানা সত্তাবোধে পৌঁছিবার প্রধান উপায় ও তাঁহার সনাতন স্বরূপ-ধর্ম্ম। তিনি আপনি আপনাকে জানেন না, এমন কখনও হয় না। তবে কখনও বিশেষভাবে বিলাস-ব্যঞ্জনা প্রকাশ করিয়া, আর কখনও নির্ব্বিশেষভাবে—আপনি আপনাকে জানিতেছি, এরূপ বোধও থাকে না—একান্ত সহজভাবে, বৈচিত্র্যশূন্য বোধে। 'জ্ঞ" মাত্র তখন তিনি। তখন "জ্ঞ" না হইয়াও "জ্ঞ"—কেন না, চেতনা কখন অচেতন নয়; তাই তিনি "জ্ঞ"। আপনি নির্ব্বিশেষ-ভাবে আপনার "জ্ঞ"। জগৎকারণত্বের বোধও তাঁহাতে নাই।

যাহা হউক, পূর্ব্বে কথিত সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," এই যে শ্রুতির মহাবাক্য, আমি সেই সম্বন্ধে এইবার বলিতেছি। ওই যে তোমার জাগ্রতস্থান বা জাগ্রতনামীয় বিশ্বদর্শনময় জ্ঞানের আয়তন অথবা প্রকাশ অথবা এই যে সৃষ্টিশক্তি ব্রহ্মার জগৎপ্রকাশ, ইহাই সত্যশব্দে অভিহিত এবং সেই জন্য ইহা সত্য বলিয়াই দর্শন করিবে।

আর ওই যে তোমার অন্তরে পূর্ব্বোক্ত ভাবে প্রকাশিত জগতের উপর মমত্বময়, আত্মীয়তাময়, সুখ-দুঃখ, হর্ষবিষাদময় মুগ্ধকারী হৃৎস্পন্দন বা অনুভূতিরূপ বেদন, ইহাই চিৎক্রিয়া বা

জ্ঞান। জগৎপ্রকাশও জ্ঞান; কিন্তু জ্ঞানের যেন অনাত্ম বা অজ্ঞাননামীয় বা জ্ঞেয়ত্বনামীয়, যেন আত্মা হইতে অন্য, এইরূপ প্রকাশ অংশ মাত্র। আর আত্মা হইতে সেই অন্যরূপে প্রকাশটি অবলম্বন করিয়া যে হৃদয়-ব্যবহার প্রকাশ পায়, উহাই সাক্ষাৎ আত্মচেতনার পরিচয় বা উহাই যেন জ্ঞান বা অনুভূতিপদবাচ্য।

আর ওই জ্ঞানশক্তিই সমস্ত প্রকাশ করে ও সমস্ত উহাতেই লয় হয়; যত কিছু বৈচিত্র্য—সমস্ত, তাঁহার ঈশ্বরত্ব বা আত্মার জ্ঞানশক্তির অনন্তরূপে প্রকাশ ও সংহরণ, এই জন্য তাঁহার তৃতীয় পাদোপযুক্ত নাম অনন্ত।

আর সেই সমস্ত জ্ঞানস্বরূপ আত্মারই প্রকাশ, এই একাত্ম-প্রত্যয়ই প্রকৃত ব্রহ্মত্বের লক্ষণ। এই জন্য এই পাদত্রয়ের আশ্রয় ও পাদত্রয়ের অতীত এই চতুর্থ পাদকে বলা হয় ব্রহ্ম। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতির ইহাই প্রকৃত অর্থ এবং ইহা এইরূপে আত্মার পাদচতুষ্টয়কেই লক্ষ্য করে।

আর সেই জন্য ব্রহ্মগ্রন্থিতে সত্যপ্রতিষ্ঠা, বিষ্ণুগ্রন্থিতে প্রাণ বা বেদন-প্রতিষ্ঠা আর রুদ্রগ্রন্থিতে মন্ত্রচৈতন্য বা চৈতন্য-শক্তি-সিদ্ধি লভ্য।

তোমরা আত্মীয়-বোধের সাধনায় কৃতকার্য্য হইলে এই নির্লিপ্ততা ও স্বসম্বেদ্য ভাব অবলম্বন করিবে। আত্মবোধ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হয় না। সেখানে সকলেই গুরু হয়, শিষ্য কেহ থাকে না। অথবা গুরুও থাকে না, শিষ্যও থাকে না। ভোক্তাকে ভোগের আস্বাদ বলিয়া দিতে হয় না।

ওরে ! এই "থাকে না" লইয়া পণ্ডিত-জগতে বড় একটা মাথা-ঠোকাঠুকি আছে। কেহ বলেন, "খুব থাকে।" কেহ বলেন, "বিন্দুমাত্র না।" শুনিয়াছি, কোন স্বনামখ্যাত রাজার এক স্বনামখ্যাত প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বুদ্ধি বাহির হইয়া যাইবার ভয়ে শরীরের নব দ্বারে তুলা দিয়া সিন্দুকমধ্যে অবস্থান করিতেন। এবং সে রাজার অন্যান্য পণ্ডিতও ছিলেন, যাঁহারা বুদ্ধিতে প্রধান মন্ত্রীর সমকক্ষ না হইলেও প্রায় তত্তুল্য। একদিন একটী চলচ্ছক্তিহীন সদ্যপ্রসূত শূকরশাবক লইয়া রাজসভায় বিচার-সমস্যা বাধিয়া গেল। একজন মন্ত্রী বলিলেন, "এটি মূষিক-বৃদ্ধি।" একটী মূষিক বর্দ্ধিতাবয়ব হইয়া এরূপ হইয়াছে। অন্য মন্ত্রী ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, "এটী গজক্ষয়।" একটী হস্তী ক্ষয়িত হইয়া এরূপ হইয়াছে—প্রকৃত এটী হস্তী। তখন সিন্দূকস্থ প্রধান মন্ত্রীর সিদ্ধান্তের আবশ্যক হইল। তাঁহাকে আনিয়া সন্তর্পণে তাঁহার চক্ষুর তুলা অপসৃত করা হইলে তিনি বিশেষ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "এটীর যখন লাঙ্গুল রহিয়াছে, তখন অবশ্যই এটী পুষ্করিণী।" অবশ্য শূকর-শাবকের পরিচয় জানা থাকিলে মন্ত্রীদের এরূপ বিচার-পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইত না। তোমরা সেরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া সিদ্ধান্ত করিতে মত্ত হইও না। তাহা হইলেই ওই "মূষিক-বৃদ্ধি" বা "গজক্ষয়" অথবা "পুষ্করিণী" ইহাই দেখিবে। এ জগৎ যাহা দেখিতেছি, তাহাই সেই তিনিই, যিনি ভিন্ন অন্য কেহ নাই। তবে কেন অচেতনবৎ দেখিতেছি, কেন নানা বলিয়া

দেখিতেছি ? ওই স্ব স্ব বুদ্ধির বলে মাত্র অচেতন বলিতেছি বলিয়া, মাত্র নাস্তি বলিতেছি বলিয়া। বল সেই সত্তাই—যিনি ভিন্ন অন্য সত্তা নাই—তিনিই এইরূপ হইয়াছেন। কেন হইলেন, কি প্রকারে হইলেন, এটী মিথ্যা মরীচিকাবৎ প্রকাশ কিংবা অচিৎ পদার্থ, এত কথা ভাবিও না। তাঁর সত্তাই দেখিতেছ—নদীদর্শনে জলবোধ প্রকাশের মত, প্রধান ভাবে সেই চিন্ময়ের সত্তাবোধ তোমার জগদ্‌বোধের সঙ্গে ফুটিয়া উঠুক, তুমি আত্মাকে আত্মারই কৃপায় বুঝিবে। সত্তাবোধ উদ্বুদ্ধ হইলেই আশ্রয়-বোধ, পরমাত্মীয় বোধ ও অবশেষে আত্মবোধে তিনিই তোমায় স্বস্থ করিবেন এবং তখনই সত্য উপলব্ধি হইবে,—সে সত্তায় কিছু থাকে বা থাকে না—অথবা থাকিয়াও থাকে না, কিংবা না থাকিয়াও থাকে।

শোন, মৃৎকুম্ভে মৃত্তিকার যেমন কুম্ভত্ব আছে, অথচ মৃদ্‌বোধে কুম্ভত্ব নাই—তেমনই তাঁহাতে সব আছে, কিন্তু তৎসত্তাবোধে মহিমাবোধ নাই। কিন্তু কুম্ভ অবলম্বন করিয়া মৃৎলাভের মত মহিমা অবলম্বন করিয়াই সত্তাবোধে পৌঁছিবে। প্রকৃত পক্ষে সে সত্তার বোধে কোন ভাবও নাই, কোন অভাবও নাই। শ্রুতি বলেন, তাঁহার একাত্মপ্রত্যয়সার সংস্থানে "তিনি কিছু দেখেন না; দেখিতে পারেন না বলিয়া দেখেন না নহে, দেখেন না বলিয়া দেখেন না। তিনি কিছু শোনেন না; শুনিতে পা'ন না বলিয়া শোনেন না নহে, শোনেন না বলিয়া শোনেন না।" এইরূপ সমস্ত। ওরে! তিনি অরূপ সত্য, কিন্তু

সকল রূপ যেন উছলিয়া রহিয়াছে, শুধু রূপের ভাব বা অভাব-বোধ নাই—ফোটালেই ফোটে, শুধু বিশিষ্টতা নাই। তিনি অপ্রাণ সত্য, কিন্তু সকল প্রাণ যেন একপ্রাণ হইয়া, প্রাণহীন প্রাণ হইয়া রহিয়াছেন। ওরে! প্রকাশের জন্য রূপপ্রকাশ। যেখানে স্বপ্রকাশ, সেখানে আর ভিন্ন করিয়া রূপপ্রকাশ কি রে! প্রাণের জন্য প্রাণন। যেখানে প্রাণ স্বপ্রাণ, সেখানে প্রাণের জন্য প্রাণন কি রে? আত্মলাভের জন্য আত্মা কর্ম্মময়। যেখানে আত্মাই, সেখানে আর ক্রিয়া কি রে? তাই সত্তা অরূপ, অপ্রাণ, অক্রিয়, জ্ঞমাত্র। অথচ তিনিই পূর্ণ, তাই অপূর্ণতার লীলা; জ্ঞানস্বরূপ—তাই অজ্ঞানের বিলাস। আর তাই সে অপূর্ণ লীলাও পূর্ণ হইয়াই প্রকাশ পায়—সে অজ্ঞানও জ্ঞান-ক্রিয়ারূপেই প্রকটিত হয়। আত্মা উভয়লিঙ্গ, এ কথা ভুলিও না।

যাক্। আমি বলিয়াছি, তাঁহার "নির্লিপ্ততাভাব" আর "স্বসম্বেদ্যভাব" সত্তাবোধে বিশেষ করিয়া দেখিতে। স্বসম্বেদন অর্থে আপনি আপনাকে জানা। তিনি আপনি আপনাকে জানিতেছেন, আপনি আপনাকে বোধ করিতেছেন, এই আকারে সত্তাবোধের অনুশীলন করিবে। যত করিবে, ততই আনন্দ-স্বরূপ প্রকাশ পাইতে থাকিবে।

কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখিও, আত্মীয়তা-বোধ না ফুটিলে অর্থাৎ হৃদয়গ্রন্থি বা প্রাণগ্রন্থি সম্যক্ উন্মুক্ত না হইলে তাঁহার এ রুদ্রগ্রন্থিরূপ পরমেশ্বরত্ব ও রুদ্রগ্রন্থির উপরিস্থিত এ

একাত্মপ্রত্যয়সার ব্রহ্মত্ব সম্যক্ সম্বুদ্ধ হয় না। আমি আত্মীয়বোধের স্থূল অংশ বা ভাব সম্বন্ধে বলিয়াছি, এইবার তাহার মুখ্য তত্ত্ব প্রাণপ্রতিষ্ঠা নামে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। শুধু একটি কথা বিশেষ করিয়া এই তুরীয় অবস্থান সম্বন্ধে মনে রাখিতে বলি। আত্মার যে চারিটি পাদের কথা বলা হইল, উহা হইতে স্পষ্ট বুঝিয়া লইবে যে, মাত্র একান্ত চিন্ময় আত্মা ভিন্ন অন্য কেহ বা কিছুই নাই। তিনিই সৎ অসৎ, মূর্ত্ত অমূর্ত্ত রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি আপনাতে যখন এ সমস্ত রূপ সংহরণ করেন, তখন সে তুরীয় পাদ অবিসংসারী বা সনাতনস্বরূপ থাকে, তাহা প্রজ্ঞও নহে, অপ্রজ্ঞও নহে। অর্থাৎ সর্ব্বভাবের, সর্ব্বপ্রত্যয়ের অবসান হয় বলিয়া, বাক্যে তাহা ব্যক্ত করা যায় না। তবে আত্মপ্রত্যয়শূন্য সে পাদ নহে—আত্মপ্রত্যয় থাকে। আপনি আছেন, এ জ্ঞান থাকে ; এ চেতনার অপলাপ হয় না। হইলে অচেতন বলিতে হইত। সেই জন্য সে অবস্থার নাম আত্মপ্রত্যয়সার অবস্থা।

এস এস ! প্রাণপ্রতিষ্ঠা শুনিবার পূর্ব্বে একবার প্রাণ ভরিয়া বলি,—"আত্মা পুরস্তাৎ আত্মা পশ্চাৎ আত্মা উত্তরত আত্মা দক্ষিণত আত্মৈবেদং সর্ব্বং।"

ওরে, যতই বল, বলা ফুরায় না—যতই শোন, শোনা ফুরায় না। তাই বলা শুনা ত্যাগ করিয়া শুধু বোধ করি আয়, বোধ করি আয়—সম্বুদ্ধ হই আয়—সেই আত্মসম্বোধে—যে সম্বোধে আত্মপ্রত্যয়ই বিদ্যমান। ইহাই সত্যপ্রতিষ্ঠার শেষ লাভ।

ইহাই সত্যের ধাম—ইনিই পরম সত্য। তোরা সত্যের বললাভ করিয়া উদ্বুদ্ধ হ। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥" সত্যের পথ ক্ষুরধারতুল্য শাণিত—সাবধান! যেন সে বোধে মিথ্যার, অচেতনতার, কৃত্রিমতার বিন্দুমাত্র মলিনতা না থাকে।

ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি

বাক, মন ও প্রাণ

শ্রুতিতে আছে, ব্রহ্ম আপনার জন্য তিনটী অন্ন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সে তিনটী অন্নের নাম—বাক্, মন ও প্রাণ। তিনি এই তিন অন্নের ভোক্তা, তাঁহার এ বিশ্বরূপে যেখানে যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই এই তিনের প্রকাশ। মর্ত্তলোক হইতে ব্রহ্মলোক অবধি, ক্ষুদ্র মর্ত্ত্য কীট হইতে ব্রহ্মাদি অমৃতসেবী পর্য্যন্ত সকলই তাঁহার এই তিন প্রকার প্রকাশ মাত্র। এই সৃষ্টি বাঙ্ময়, মনোময় ও প্রাণময়। আত্মা বাঙ্ময়, মনোময় ও প্রাণময়।

জীবে, বিশেষতঃ মানুষ্যে এই তিনের ওতপ্রোত সংস্থান ও পরস্পরের নিত্য সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। বাক্য হইতে জগতের উৎপত্তি, ইহা শ্রুতি-কথিত। পরমাত্মা বলিলেন—আমি ব্রহ্ম, আর সেই বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট্ বিশ্বরূপ ধারণ করিলেন। তিনি বাক্যাকারে বোধ করিলেন ও হইলেন। এই যে শ্রুতি-কথিত সিদ্ধান্ত, ইহা আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগের বোধতত্ত্ব সম্বন্ধে একটু বুঝিতে হয়। আমরা যখন কিছু অনুভব করি, তখন এই তিনটি অর্থাৎ বাক্য, মন ও প্রাণ তাহাতে দেখিতে পাই। আমরা প্রকৃত পক্ষে অনুভূতি লইয়াই সর্ব্বদা মত্ত থাকি। বাহিরে বোধশক্তিসম্পন্ন ও বোধস্বরূপ

পরমাত্মা বাক্য, মন ও প্রাণের সাহায্যে বিষয়রূপ পরিগ্রহণ করিয়াও তাহার সাক্ষিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন; অন্তরেও সেইরূপ সকল বিষয়ের ভোক্তা বা অনুভবকর্ত্তা ও সেই অনুভূতির সাক্ষি-স্বরূপ হইয়া তিনিই অবস্থান করিতেছেন। এ সম্বন্ধে পরে বিশদ করিয়া বলিব। এখন এই অনুভূতির অন্তর্গত বাক্য, মন ও প্রাণের ক্রিয়াটুকু আলোচনা করিতেছি। শব্দশূন্য বিষয়ের অনুভূতি হয় না, শব্দই চেতনার প্রথম স্ফুট। কি বাহিরের বিষয়, কি অন্তরের চিন্তাদি বা সুখ-দুঃখাদি বিষয়, যাহাই অনুভব করি না, শব্দ থাকিবেই ; বোধশূন্য শব্দ বা শব্দশূন্য বোধ সাধারণতঃ অসম্ভব। পরমাত্মা যখন যাহা বোধ করেন, তাহাই হ'ন। এই জন্যই এ সংসারকে ভবসংসার বলে, আর সেই বিষয়রূপ পরমাত্মাকে বা বিষয়কে যখন আমরা বোধ করি, তখন আমাদিগের বোধ তদাকারই গ্রহণ করে, এই জন্য ইহার নাম অনুভব। অনু পশ্চাৎ ভবতি ইতি অনুভব। কোন বিষয় অনুভূতির সময়ে বুদ্ধি সেই বিষয়টিকে বা অনুভূতিটিকে নিশ্চয় করিয়া ব্যক্ত করে। এটি ফুল, এটি ফল, এটি সুখ, এটি দুঃখ, এটি শীতল, এটি শব্দ, ইত্যাকার নিশ্চয় করারূপ যে চেতনবৃত্তি বা প্রবাহ, উহাই বুদ্ধি। আর ওইরূপ বুদ্ধি প্রকাশ পাইলে অহংনামীয় বৃত্তিটি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। "আমি" এই বৃত্তিটি সর্ব্ববিষয়ে অধিকারপ্রয়াসী। বুদ্ধি কোন বিষয় নিশ্চয় করিয়া দিলে "আমি" তাহার সহিত কোন না কোন রকম সম্বন্ধে যুক্ত না হইয়া থাকি না। "অহং" অভিমান সেই

বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বুদ্ধ না হইয়া থাকে না। আর সেই বুদ্ধি ও "অহং" অভিমান সংযুক্ত হইলে, তখনই সেই বিষয় সম্বন্ধে যে সঙ্কল্প-বিকল্পরূপ বৃত্তি বা চেতনপ্রবাহ ফোটে, উহাই মন। আর চিত্ত যেন সমস্তের আশ্রয়, সমস্তের স্মৃতি বহন করিয়া উপাদানস্বরূপ অবস্থান করে।

আর যেখানে এই অনুভূতিক্রিয়া ও মননাক্রিয়া নিমীলিত হইয়া, মাত্র জ্ঞানাকারে পর্য্যবসিত হয়, সমস্ত ভাব ও ক্রিয়া যাহাতে বিলুপ্ত হয়, সুষুপ্তিতে যেখানে জীব জ্ঞান বা বোধ-মাত্রে পরিণত হয়, আবার যেখান হইতে জাগ্রত হইয়া অনুভূতিময়, ক্রিয়াময় হয়, সেই গ্রন্থির নাম রুদ্রগ্রন্থি। ইনিই বোধ বা অন্তরাকাশ বা হৃদয়স্থিত অন্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, চিৎশক্তিময় আত্মা। চেতনশক্তি প্রলয়ে বা সুষুপ্তিতে এইখানে অব্যক্ত থাকেন, কারণরূপে বা শব্দের অক্ষররূপে বর্ত্তমান থাকেন। আবার চেতনশক্তি যখন ক্রিয়াশীলা হন, তখন সে ক্রিয়ার সাক্ষিস্বরূপ হইয়া আত্মার অবস্থানও এই গ্রন্থিতে।

বিষয়ের নাম ও রূপ যেখানে প্রকাশ হয়, তাহারই নাম অন্তঃকরণ বা মন। বৃক্ষ, পুষ্প, চন্দ্র, সূর্য্য, মনুষ্য ইত্যাকারে সংজ্ঞাসকল ও আকারসকল প্রতীত হয়—উহাই অন্তঃকরণ বা মনের ক্রিয়া। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার—এই চারিটি অন্তঃ-করণ। ইহারা সাধারণতঃ মন নামেই অভিহিত হয় এবং ইনিই বিরাটে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা। আমি ফুল দেখিলাম, আমি শব্দ শুনিলাম, আমি শীতলতা অনুভব করিতেছি—নামরূপের দ্বারা

এইরূপ অনুভূতির ও বিষয়ের পরিচয় ও সেই পরিচয় অনুসারে সঙ্কল্পাদি করা, উহাই মনের কার্য্য। এই যে ক্রিয়াত্মক চেতনা, ইহারই নাম "ব্রহ্মগ্রন্থি" ও পরমাত্মার বিশ্ব-রচনাময় ভাবের নামই ব্রহ্মা।

আর বিষয় সংস্পর্শে আমাদিগের হর্ষ, বিষাদ, ভয়, শান্তি, স্নেহ, মায়া, প্রীতি, করুণা প্রভৃতি যে হার্দ্দ ধর্ম্ম প্রকাশ পায়, উহার নাম হৃদয়গ্রন্থি বা "বিষ্ণুগ্রন্থি" বা প্রাণক্রিয়া। অবশ্য এই সকল হার্দ্দ ধর্ম্মের পরিচয় প্রকাশ পায় মনে; মনকে ছাড়িয়া হয় না—উহার নামরূপাত্মক আয়তন মনেতেই প্রকাশ পায়। অনুভূতিরূপ ক্রিয়াটিই হৃদয়গ্রন্থি—ইহাই অন্তর। মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তরের করণ ও হৃদয় অন্তর। আর চেতনার শব্দাকারীয় যে স্ফুটন হয় অর্থাৎ চেতনাই শব্দের আকার গ্রহণ করিয়া এক দিকে মনকে বিষয় রচনায় বা বিষয়মূর্ত্তি গ্রহণে সাহায্য করেন ও অন্য দিকে হৃদয়কে বা প্রাণকে তদ্বিষয়সঙ্গ-জনিত উদ্বেলন বা অনুভূতিময় করেন, সেই কারণস্বরূপ অবস্থান—রুদ্রগ্রন্থি।

এই যে তিনটী গ্রন্থি অর্থাৎ এই যে তিন প্রকারের চেতন-ক্রিয়ার আবর্ত্তন, এই তিনটি আত্মার অন্ন। ইহা দ্বারা তিনি বিশ্বরচনা ও ভোগ করেন। সুতরাং তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে এই তিনটি সম্যগ্ ভাবে তাঁহাকে নিবেদন করিতে হইবে। পরমাত্মাকে এই তিনটি নিবেদন করার অর্থ—এই তিনটি সম্যগ ভাবে তন্ময় করা। এই তিন প্রকারের বোধক্রিয়া যখন

তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কিছু গ্রহণ করিবে না, তখনই জীব আত্মস্থ হয়। সঙ্কল্প-বিকল্পময় বৃত্তি বা জ্ঞানপ্রবাহের নাম মন। নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি অর্থাৎ এইটী মনুষ্য, এইটী সূর্য্য, এইটী সুখ, এইটী দুঃখ, এইরূপ নিশ্চয় করারূপ যে জ্ঞানক্রিয়া, তাহারই নাম বুদ্ধি। "অহং"—"আমি" এই প্রকারের বুদ্ধির নাম অহঙ্কার। আর এই সকলের ও স্মৃতি প্রভৃতির উপাদানকে বলে চিত্ত। এখন দেখ, মনকে যদি আত্মময় করিতে হয়, তবে এই তিন প্রকারের ক্রিয়া তাঁহারই সম্বন্ধে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। তাঁহার সত্তা সম্বন্ধে স্মৃতি ও নিশ্চয়বোধ জাগিয়া থাকিবে, এবং সঙ্কল্প তন্মুখেই আমাকে চালনা করিতে থাকিবে। আমার আমিত্ব তাঁহাকে লইয়া মত্ত হইয়া সেই ভাবে মগ্ন হইবে। এইরূপ হইলে মন তাঁহাতে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যেরূপ অনুশীলনের সাহায্যে এই প্রকারে মন তন্মুখী গতি লাভ করে, তাহারই নাম সত্যপ্রতিষ্ঠা। বাক্, মন, প্রাণ—সমস্তকেই তন্ময় করিবার উপায় সত্যপ্রতিষ্ঠা হইলেও প্রাণ ও বাক্যের তন্ময়তা বিশেষ ভাবে লাভ করিতে হইলে সত্যপ্রতিষ্ঠার যে বিশিষ্টতা উপলব্ধ হয়, তাহার নাম প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও মন্ত্রচৈতন্য। সে কথা পরে বলিব।

তবেই প্রধানতঃ সত্যপ্রতিষ্ঠার তিনটী সাধারণ বিভাগ,—সত্যপ্রতিষ্ঠা, প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও মন্ত্রচৈতন্য। ব্রহ্মগ্রন্থিতে বা মনে পরমাত্মসত্তা অবলম্বন ও তদুচিত মানসিক ব্যবহার, ইহার নাম সত্যপ্রতিষ্ঠা। প্রাণময়রূপী তাঁহাতে বিমুগ্ধ হইয়া আত্মপ্রাণ

সমর্পণ করা ও সজীব সত্তার প্রত্যক্ষানুভূতির নাম প্রাণপ্রতিষ্ঠা। ইহাই হৃদয়গ্রন্থিতে তাঁহাকে লাভ ও হৃদ্‌গ্রন্থিভেদ। আর রুদ্রগ্রন্থিতে বিশুদ্ধ নির্বিবশেষ জ্ঞানস্বরূপে ও জ্ঞানশক্তির নির্বিবশেষ আশ্রয়রূপে তাঁহাকে পাইয়া আপ্তকামত্ব লাভ—ইহাই মন্ত্রচৈতন্য। আর এইরূপ মন্ত্রচৈতন্য সংঘটিত হইলে তবে জীব যথার্থ সত্যলব্ধ জীবন্মুক্ত পুরুষ হয়—ইহাই প্রকৃত সত্যসম্ভূতি। রুদ্রগ্রন্থিভেদে কৈবল্যমুক্তি বা সাযুজ্য।

আমি সত্যসম্ভূতির প্রথম কথা—সত্যপ্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছি। এইবার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও মন্ত্রচৈতন্যের কথা বলিব। শুধু এইটুকু এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে, এই তিনটির অনুশীলন পরস্পর একান্ত সংজড়িত। অর্থাৎ একটি করিতে যাইলেই স্বল্লাধিক পরিমাণে সকলগুলিরই অনুশীলন হইতে থাকে। অথবা প্রত্যেকটির পক্ষে প্রত্যেকটি অল্পবিস্তর সহায়ক। তবে প্রধানতঃ সত্যপ্রতিষ্ঠার ফলস্বরূপই প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। আর প্রাণপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রচৈতন্যও হইতে থাকে; কিন্তু আবার অন্য দিকে সত্যপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রচৈতন্যেরও অনুশীলন হইতে থাকে। কিন্তু মন্ত্রচৈতন্যরূপ সংসিদ্ধি ও প্রকৃত প্রাণপ্রতিষ্ঠা—ইহারা সহানুগামী। প্রকৃত মন্ত্রচৈতন্য না হইলে প্রকৃত প্রাণের আবির্ভূতি হয় না। আবার প্রাণের আভাস না পাইলেও মন্ত্রচৈতন্যের অনুশীলন হয় না। সমগ্র সত্যপ্রতিষ্ঠা বস্তুতঃ যেন মন্ত্রচৈতন্যেরই সাধনা এবং প্রাণময়কে পাওয়াই যেন ফল।

এই যে মন, প্রাণ ও জ্ঞানগ্রন্থি, ইহার সম্যক্ অনুশীলনই সিদ্ধির একমাত্র উপায়। যে সম্প্রদায়ই হউক না কেন, যে পন্থাই জীব অবলম্বন করুক না কেন—জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সকলেই এই তিনটীর যে কোনটীর অনুশীলন করে। যাহারা বিচারমার্গ লইয়া অনুশীলন করে, তাহারা প্রধানতঃ মনের বা ব্রহ্মগ্রন্থির অনুশীলন করিতেছে ও সত্যলাভের প্রয়াস পাইতেছে বুঝিবে। যাহারা ভক্তিমার্গে অনুশীলন করে, তাহারা প্রাণগ্রন্থি বা বিষ্ণুগ্রন্থির অনুশীলন করিতেছে ও প্রাণ ধরিবার প্রয়াস পাইতেছে। যাহারা জপাদি প্রধান ভাবে সাধনা করে, তাহারা মন্ত্রচৈতন্যের অনুশীলন করিতেছে বুঝিবে। যাহারা নির্গুণ আত্মসত্তার ধ্যান ধারণা করে, তাহারা প্রধানতঃ মনগ্রন্থির অনুশীলনকারী, যাহারা সগুণমূর্ত্তির ধ্যান ধারণা করে, তাহারা প্রাণগ্রন্থির উপাসক, যাহারা মন্ত্রযোগের অনুশীলন করে, তাহারা রুদ্রগ্রন্থির উপাসক। কিন্তু এ তিনের এককালীন সংযোগ না হইলে যে সিদ্ধি হয় না, ইহা না জানায় সাধারণ সাধক-সকল বিফলকাম হয় ও তাঁহাকে জানা একান্ত দুরূহ ও অসম্ভব বলিয়া ধারণা করে। ভগবানকে ডাকা ও তাঁহার কৃপালাভ করা, এ যে কত বড় একটা লাভের—কত বড় একটা সার্থকতার অন্বেষণ, সেই ধারণাই সাধারণ মানুষ রাখে না। আর সে সার্থকতা যে কতটা আত্মোৎসর্গের ফলস্বরূপ আসে, তাহাও ভাবে না। সেই জন্যই সব করিয়াও তাহাদের কিছুই করা হয় না। আত্মোৎসর্গ বলিতে এই মন,

প্রাণ ও বাক্যের উৎসর্গই বুঝায়। যাহারা বিচার লইয়া ও সত্তায় ধ্যান ধারণা লইয়া মত্ত, তাহারা সে দিকে উৎকট প্রচেষ্টা করিলেও যেন কি একটা আবিষ্কার করিবার প্রয়াস পাইতেছে, এই ভাবেই চেষ্টা করে। বস্তুতঃ সে মনোময় প্রাণময় বাঙ্ময় একজনের কৃপান্বেষী অথবা তৎপ্রত্যক্ষীকরণে অগ্রসর, সুতরাং একটা প্রাণের বিপুল ভালবাসা, বিপুল প্রিয়ত্ববোধ যে আবশ্যক, হৃদয়ের বরণ ভিন্ন মাত্র মনের দ্বারা তিনি যে লভ্য নহেন—এ দিকে দেখে না। আবার যাহারা ভক্তিযোগে তাঁহার অন্বেষী, মনে যে প্রকার সত্যের ভিত্তি থাকিলে তবে সত্য সত্য প্রাণ স্বতঃ তাঁহাতে ঝাঁপাইয়া পড়ে, সত্যের সেরূপ সত্যধারণার অনুশীলন করে না। প্রাণের কোমল বৃত্তির উচ্ছ্বাস ও আবেগের একটা ক্ষণস্থায়ী গতি অনুভব করে, আবার পরক্ষণেই স্বীয় সাধারণ প্রকৃতিতে ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হয়। যাহারা মন্ত্র লইয়া থাকে, তাহারা মনোগ্রন্থিতেই বাক্যের আবর্ত্তন রচনা করিয়া তন্ময় হইবার প্রয়াস পায়; কিন্তু মন্ত্র, গুরু বা জ্ঞান এবং দেবতা বা প্রাণ, এ তিনের প্রকৃত অর্থ জানা না থাকায় ও তদনুসারে সাধনা না করায় মাত্র অক্ষর উচ্চারণেই তাহার পরিসমাপ্তি হয়। বাক্য, মন ও প্রাণ, ব্রহ্ম এই তিন অন্নসেবী, এ কথা তোমরা ভুলিও না। আর ভুলিও না যে, তিনিই এই তিন হইয়াছেন। মন দিয়া তাঁহাকে ধরিতে হয় সত্য, কিন্তু মাত্র মন দিয়া তাঁহাকে ধরা যায় না—মনই তিনি, এই ভাবে মন দিয়া মনোময়কে ধরিতে হয়। প্রাণ দিয়া

তাঁহাকে ধরিতে হয় সত্য, কিন্তু মাত্র প্রাণ দিয়া তাঁহাকে ধরা যায় না--প্রাণই তিনি, এই ভাবে প্রাণ দিয়া মনোময় প্রাণময়কে ধরিতে হয়। বাক্য দিয়া তাঁহাকে ধরিতে হয় সত্য, কিন্তু মাত্র বাক্য দিয়া তাঁহাকে ধরা যায় না—বাক্যই তিনি, এই ভাবে বাক্য দিয়া মনোময় প্রাণময় বাঙ্ময়কে ধরিতে হয়। জ্ঞানই তাঁহার স্বরূপ—সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান দিয়া সে জ্ঞানময়কে ধর। আত্মাই তাঁহার স্বরূপ—আত্মা দিয়া সে আত্মাকে ধর।

ভাল করিয়া ধারণা কর। অনুভূতির উপাদান, অনুভূতির ক্রিয়া ও অনুভূতির নামরূপ বা আকার প্রকার, এই তিনটীই যথাক্রমে বোধ বা জ্ঞানসংস্কার বা রুদ্রগ্রন্থি, অনুভব বা প্রাণক্রিয়া বা বিষ্ণুগ্রন্থি এবং মন ও ইন্দ্রিয় বা ব্রহ্মগ্রন্থি। সুতরাং অনুভূতির রূপান্তর ঘটাইতে হইলে এই তিনটী লইয়াই তোমায় সচেষ্ট হইতে হইবে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—যে কোন সম্প্রদায়গত যে কোন জাতিগত হও না কেন, যে কোন পন্থায় তাঁহাকে পাইতে প্রয়াস পাও না কেন, যেমন করিয়াই হউক--এই তিনটী অবলম্বন করিয়া তোমায় অভীষ্ট লাভ করিতে হইবে। এই অনুভূতি অবলম্বনেই জীবের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। যে জীব যে প্রকার অনুভূতিসম্পন্ন থাকে, পরমাত্মার বোধ শক্তি দিয়া গড়া এ ব্রহ্মাণ্ডের যে ক্ষেত্র সেই প্রকার অনুভূতির সমধর্ম্মী, সেই ক্ষেত্রেই সে জীবের গতি ও স্থিতি হয়। জল যখন উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পের আকার গ্রহণ করে, তখন আকাশস্থিত বায়ুস্তর যেখানে যেমন উত্তপ্ত, সেখানে সেই প্রকারের উত্তাপের বাষ্প

উত্থিত হইয়া অবস্থান করে। ঠিক তেমনই জীব আপনার অনুভূতির অবস্থানুসারে পরমাত্মার বিশ্বক্ষেত্রে গতিলাভ করে। এই নিয়ম লক্ষ্য করিয়াই "যাদৃশী সাধনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" কথাটা বলা হয়। তবেই দেখ, সাধনা বা কর্ম্ম শুধু অনুভূতির তারতম্য ঘটাইবার জন্য এবং অনুভূতি-ক্ষেত্র যে পরিমাণে আত্মমুখী করিতে পারিবে, সেই পরিমাণেই তোমার আত্মাভিমুখী গতিলাভ হইবে, ইহা স্থির। সেই জন্য সাধন-ভজনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, এই অনুভূতির পরিবর্ত্তনসাধন। আর সেই অনুভূতির পরিবর্ত্তন সংসাধন করিতে অনুভূতির ঐ তিন অংশের সাহায্য লইতে হয়। প্রথম অংশ বা অনুভূতির উপাদান জ্ঞান বা বোধ—তাহার আর পরিবর্ত্তন হয় না; তিনি অপরিণামী। কিন্তু তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার ক্রিয়াশক্তি ও তজ্জাত সে ক্রিয়ায় সংস্কারাদির আকার প্রকার বা নামরূপ পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। সেই বোধস্বরূপ এবং বোধশক্তিসম্পন্ন তোমার আত্মাকে সেই জন্য মন ও প্রাণের সাহায্যে গ্রহণ কর। আর আত্মাকে মন ও প্রাণের সাহায্যে অবলম্বন সম্যক্‌ভাবে করিতে তোমার জ্ঞানে, প্রাণে ও মনে যে বাক্য অবস্থিত, সেই বাক্য অবলম্বন কর। এইরূপে বাক্, মন ও প্রাণের সাহায্যে বাঙ্ময়, মনোময় ও প্রাণময় আত্মাকে জানিয়া ধন্য হও।

মনে ও বাহ্য জগতে সত্য-প্রতিষ্ঠা; অন্তরে বা প্রাণেও সেই বাহ্য জগৎকে প্রাণময়, অন্তরময় বলিয়া অনুভব করিতে করিতে অন্তর্ব্বাহ্য এক করিয়া প্রাণবোধে অনুভব করা প্রাণে প্রাণ-

প্রতিষ্ঠা ; আর মন-প্রাণের কারণস্বরূপ, বিশ্বের কারণস্বরূপ চিৎশক্তিসম্পন্ন চেতনে বাক্য সাহায্যে বিরাজ বা ইচ্ছামত আত্মাকে ও তাঁহার মহিমাকে ভোগ করা মন্ত্রচৈতন্য।

সাধনা করিতে করিতে লোকের যে সময়ে সময়ে সারূপ্য-বোধ হয় বা ক্ষণিক সমাধি হয়, সেইরূপ একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। মনে কর, তুমি "মা" "মা" করিয়া কোন দেবীমূর্ত্তি স্মরণ করিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছ। তুমি "মা" বলিতে বুঝিতেছ কালী বা দুর্গা। হয় ত তুমি অজ্ঞ ; দেবী সম্বন্ধে অন্য কিছু জ্ঞান তোমার নাই—শুধু সাধারণতঃ শাস্ত্রবর্ণিত রূপটীই তোমার জানা আছে। তুমি যত "মা" "মা" বলিতেছ ততই তোমার সেই মূর্ত্তি যে সত্য-মূর্ত্তি, ইহা তোমার মনে ফুটিয়া উঠিতেছে, বুদ্ধি নিশ্চয় করিয়া সেটি ধরিয়াছে, দেবীর সত্য-মূর্ত্তি এরূপ—ইহা সে তোমায় জানাইতেছে। তোমার অহং অভিমান বা তুমি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছ, তোমার মন পূর্ণ সঙ্কল্পে সেইটি লাভ করিতে হইবে বলিতেছে। এইরূপ সকল মনোবৃত্তির একাগ্রতা সে মূর্ত্তিতে তোমার সত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া দিতেছে, সুতরাং তাঁহাকে পাইলে বা তাঁহার আবির্ভাবে তোমার প্রাণের যে উদ্বেলন হওয়া সম্ভব, তাহা হইতেছে, তোমার অনুভূতি-ক্রিয়া পূর্ণ প্রাণময় হইয়া যাইতেছে। সহসা তোমার নিজ সত্তাবোধ লোপ হইয়া গেল, অর্থাৎ তোমার রুদ্রগ্রন্থিস্থ চিৎশক্তি—যিনি প্রাণ বা অনুভূতি আকারে ও বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ইত্যাদি আকারে ক্রিয়া করিতেছিলেন, সেই চিৎশক্তি সমস্ত

বৃত্তি প্রচ্ছন্ন করিয়া, মাত্র সেই দেবীভাব গ্রহণ করিলেন। ইহাই তোমার দেবী-মূর্ত্তিতে সমাধি। আর ইহা ঘটিল—বাক্য, মন ও প্রাণের দ্বারা অথবা মন্ত্রচৈতন্যের দ্বারা। তোমার সত্য-জ্ঞান ছিল বলিয়া সে দেবী-মূর্ত্তি ধারণায় তোমার প্রাণ বিভোর হইল এবং তোমার চেতনা সেই "মা" বাক্য অনুযায়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিল।

তবেই দেখ, সাধনা করিবার সময় বুঝিবে, তোমার মূলধন-স্বরূপ আছে শুধু বাক্য, মন আর প্রাণ। কি অন্তরে, কি বাহিরে, এই বাক্য, মন ও প্রাণ ভিন্ন কিছু নাই। এই তিনের সাহায্যে তোমার চেতনাকে যদৃচ্ছ আকারে সাকারা করিতে হইবে। সাধনার সময় বিশেষ করিয়া ধারণা করিবে, একমাত্র চেতনস্বরূপ আত্মা আছেন, আর আছে—তাঁহার শক্তি-প্রকাশ বাক্, মন ও প্রাণ। আর কিছু নাই। সেই বাক্য, সেই মন, সেই প্রাণ, শুধু সেই সত্যস্বরূপ, প্রাণস্বরূপ, চেতনস্বরূপ আত্মা-কেই বেড়িয়া বেড়িয়া জড়াইয়া ধরিতেছে, তাহাকেই আলিঙ্গন করিতেছে, তন্ময় হইয়া যাইতেছে। আর কিছু নাই—কেহ নাই। এরূপ করিতে পারিলে তবে তিনি তোমার নিবেদিত ওই তিন অন্ন গ্রহণ করিয়া, তোমায় আত্মপ্রসাদ দান করিবেন।

বিষ্ণুগ্রন্থি

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

ঋতম্ভরা

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

প্রাণ ও প্রাণের মূর্ত্তি

সত্য-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ প্রাণের কুমার! তুমি কি প্রাণকে চাহ? মরণের তরঙ্গাভিঘাত পদে ঠেলিয়া, তুমি কি সঞ্জীবিত হইতে চাহ? বিরামহীন কর্ম্মের এ সমরাঙ্গনে বীর তুমি, কাহার জন্য বিন্দু বিন্দু করিয়া তোমার সমস্ত শোণিত ঢালিয়া, এ ধূলির ক্ষেত্রকে সিঞ্চিত করিতেছ? কর্ম্মক্লান্তির অবসাদে, বারবার মূর্চ্ছামোহে ঢলিয়া পড়িয়া, আবার কিসের আশায় ধূলিলুণ্ঠিত বপু ঋজু করিয়া, টলিতে টলিতে সহস্র অসির উদ্যত আঘাতে বুক পাতিয়া দিতে দাঁড়াইয়া উঠিতেছ? সর্ব্বাঙ্গে রুধির-স্রাবী ক্ষত, কণ্ঠে তপ্তমরুর তৃষা, কৃচ্ছ্রসাধ্য শ্বাস, কম্পিত কলেবর বিঘূর্ণিত শির, তবু বীর, তোমার দীপ্তিহীন নয়নে কাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল চাহনি, কাহাকে পাইবার অনিমেষ অপেক্ষা, কাহার বক্ষে তোমার শেষ শ্বাসটি মিলাইয়া অনন্ত কালের জন্য লুটাইয়া পড়িতে; শেষ অশ্রুবিন্দুটি ঢালিয়া তোমার সকল কথা অব্যক্ত ভাষায় ব্যক্ত করিতে তুমি মূর্চ্ছার মাঝেও জাগ্রত, প্রভঞ্জনের মাঝেও স্থির, মৃত্যুর মাঝেও জীবিত, কর্ম্মের মাঝেও

অবিচল, শক্তিহীন হইয়াও শক্তিমান্, ভীতির মাঝেও ভী[illegible], নিশ্চেষ্টতার মাঝেও কর্ম্মময়, মিথ্যার মাঝেও সত্যদর্শী, কুহেলীর মাঝেও ধ্রুবলক্ষ্য? অজ্ঞানের অসংলগ্ন পদক্ষেপে কোন্ যাদুকরীর মোহ-মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া, তুমি পর্ব্বতের পর পর্ব্বত অতিক্রম করিতেছ ? ক্লান্ত তনু টানিতে টানিতে তুমি বিজয়ের পর বিজয় লাভ করিতে পরাজয়ের পর পরাজয় সহ্য করিতেছ ? সে কি তোমার প্রাণ ? সত্য-সাধকের সত্য-প্রাণ ?

কে সে প্রাণ গা ? যাহাকে জান না, অথচ ত্যাগ করিতে চাহ না ? যাহাকে দেখ নাই, অথচ হারাইবার ভয়ে সদা সচকিত, শঙ্কা-শিহরিত ? যাহাকে আপনার করিয়া রাখিতে তুমি তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস হইতে সুষুপ্তি অবধি কর্ম্মের অনন্ত অধ্যবসায় বিস্তার করিয়া অহর্নিশ কর্ম্মময়। যাহার মুখের পরিতৃপ্তির হাসিটুকু দেখিতে তুমি এ রণক্ষেত্রে অস্ত্রাহত, জর্জ্জরিত, নিষ্পিষ্ট, দুর্ব্বহ ভারাক্রান্ত ! জীবনের পর জীবন যাহার প্রেরণায় কত রূপে কত কর্ত্তব্যের বোঝা বহিতেছ, কত লাঞ্ছনা সহ্য করিতেছ ! যুগের পর যুগ যাহাকে সেবা করিতে দেশ হইতে দেশান্তরে সহস্র ঝঞ্ঝাবাত উপেক্ষা করিয়া ছুটিতেছ আর চাহিতেছ, চাহিতেছ আর ছুটিতেছ, যুঝিতেছ আর প্রহরা দিতেছ—সে প্রাণ কে ? যাহার অধরে হাসির জ্যোৎস্নাটুকু ফুটাইতে তুমি জগতের কত ধূলিকণাকে জয় করিয়াছ, আপনার করিয়াছ, হৃদয়ে তুলিয়া লইয়াছ, আবার তাহারই অতৃপ্তিতে হৃদয় হইতে সে ধূলির পুতলী দূরে নিক্ষেপ করিয়া, নূতন ধূলি

গ্রহণ করিয়াছ! মাতা, পিতা, স্ত্রীপুত্র, আত্মীয় স্বজন বলিয়া কাহাকে আদর করিতে তুমি পথের সাথীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়াছিলে, অবার কাহাকে আদর করিতে তুমি সেই মাতা, পিতা, ভ্রাতা, স্ত্রী-পুত্র, স্বামী বলিয়া বুকে-জড়ান সাথীগুলিকে বিষবৎ বর্জ্জন করিতে বৈরাগ্যের শূন্যময় পথে কক্ষচ্যুত গ্রহের মত ছুটিয়াছিলে? সেই তোমার প্রাণ! সে প্রাণ কে গা?

সেই প্রাণই তোমার আত্মা—সেই প্রাণই বিশ্বের আত্মা। আত্মার প্রাণরূপী মূর্ত্তির তৃপ্তির জন্যই তোমার এ সমরোল্লাস, এ রক্তস্রাব, এ পেষণ এ জ্বালা, এ হাহাকার, আর্ত্তনাদ! ইহারই সেবা তুমি যুগযুগান্তর করিতেছ, ইহারই কাছে তুমি ইহারই অভাব মর্ম্মের রক্তে লিখিয়া লিখিয়া জানাইয়া আসিতেছ—ইহারই বুকে ইহারই বিরহের তপ্তশ্বাস তুমি জন্মের পর জন্ম ফেলিয়া আসিতেছে। ইহাকে লাভ করিবার জন্যই, ইহাকে ধরিতে ও ধরিয়া রাখিতে তুমি সদা সচকিত; একটী পত্রের মর্ম্মরে, একটী কণ্টকের ক্ষীণ বেদনে তুমি চমকিত সন্ত্রস্ত হইয়া ওঠ—বুঝি ইহার পায়ে ব্যথা বাজে, বুঝি ইহাকে হারাই! অথচ জান না, বস্তুতঃ কাহাকে হারাইবার ভয়ে তুমি শঙ্কিত, কাহাকে ব্যথা লাগিবার ভয়ে তুমি আপনার বুকে গুপ্তকুটীর রচনা করিয়া রাখিয়াছ—যত্নে ও সেবায় ক্রীতদাসের মত তৎপর রহিয়াছ! সবই সত্য, শুধু জান না, কাহাকে তোমার এ অনাবিল ভালবাসা ঢালিতেছ। অন্যকে সেই আপনার ধন

ভাবিয়া—যাহাকে বাহক করিয়া তোমার এ ভালবাসার পুষ্পাঞ্জলি পাঠাইতেছ, সে-ই তোমার সে প্রাণের প্রাণ, তোমার সকল ভালবাসার অধিকারী ও গুপ্তভোক্তা, এইটুকু শুধু জান না। যতক্ষণ না জান, ততক্ষণ এ কর্ম্মাবন্ধন।

এই প্রাণই সাক্ষাৎ আত্মা। ইনিই সর্ব্বান্তর প্রত্যক্ষ আত্মা নামে অভিহিত। ওই যিনি রহিয়াছেন বলিয়া তুমি আপনাকে জীবিত বলিয়া বোধ কর, যিনি পাছে চলিয়া যান বলিয়া সর্ব্বদা তুমি ভীত, সর্ব্বদা সেবাপরায়ণ, যাহার হাসি দেখিতে তুমি তোমার প্রিয়জনের হাসিটুকুর জন্য অধীর, যাহার তুল্য জ্ঞান করিয়া তুমি আত্মীয় স্বজনে মমতাময়। ইনিই দ্রষ্টা, মন্তা, বোদ্ধা, শ্রোতা, রসয়িতা, জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার অনুভূতি-চাঞ্চল্য-ময়ী—লীলাময়ী মূর্ত্তি।

পরমাত্মার স্পন্দনময় বা শক্তিময় মূর্ত্তির নাম প্রাণ। বোধ বা জ্ঞানস্বরূপ আত্মা যখন কর্ম্মময় হয়েন অর্থাৎ যখন তিনি স্বীয় সত্তায় সে সত্তার সনাতনত্ব বা নিত্য অবস্থান এবং সে অবস্থানের সুখ বা আনন্দস্বরূপতা ও প্রীতিময়ত্ব বিশেষভাবে বোধ করেন, তখনই তিনি প্রাণ নামে অভিহিত হয়েন। সনাতনত্ব অর্থাৎ আমি "নিত্য আছি", এই যে কালজ্ঞান, ইহাই জীবনরূপে জীবে উপলব্ধ হয় এবং সে সত্তার যে সুখময়ত্ব, তাহাই প্রীতি ভালবাসা ইত্যাদি আকারে প্রতিফলিত বা স্থাপিত হয়। ইহাই আত্মধর্ম্ম। সুতরাং প্রাণকে তোমরা দুই রূপে দেখিতে পাও,—জীবনরূপে ও বেদনময় হৃদয়রূপে। আয়ু বা জীবন, ইহা প্রাণের

একটি স্থিতি এবং সুখ, আনন্দ, প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা প্রভৃতি বেদনময়, হৃদয়-ব্যবহারময় হৃদ্গ্রন্থি তাহার অন্য মূর্ত্তি। জীবনরূপী হইয়া মুখ্য প্রাণ, প্রাণ-অপানাদি-বিভক্ত পঞ্চপ্রাণরূপে শরীর পরিচালন করেন এবং অন্তঃকরণরূপে উদ্বেলনময় হইয়া জীবকে তাহার আত্মীয়তার বা আত্মধর্ম্মের সার্থকতা প্রদান করেন। এই হৃদয়েই আমরা পরকে আপন করিয়া লইতে লালায়িত, পরকে প্রাণ দিয়া আমরা প্রাণময় হই, প্রাণের আস্বাদ অনুভব করি। ভালবাসাই এ প্রাণের মূর্ত্তি। ওরে, এ সংসার কারাগার নয়—মরীচিকা নয়, কোন অপরাধের দণ্ড ভোগ করিতে এখানে তোকে তোর প্রাণের প্রাণ পাঠায় নাই! তোরা পদদলিত কর ও সব প্রাণহীন তামসিক যুক্তি। এখানে আসিয়াছিস্ প্রাণের সেবা করিতে, প্রাণের আদান-প্রদান করিয়া প্রাণকে চিনিতে, জানিতে, মানিতে, প্রাণ দিয়া প্রাণকে অধিকার করিতে। প্রাণের মমতা স্ফুরণ করিয়া, সর্ব্বত্র তাকে প্রসারিত করিয়া, সকলকে আপনার করিয়া, প্রিয় করিবার যে সাধারণ বৃত্তি তোরা অনুভব করিস্, স্বীয় স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজনকে যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বোধ করিস্, এ শুধু নিজের প্রাণকে বিস্তৃত করিয়া ধরিয়া, প্রাণেরই মধুময়ত্ব ভোগ করিবার জন্য। এ তুই পরকে ভালবাসিতেছিস্ না, আপনার প্রাণকে অন্যত্র আরোপ করিয়া ভালবাসিতেছিস্। প্রাণের প্রাণ, যিনি সর্ব্বজীবের—সর্ব্বভূতের প্রাণময় আত্মা, যিনি তোর প্রাণ, তোর আত্মাও তিনিই। অচিদ্বোধ বা

অচেতন জগৎদর্শনজনিত খণ্ডবোধে জীব আপনাকে অন্য হইতে স্বতন্ত্র দেখে, কিন্তু বস্তুত: সকল প্রাণ এক মহাপ্রাণের স্ফুলিঙ্গ বলিয়া, এক প্রাণ অন্য প্রাণকে পাইবার জন্য, আপন করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হয়। ইহাই আত্মার প্রাণমূর্ত্তির বা পরমেশ্বরত্বের অন্যতম ধর্ম্ম ;—এক করিয়া লওয়া, সংহত করিয়া সর্ব্বতোভাবে এক হইয়া যাওয়া, ইহাই তাঁহার অন্যতম মহিমা। সেই মহিমার প্রেরণাতেই আমরা স্ত্রীপুত্রকে ভালবাসি, মোহে নহে। মোহ উহার অপব্যবহারের ফল। ওই ভালবাসা যত স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, যত প্রসারিত হইয়া, মোহ-জনিত সংকীর্ণতা অপসৃত করিয়া, উদার হইয়া, মাত্র আপনার শরীরের উপর না থাকিয়া স্ত্রীপুত্রে, আত্মীয়ে, পল্লীময়, দেশময়, সর্ব্বজীবে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, ততই প্রাণের বিপুলত্ব প্রকাশ হয় এবং সদ্‌গুরুর কৃপালাভে অধিকারী হয়। আবার তার সেই প্রাণদান-যজ্ঞে স্থলে স্থলে অন্যের স্বার্থে আবদ্ধ হইয়া, প্রতিহত হইয়া, লাঞ্ছিত হইয়া সে কাঁদিয়া উঠে। কে আছ স্বার্থহীন প্রাণ! কে আমার এ নিঃস্বার্থ প্রাণের দান গ্রহণ করিবে? কে আছ, যে মাত্র স্বার্থ পূরণের আশায় ক্ষণেকের জন্য গ্রহণ করিয়া, আবার স্বার্থ ফুরাইলে আমার প্রাণকে প্রত্যাখ্যান করিবে না? কে আছ, একবার আমার প্রাণকে হৃদয়ে গ্রহণ করিলে আর যুগ যুগান্তেও শত অপরাধেও দূরে ঠেলিবে না? এই ক্রন্দন—এই প্রাণের জন্য প্রাণের পিপাসাই হয় তার দীক্ষা। সেই দীক্ষার

ফলে-সে মহাপ্রাণে প্রাণ দান করিয়া প্রাণময় হয় ; সে আপনার ভিতরেই সে প্রাণের সন্ধান পায় এবং দেখে, যাহাকে জগৎময় বিলাইয়া দিয়া আবার যাহার জন্য কাঁদিয়াছে, সেই সে প্রাণ। প্রাণ আপনার জন্য আপনি কাঁদে, আর এই জ্ঞানেই সে কান্নার শেষ হয়। সুতরাং মোহের অন্ধকারে দণ্ড দিতে কেহ তোমায় পাঠায় নাই। মোহ দূর করিয়া, প্রাণের আদান প্রদান করিয়া, প্রাণের ধর্ম্ম ফুটাইয়া তুলিতে এখানে আসিয়াছ। মহাপ্রাণের গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য তুমি আপন প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করিতেছ—স্ত্রীপুত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া। তোমার এই প্রাণের সেবা মহাপ্রাণেরই সেবা হইতেছে—এই কথা যে দিন জানিবে, প্রাণ খুলিবে, যে দিন হৃদয়ের মাঝে প্রাণকে খুঁজিয়া পাইবে, সেই দিন দেখিবে, তুমি অদ্যাবধি অন্য কাহাকেও প্রাণ-দান কর নাই, অন্য কাহাকেও প্রাণদিয়া ভালবাস নাই, তোমার —তোমার প্রাণকেই প্রাণ দিয়াছ, ভালবাসিয়াছ, সেবা করিয়াছ ; এতদিন জানিতে না ; আজ শুধু জানিলে যে, তোমার প্রাণদান কোথাও ব্যর্থ হয় নাই। স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা, এ সকল তোমার প্রাণেরই প্রেমময় মূর্ত্তি-বৈচিত্র। আর সে প্রাণদান আত্মরতি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ওরে! প্রাণ ভিন্ন অন্য কেহ প্রাণের ভোক্তা নাই।

যাহা হউক, প্রাণের দুই মূর্ত্তির কথা বলিতেছিলাম—জীবন-মূর্ত্তি ও হৃদয়মূর্ত্তি। এই উভয়েই এক, শুধু প্রকাশের তারতম্য। পরমাত্মা মহাপ্রাণ বা পুরমেশ্বররূপে যেরূপ সৃষ্টি করেন, আর

তাহা ভোগ করিতে তাহাতে অনুপ্রবেশ করেন, ব্যষ্টিক্ষেত্রে প্রাণরূপী হইয়া, তিনি আবার তদ্রূপই ব্যষ্টিকে জীবিত রাখেন ও সেই সত্তার বিশেষত্বটুকুতে মমত্বময় হইয়া তাহা সম্ভোগ করেন, সেই বিশেষত্বে মুগ্ধ থাকেন। এই যে জীবন-সত্তা, যাহা আছে বলিয়া আপনাকে জীবিত জান, জ্ঞানস্বরূপ আত্মার ইহাই জীবন্মুর্ত্তি। আর যে হৃদয়ধর্ম্মের কথা পূর্ব্বে বলিলাম, উহাই তাঁহার আত্মীয়তাময়, অনুভূতিময় মোহন-মূর্ত্তি। বোধশক্তি সম্পন্ন আত্মার এই উভয়বিধ প্রাণ-প্রকাশ। হৃদয় অনুভূতিময় বলিয়া সকল উপলব্ধির অন্তরস্থ বেদনটুকু বলিতেছি। বেদনের পরিচয় বা নাম ও তজ্জনিত সঙ্কল্পাদি—সে সমস্ত চিত্ত। চিত্তই ব্রহ্মা এবং বেদনের উপর তাহা জাগ্রত হয়। সেই মুখ্য বেদনাক্রিয়ারূপে প্রকাশই প্রাণপ্রকাশ—প্রাণের জাগরণ। বস্তুতঃ একটু বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবে যে, জ্ঞানস্বরূপ তোমার চেতনাশক্তিই তোমার জীবনময় হওয়া ও বেদনময় হওয়া, এই দুইরূপে প্রকাশ পায়; এবং তাহার উপর ফোটে তোমার নামরূপাত্মক বুদ্ধি এবং মানস ব্যাপার ও প্রাণধারণার্থ শ্বাসপ্রশ্বাসাদি প্রাণনক্রিয়া ও অপান প্রভৃতি বায়ুক্রিয়া। জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার প্রাণময় হওয়াই পরমেশ্বরত্ব;—এ বিশ্বসৃষ্টি প্রাণের; এই জীবনত্বের বিকাশ আর প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থে বেদনময় হওয়া, ইহাই তাঁহার ব্যষ্টি অনুপ্রবেশ বা হৃদয়ময় জীবত্ব।

তুমি যে জগৎ ও আপনার শরীরাদি দেখিতেছ, সেই নাম-

রূপময় প্রকাশটি হইল সত্ত্বের প্রকাশ। আর যে বেদনরূপ প্রাণকর্ম্মের উপর উহা উদ্ভাসিত হয়, তিনিই বিষ্ণু বা প্রাণ। জীবের ওই বেদনময় সত্তাকে বলে বিষ্ণুগ্রন্থি বা প্রাণগ্রন্থি। এই প্রাণগ্রন্থি পরিজ্ঞাত হওয়া ও বিষ্ণুক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হওয়া এক কথা। কেন না, পূর্ব্বে বলিয়াছি, অনুভূতি যে আকারের হইবে, বিরাট ক্ষেত্রে জীব তদনুরূপ ক্ষেত্রেই চালিত ও প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর এই বিষ্ণুগ্রন্থিতে প্রবেশ করিতে হইলে বা ইহাকে ধরিতে হইলে অনুভূতির নামরূপ বা শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস, গন্ধ ও সুখ-দুঃখ, প্রীতি ভালবাসা আদি আকার প্রকার অবলম্বনেই জানিতে বা ধরিতে হইবে। শ্রুতিও সেই জন্য বলিয়াছেন,—"প্রতিবোধবিদিতং মতং অমৃতত্বং হি বিন্দতে।" প্রতিবোধের সাহায্যে তাঁহাকে বিদিত হওয়া, ইহাই প্রকৃষ্ট সিদ্ধান্ত এবং এই উপায়েই জীব অমৃতত্ব বা চেতনরূপী আত্মাকে লাভ করিতে পারে।

প্রাণবিজ্ঞান

এই উভয়মূর্ত্তি প্রাণ—যাঁহাকে লইয়াই অহর্নিশ জীবজ্ঞানে বা অজ্ঞানে মত্ত থাকে, ইঁহার উৎপত্তি, আয়তি, স্থান, বিভুত্ব ও প্রত্যেক জীবে ইঁহার কর্ত্তৃত্বাদি বা ক্রিয়াদি জানিতে পারিলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে, ইহাই শ্রুতির উপদেশ।—

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা।
অধ্যাত্মঞ্চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে॥

শ্রুতি বলেন, এই প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, মন, কর্ম্ম, প্রভৃতি সমস্ত সৃষ্ট হয়। শ্রুতির এই কথায় তোমরা স্পষ্ট বুঝিতে পার যে, আত্মার শক্তিময় লীলাময়, অনুভূতিময়, কর্ম্মময় বিকাশই প্রাণ। এক দিকে শ্রদ্ধাদি হৃদয়বৃত্তিরূপে ও অন্য দিকে পঞ্চ তন্মাত্রা ও পঞ্চ মহাভূত রূপে পরমাত্মার যে জগৎপ্রকাশ ও জগদনুভূতি, ইহাই পরমাত্মার প্রাণরূপ প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি। প্রাণই বিশ্বের বিধারক ও হৃদয়বৃত্তি বা অনুভূতি-ক্রিয়ারূপে সে বিশ্বের ভোক্তা। এই বিরাট্ বিশ্ব পরমাত্মার প্রাণযজ্ঞ। জীবের জীবন ধারণ ও ভোগ উহাও এই প্রাণযজ্ঞ।

ভাল করিয়া ধারণা কর—মনে কর, এক জ্ঞানময় সত্তা ভিন্ন অন্য কেহ বা কিছু নাই। সেই চিন্ময় ও চেতনশক্তি-সম্পন্ন জ্ঞানমূর্ত্তি বিশ্বরূপীয় চেতনার বৈচিত্র্য বোধ বা অনুভব

করিলেন ও সেই বোধ করাই হইল তাঁহার চেতনশক্তির লীলা বা প্রাণমূর্ত্তি। তিনি আপনাতে যখন বিমুগ্ধ থাকেন, তখন অরূপ, নিষ্কল, শান্ত, নির্ব্বেদ, আর আপনার সেই মুগ্ধতাকে ছড়াইয়া—বিশ্লেষিত করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে যখন ঈক্ষণ করেন, তখনই তিনি প্রাণময় পরমেশ্বর। তিনি আপনার মহিমায় বিশেষ-ভাবে মুগ্ধ হইয়া, সেগুলিকে বোধ করেন, সেই বোধ করার নামই হওয়া। এ প্রাণলীলা—মোহিনীলীলা। শুধু প্রাণের, শুধু মুগ্ধতার, শুধু প্রেমের, আত্মায়তার বা আত্মভাবের বাহ্য বিকাশে এ জগদ্দর্শন অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বিশ্ব বোধ করিলেন অর্থই বিশ্ব হইলেন এবং সাক্ষি-স্বরূপ অবস্থান করিতে লাগিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন—ইহাই জীবত্ব অর্থাৎ জীবরূপে সে বিশ্বমূর্ত্তি অনুভব করা। এই দুই ভাবই ভূতি ও অনুভূতি বা ভবসংসার ও অনুভব সংসার। মহান ঈশ্বর এক দিকে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চ তন্মাত্রা-মূর্ত্তি গ্রহণ ও তাহা আবার স্থূল পঞ্চ মহাভূতরূপে প্রকাশ করিলেন ও অন্য দিকে সেই পরমেশ্বরের বিরাট্ অহং-বুদ্ধিতে তৈয়ারি হইল মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি। তিনি যখন বলেন, আমি বহু হইব, তখনই সেই বিরাট বিজ্ঞানময় আত্মা এইরূপে প্রাণময় হইয়া আপনাকে প্রকাশ করেন। সেই বিজ্ঞানময় পরমেশ্বর প্রাজ্ঞ পুরুষ ভালবাসাময়, প্রীতিময়, হৃদয়ময় হইয়া এইরূপে প্রাণময় হয়েন এবং তাঁহার নাম হয় প্রাণ, বিষ্ণু, হৃদয়, অন্তরাকাশ। জীবে এই হৃদয়ই জীবাত্মা নামে খ্যাত, হৃদয়গ্রন্থিই ইহার বিশেষ

ক্ষেত্র। হৃদয়গ্রন্থি বলিতে কি বুঝায়? তোমার জীবন ও তাহা বেষ্টন করিয়া যে মমতা প্রভৃতি তোমাতে সর্ব্বদা অনুভব কর, এইটি হৃদয়গ্রন্থি। সুখের সময় যাহা উদ্বেলিত হইয়া স্ফীত হইয়া উঠে, দুঃখের সময় যাহা সঙ্কুচিত হইয়া যায় বলিয়া তুমি আপনার ভিতর অনুভব কর, উহাই হৃদয়গ্রন্থি। প্রত্যেক অনুভূতি তোমার জীবন-সত্ত্বাকেই যে আলোড়িত করিতেছে, ইহা একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পার। জীবিত থাকা ও বোধ করা, এই দুইটি ভাব লক্ষ্য করিলেই তুমি তোমার প্রাণ-সত্ত্বার আভাস পাইবে। এই প্রাণগ্রন্থি পূর্ণ মমত্বময় গ্রন্থি। ইহাকে অবলম্বন করিয়া জীবের খণ্ড অহঙ্কার, বুদ্ধি, চিত্ত, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ক্রিয়াশীল থাকে,—যাহাকে আমরা ব্রহ্মগ্রন্থি বলি এবং বিরাটে যাঁহাকে ব্রহ্মা বলা হয়। আর ইহাকেই আমরা সেই ব্রহ্মগ্রন্থির প্রকাশগুলিতে একান্ত আত্মীয়তাময় হইয়া থাকিতে দেখিতে পাই। পিতা মাতা প্রভৃতিতে যে আত্মীয়বোধ, উহাই প্রাণের বা হৃদয়ের সাক্ষাৎ বাহ্য প্রকাশ। এই প্রাণমূর্ত্তির উৎপত্তি চেতনস্বরূপ আত্মায় ও ইহাই তাঁহার চেতন-শক্তি বা চেতন-বিলাস। এই চেতন-বিলাসকেই প্রত্যক্ষ আত্মা ভাবিয়া দর্শন করিলেই হৃদয়-গ্রন্থি মুক্ত হইয়া হৃদয়ের বা পরমেশ্বরের প্রকাশ হয় অর্থাৎ এইখানে অধিকার আসিলেই জীব তত্ত্বক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করে। আমার সেই স্বপ্ন দর্শনের উদাহরণটী এখানে স্মরণ কর। স্বপ্নকালে যেমন শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি যাহা কিছু

পাও, সে তোমার অন্তরেই পাও এবং তাহা হইতে বুঝিতে পার যে, বস্তুতঃ অন্তরেই সে সমস্ত রহিয়াছে; জাগ্রত অবস্থাতেও সে সকল সেইখানেই পাও; কিন্তু মনে কর বাহিরে পাইতেছ। যা'ক, স্বপ্নের সময় যেমন সমস্ত লাভ অন্তরেই ঘটে, যদি জাগ্রত অবস্থায় সজ্ঞানে কোনরূপে স্বপ্নকালের মত সেই সকল অন্তরেই লাভ করিতে পার, তবেই বুঝিবে, তুমি তত্বক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতেছ। ওই পরমেশ্বর-ক্ষেত্র বা হৃদ্‌গ্রন্থির আশ্রয় হৃদয়। তোমার বাহিরে যে জগৎ দেখ, তোমার অন্তরেও ওইরূপ জগৎ বিদ্যমান—তোমার বাহিরে যে আকাশ দেখ, তোমার অন্তরেও ওইরূপ আকাশ বর্ত্তমান। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, যাহা কিছু বাহিরে রহিয়াছে, সেই সমস্তই অন্তরেও রহিয়াছে; আর বাহিরের জগৎ তোমার সেই অন্তরের জগৎকে ফুটাইয়া তোমায় দেখাইয়া দিতেছে; সুতরাং এই যে সর্ব্বতত্ত্বময়, প্রাণময় ঈশ্বর, ইনি আত্মারই সগুণ মূর্ত্তি এবং ইনিই আত্মাতেই অবস্থিত। আর ইহাতেই হৃদ্‌গ্রন্থিময় জীবত্বও অবস্থিত।

তুমি যে জীবিত রহিয়াছ বলিয়া আপনাকে মনে কর, এই যে জীবন, ইহা এবং তাহাতে যে মমতাময় হইয়া ক্রিয়াশীল থাক, সেই মমতাচাঞ্চল্য—যাহা তোমার সকল প্রকার ব্যবহারের মূল কারণ—এই দুই ভাবই আত্মাতেই জাত; আর এই প্রাণের স্থান যে হৃদয়, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

মন বা চিত্তই প্রাণের আয়তন। নামরূপময় যাহা কিছু মূর্ত্তি তোমার মন গ্রহণ করে এবং তদনুসারে ক্রিয়াময় হয়, ইহা

প্রাণেরই আয়তনের যেন সীমারেখা, বিকাশ-সীমা। প্রাণ-ক্রিয়ার নাম-রূপাত্মক বিকাশই ব্রহ্মগ্রন্থি বা মন, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং চিত্তের ওই প্রকাশগুলি বস্তুতঃ প্রাণের লীলার যেন বাহ্য স্তর। যেমন রক্তস্রোতের বেগ কত প্রবল, তাহা নাড়ীর স্পন্দনের মাত্রা দেখিয়া বোঝা যায়, তেমনই প্রাণের গতি মনাদির আকারে প্রকাশ পায়: অথবা বায়ু কি ভাবে বহিতেছে, তাহা যেমন উড্ডীয়মান ধূলিতৃণের গতি দ্বারা হৃদয়ঙ্গম হয়, ইহাও তদ্রূপ। সুতরাং চিত্তই প্রাণের আয়তি বা ব্যাপ্তি। নদীর জল প্রবাহময়, কিন্তু সেই অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ যেমন একটা বিস্তৃতি বা আয়তন ফুটাইয়া রাখে, চিত্ত বা মন প্রাণের সেইরূপ আয়তন; আর এই চিত্ত অবলম্বন করিয়াই জীবের লোক-লোকান্তরে যাতায়াত হয়।

আর এই প্রাণ আছে বলিয়া আমার যত কিছু অন্তরের ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় এবং এই সকল ক্রিয়া প্রকাশ করিতে যে তেজ বা শক্তি ক্রিয়াশীল রহিয়াছে, সেই ক্রিয়া-বিধানই প্রাণের অধ্যাত্মতত্ত্ব। প্রাণের মুখ্য মূর্ত্তি প্রেমময়, ভালবাসাময়, অনুরাগময়, আর সেই অনুরাগের স্পন্দন প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া অথবা পাঁচ প্রকারে আমাতে বেগশীল হইয়া রহিয়াছে। সেই তেজগুলিকে প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান ও সমান নামে শ্রুতি অভিহিত করিয়াছেন। হৃদয় হইতে মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত সমস্ত জ্ঞান ও ক্রিয়াদিকে চালিত করারূপ কার্য্যে যে প্রাণ-শক্তির প্রকাশ, তাঁহার নাম 'প্রাণ।

উদরে যে শক্তি সমস্ত পদার্থাদিকে রক্ত রসাদি আকারে শরীরময় চালিত ও শমিত করে এবং শ্বাস প্রশ্বাস সমান ভাবে বহন করে, ওই প্রাণ-ক্রিয়ার নাম সমান ; অধোদিকে মলমূত্রাদি নিঃসরণ প্রভৃতি কার্য্য-পরিচালক প্রাণ-ক্রিয়ার নাম অপান। ঊর্দ্ধমুখে যে প্রাণ-শক্তি ক্রিয়াশীল থাকিয়া বমনাদি অথবা মস্তিষ্ক পরিচালনাদি করে, তাহাই উদান। এবং সর্ব্বশরীরে সর্ব্বগ্রন্থিতে ক্রিয়াশীল প্রাণের নাম ব্যান। প্রধানতঃ এই পাঁচরূপে প্রাণের স্থূল শক্তিবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই প্রাণের অধ্যাত্ম পরিচয়। উদান, জীবকে তাহার চিন্তানুসারে বা তাহার প্রাণের আয়তন অনুসারে লোক-লোকান্তরে লইয়া যায় এবং সুষুপ্তিকালে আত্মায় লীন করে। আবার এই প্রাণই বাহ্যে সূর্য্যরূপে অবস্থিত হইয়া বিশ্বের বিধারক ও প্রাণদায়ক।

আদিত্যই বাহ্য প্রাণ। ইনিই প্রাণকে জাগ্রত করিয়া রাখিয়া জগদ্দর্শন করাইতেছেন। পৃথিবী অভিমানী দেবতাই জীবের অপাননামীয় প্রাণ-ক্রিয়ার বিধায়ক ; ইনিই অপানরূপে জীবে প্রতিষ্ঠিত।

আকাশ বা আকাশ অভিমানী দেবতা সমান। বায়ু বা বায়ু অভিমানী দেবতা ব্যান। আর তেজ, তড়িৎ, অগ্নি প্রভৃতি রূপে যিনি বাহ্যে অবস্থিত, তিনিই উদান। আমি পৃথিবী, আমি অগ্নি, আমি বায়ু, এই প্রকার পরমাত্মার যে চেতন-প্রকাশ বা জ্ঞান, সেই সকল বিশিষ্ট বিশিষ্ট চেতন-প্রকাশই দেবতা নামে খ্যাত, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি ; ইহাই প্রাণের বিভুত্ব।

সাধক, তোমার প্রাণের এই অন্তর্বাহ্য অবস্থান লক্ষ্য কর। যিনি আত্মা হইতে প্রথম জাত, আত্মার প্রথম বিকাশ, সেই প্রেমময় মূর্ত্তিই প্রাণ। এই প্রাণ অন্তরে বাহিরে জীবনরূপে অবস্থান করিয়া, কালের বা কাল-বোধের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়ুরূপপরিধি রচনা করিয়া, মমত্বরূপ প্রাণস্পন্দন বা ভালবাসার—প্রীতির ক্ষেত্র রচনা করিতেছেন। হৃদয়গ্রন্থি ও ব্রহ্মগ্রন্থিময় বা প্রাণময় ও মনোময় জীব-সকলকে বক্ষে ধরিয়া রহিয়াছেন। ইনিই তোমার অন্তরে অন্তঃস্বরূপ, তোমার 'আমিত্বের' উপাদান ও প্রকাশ। চেতনস্বরূপ অক্ষর পুরুষের এই জীবনময়, বিজ্ঞানময় প্রকাশই জগৎরূপে ও জীবরূপে বিরাজিত। ইনিই বিজ্ঞানাত্মা, আবার ইনিই পরমেশ্বর ও পরমাত্মা। যেখানে বিজ্ঞান, সেইখানেই প্রাণ।

তুমি তোমার অন্তরে লক্ষ্য কর। তোমার চেতনা-শক্তি বা অনুভূতি, তোমার জীবন ও সেই জীবন বেষ্টন করিয়া তোমার প্রীতি, ভালবাসা ও মমত্বের যে অভিনিবেশ, এইগুলি একত্রে উপলব্ধি করিতে পারিলেই তোমার প্রাণ-মূর্ত্তির ধারণা হইয়াছে বুঝিবে। আর এ বাহ্য জগতের অন্তরেও ঠিক এইরূপ জ্ঞানময়, জীবন্ত ও প্রীতি ভালবাসাময় ব্যষ্টি দেবতা-সকল দর্শন কর ও এই অন্তর্বাহ্যব্যাপী ব্যষ্টি দেবতা-সকলের বিধায়ক আত্মাই এইরূপে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া রহিয়াছেন, ইহা জানিয়া রাখ। তিনিই অন্তরে ও বাহিরে প্রাণ-দেবতারূপে বিরাজ করিতেছেন। আর বাহিরের পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, এই সকল যিনি, তিনিই সূক্ষ্মরূপে তোমার প্রাণ, অপান, উদান,

সমান, ব্যানাদিরূপ প্রাণ-প্রবাহরূপী দেবতা, এই উভয়ই বোধময়, জীবনময়, মমতাময় মুখ্য প্রাণ। অন্তরে প্রাণের উপলব্ধি না হইলে বাহিরে প্রাণ উপলব্ধি হয় না, আবার বাহিরে প্রাণমূর্ত্তি ধারণা না করিতে পারিলে অন্তরে প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায় না।

তুমি নিজে রহিয়াছ, এই যে সত্যবোধ, ইহাই জীবনরূপে বোধ করিয়া থাক। সেই জীবন-বোধ, অনুভূতিময় সত্তা-বোধ, আর বিপুল সুখ-প্রীতি—যাহা বাহ্যে ভালবাসা, মমতা অথবা আত্মীয়তারূপে ফুটিয়া উঠে ও যাহা প্রতিহত হইলে দুঃখ, ঈর্ষা, যন্ত্রণা ইত্যাদিরূপে বিচ্ছুরিত হয়, এই তিনরূপ অনুভূতির গ্রন্থিই প্রাণগ্রন্থি। তিনি তোমার "অহং" ভাবের আশ্রয়; উহাকে লইয়াই তুমি "আমি" "আমি" বোধ কর। আর এই ক্ষুদ্র "আমি" ভাব তিরোহিত হইলেই মাত্র নিত্য সত্তা, নিত্য জীবন—নিত্যসুখস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, আনন্দভুক্ বা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরস্বরূপ আত্মা প্রকাশ পান। তোমার প্রাণগ্রন্থির উপর যেমন তোমার অহংকার, বুদ্ধি, মন বা মনো-গ্রন্থি বা ব্রহ্মগ্রন্থি ফুটিয়া উঠে, তেমনই যখন সৃষ্টি আদি ক্রিয়া-প্রকাশে এই পরমেশ্বর প্রীতিস্পন্দময় হয়েন, তখন তাঁহার নাম হয় প্রাণ বা বিষ্ণু এবং তাঁহারই আশ্রয়ে ফুটিয়া ওঠেন ব্রহ্মা। আর যখন সমস্ত লয় করেন, তখন তাঁহার নাম হয় মহেশ্বর। মোট কথা, অনুভূতি-ক্রিয়াময় অথবা বোধ-ক্রিয়াময় যে অবস্থান উনিই প্রাণ। আর প্রাণ দেখিতে হইলে—সেই সেই অনুভূতি-

ক্রিয়ায় যে সত্তা বা জীবন্তভাব ও প্রেমময়ত্ব এবং সর্ব্ব-সম্বেদনময়ত্ব ভাব এবং অহংবোধের আশ্রয়স্বরূপতা, ইহাই দেখিতে হইবে। তুমি বাঁচিয়া রহিয়াছ এবং সুখ-দুঃখাদি বোধ করিতেছ এবং সর্ব্বক্ষণই সেই জীবনটীতে মমত্বময় বা প্রেমময় হইয়া আছ, ইহা ধারণা করিলেই, প্রাণগ্রন্থির ধারণা হইল বুঝিবে; কিন্তু ইহার সঙ্গে জানিয়া রাখিবে, ইনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ময় ও মনোময়। ইনিই মন ও ইন্দ্রিয়াকারে প্রকাশ হইয়া রহিয়াছেন। তোমার চক্ষু দেখে না, ইনিই চক্ষুর চক্ষু—তোমার শ্রোত্র শোনে না, ইনিই শ্রোত্রের শ্রোত্র। ইনিই তোমার পঞ্চ প্রাণের প্রাণ; ইনিই মনের মন। ইনিই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা, ঘ্রাতা। ইনিই বাঙ্ময়, মনোময়, ইন্দ্রিয়ময় ও শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধময় অন্তরাকাশ।

যদি তোমার স্থূল দেহটী বাদ দিয়া অবশিষ্ট সমস্তটুকু ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলি সমেত ধারণা কর, তবেই মনোময়, প্রাণময়, ইন্দ্রিয়-ময়, জ্ঞানময় সত্তা তোমার ধারণা করা হইল বুঝিবে। আর সে সমস্তই একটী জ্ঞানক্রিয়া বা জ্ঞানের ক্রিয়াময় মূর্ত্তি। আর সেই জ্ঞানক্রিয়াময় মূর্ত্তির দুটি অংশ; একটি—পদার্থ বা বিষয় ধারণা করা, নিশ্চয় করা ও তাহাতে সংকল্পাদি করা; ইহাই মন বা ব্রহ্মগ্রন্থি। আর অন্য অংশ সেই বিষয়াদি-জনিত সুখ, দুঃখ, মমতা, প্রীতি আদি যে উদ্বেলন, সেইটী। সেইটীই সামান্য ভাবে তোমার জীবনের এজন বা স্পন্দন এবং পূর্ব্ব অংশটী তাহার আশ্রিত।

তবেই প্রাণ বলিতে চেতন আত্মার প্রীতিময়—প্রেমময়, মোহিনীমায়াময় ও কাল বা জীবন-জ্ঞানময় অনুভূতি-গ্রন্থি বুঝায়। ওরে, কোন অনুভূতিই প্রেমশূন্য নহে। অনুভূতি মাত্রেই প্রেমময়, ভালবাসাময়। প্রেমই জ্ঞান-স্পন্দনের মূল মন্ত্র। প্রেমের আবর্ত্তনই জগৎপ্রকাশ বা জগদনুভূতি, প্রেমশূন্য জ্ঞান হয় না। চেতন-বিকাশ বলিতে—প্রেমময় বোধ-বিকাশই বুঝায়। আনন্দ প্রেমেরই অন্য নাম। তিনি আনন্দস্বরূপ, তিনি প্রেমস্বরূপ, এ সকল এক কথা। আর সেই প্রেম বা আনন্দ দুই রূপে প্রকাশ পায়,—স্বসম্বেদন ভাবে ও পর-সম্বেদন ভাবে। আপন প্রেমে তিনিই আপনাতে বিভোর থাকেন; আবার আপন প্রেমের স্পন্দনে আপনাকে মহান্ করিয়া, পর করিয়া, আপন প্রেমে সেই মহান্‌কে আপনারই ধন বা আপনি বলিয়া গ্রহণ করিয়া যাহা লীলার প্রকাশ করেন। আর আমরাও সেই প্রেমের স্রোতেই, প্রেমের সাহায্যেই তাঁর সে প্রকাশগুলি বুকে ধরি—অনুভব করি। আমরা যে শব্দ স্পর্শাদি অনুভব করি, সে ভালবাসারই প্রেরণায়, কর্ম্মফল লাভ করি ভালবাসার প্রেরণায় এবং সে প্রেমময়ের সন্ধানে বাহির হই—সেই ভালবাসারই প্রেরণায়। সেই ভালবাসাময় বোধই আমরা পিতৃ-বোধ, মাতৃ-বোধ, স্ত্রী-বোধ, পুত্র-বোধরূপে পাই। ওরে, তাই বস্তুতঃ তিনিই আমাদিগের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র সমস্ত। আর সেই ভালবাসার প্রেরণাতেই আমরা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসের জন্য কাঙ্গাল ও সেই সকল

ভালবাসার ধনের ভোক্তা। জীব যাহা ভালবাসে, তাহাই অনুভব করে। ওরে, সকল অনুভূতির ফলগুলি—যাহা সুখ-দুঃখাদিময় কর্ম্ম-ফল বলি, সেও ভালবাসারই প্রতিদান।

অধ্যাত্ম প্রাণ ও অধিদৈব প্রাণ

প্রাণের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থানের কথা বলিয়াছি। তোমার অন্তরে যে প্রাণমূর্তি, উনিই অধ্যাত্ম প্রাণ এবং বাহ্যে জগৎরূপে যে প্রাণমূর্তি, উনিই অধিদৈব প্রাণ। এই বিরাট্ অধিদৈব প্রাণের অঙ্কে শিশুর মত অধ্যাত্ম প্রাণ লালিত পালিত ও সম্পুষ্ট। এ উভয় একজনই হইলেও সম্ভূতি বা ভূতাদি-রূপে প্রকাশ-প্রধান প্রাণ আশ্রয়স্বরূপ ও অনুভূতি-প্রধান জীব আশ্রিতস্বরূপ। বাহ্য প্রাণই তোমার অন্তরেও প্রাণরূপে রহিয়াছেন, স্বীয় অন্তরে তুমি সেই প্রাণের দ্বারাই প্রতিপালিত হইতেছ। আর এই উভয়ই এক পরমাত্মায় বিরাজিত। "স্বীয় অন্তরে" বলিতে আমি জীবের হৃদ্‌গ্রন্থির কথা বলিতেছি, আর পরম অন্তর বলিতে সেই হৃদয়গ্রন্থির আশ্রয় হৃদয়াকাশ বা ঈশান পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিতেছি। হৃদ্‌গ্রন্থি চিনিতে পারিলেই প্রাণের প্রাণ হৃদয়কে লাভ করিবার দ্বার উন্মুক্ত হয়। কিন্তু সে কথা থাক,—অধ্যাত্ম প্রাণ উপলব্ধি করিতে, হইলে বাহ্য প্রাণকে সত্য সত্য প্রাণ বলিয়াই বা প্রাণদাতা বলিয়াই স্মরণ করিতে হইবে। তোমরা যে বাহির হইতে সর্ব্বদা প্রাণ লাভ করিয়াও বাহ্যকে অচেতন ছাড়া চিন্ময়মূর্ত্তি বলিয়া ধারণা করিতে পার না, তাহার কারণ, কোন চেতনার সাড়া পাও না বলিয়া। কিন্তু চেতনার সাড়া, চেতনার পরিচয় পাইতে তুমি

তখনই পারিবে, যখন ইনি সত্যই প্রাণময়ের প্রাণমূর্ত্তি, এই সত্যজ্ঞানে সত্যপ্রতিষ্ঠ হইবে। ওরে, বিজ্ঞান স্বীকার করে যে, জড় পদার্থও বাহ্য উদ্দীপনার প্রতিবেদনা দেয় ; আর চেতনের ডাকে চেতন সাড়া দেয় না, এ কি হয় রে! তোমার আহ্বানের উত্তর, তোমার প্রতিবেদন, তোমার ডাকের সাড়া অবশ্যই আসিবে, কিন্তু ওই অন্তরের পথে, যে পথে—সেই বাহ্য বিরাট্ প্রাণ তোমায় প্রাণময় করিয়া রাখিতে তোমার সহিত সংযুক্ত। তুমি বাহিরের জলকে প্রাণরূপী জলদেবতা বলিয়া দর্শন কর, তোমার অন্তরে রসতত্ত্ব উদ্বেলিত হইবে, তোমার শরীর রসময় হইবে। তুমি বাহিরের অগ্নিকে জীবন্ত চিন্ময় প্রাণময় অগ্নিদেবতা বলিয়া তদ্ভাবে সম্বেদিত হও—তোমার শরীরে ও অন্তরে তেজ ও বাক্য প্রভৃতি অগ্নিতত্ত্বের ধর্ম্মগুলি দ্যোতনশীল হইবে—জাগিয়া উঠিবে। তুমি বাহিরের সূর্য্যকে প্রাণময় চিন্ময় সূর্য্যদেবতা বলিয়া অনুভব কর, তোমার চক্ষুর দীপ্তি হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত সমস্ত সূর্য্যাশ্রয়ী ধর্ম্মগুলি উদ্বুদ্ধ হইবে। আর যদি ওই বাহিরের জল অগ্নি সূর্য্য ইত্যাদি দেবতাবর্গকে তোমার চিন্ময় আত্মারই প্রত্যক্ষমূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞাত হও—তবে শ্রীকৃষ্ণকে যেমন করিয়া কৃষ্ণজননী হইয়া, চিন্ময়ী প্রান্তরে আবির্ভূতা হইয়া স্তনপান করাইয়াছিল, তেমনই করিয়া—ওরে, ঠিক্ তেমনই করিয়া মাতৃরূপে আবির্ভূত হইয়া তোমার আত্মা, তোমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষাকে সার্থকতার শান্তিময় বক্ষে স্থান দিবেন। তুমি ধন্য হইবে, কৃতার্থ হইবে।

ওরে, কোন ধনী যখন সহস্র সহস্র কাঙ্গালীকে বস্ত্রাদি বা মিষ্টান্ন বিতরণ করেন, তখন লব্ধদান ভিখারীর দল আপনাদের প্রাপ্তির পরস্পর তুলনা করিতে করিতে প্রত্যাগত হয়—কাহার বস্ত্র একটু ক্ষুদ্র হইয়াছে, কাহার মিষ্টান্ন অল্পপরিমাণ, কে জিতিল, কে পাইল না, কে সামান্য পাইল, এই সকল বাগ্‌বিতণ্ডা লইয়াই তাহারা মত্ত হয়—কিন্তু সেই সহস্র সহস্রের মধ্যে বুঝি একজনও বলে না,—"ওরে ভাই সব, যে মহাপুরুষ অকাতরে এমন করিয়া সহস্র সহস্র ভিখারীকে অন্ন-বস্ত্র দিতেছেন, চল—একবার সে পুণ্যময় মহাপুরুষকে দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হই—সে কেমন!" মনুষ্যও ঠিক্ তেমনই করিয়া ঐ বিরাট্ কল্পতরুর দান-সকল গ্রহণ করে, ভোগ করে, কিন্তু ভাবে না, দেখিতে চাহে না—এ দাতাকে, এ প্রাণযজ্ঞের নায়ককে, প্রাণদানের কল্পতরুকে! তোরা জগন্নাথ কেমন, খেয়াল করিস্ না—প্রসাদ খেতেই মত্ত থাকিস্। যদি কেহ চায়, তবে তাহা হয় জ্ঞান-বুদ্ধির কৌশল দিয়া, অথবা আপনার ত্রিতাপের যন্ত্রণা অনুভব করিয়া, কাতর হইয়া, স্বার্থযুক্ত ভক্তিনামীয় কাতরতা দিয়া অথবা বিষয়াধিকারের প্রচেষ্টার মত বিষয়ীর তপস্যা দিয়া। তাই তাহাদের সে কৌশলে, সে কাতরতায়, সে তপস্যায় থাকে বিচার, থাকে নিত্যানিত্য বিবেক, থাকে বিষ ও অমৃতের নির্ব্বাচন, থাকে রমণীসুলভ দুর্ব্বলতার অশ্রুমাখা আব্দার অথবা আসুরিক বিক্রম। আর এ সকলগুলি ব্যাপিয়া যে পরিত্রাণের জন্য কৌশল, আর্ত্তনাদ ও বিক্রম বিদ্যমান থাকে, তাহাও এ

জগৎরূপ কর্ম্মযজ্ঞের সহিত কার্য্যতঃ সম্বন্ধশূন্য যেন কোন অনির্দ্দেশ্য একজনকে লক্ষ্য করিয়া। অধিকন্তু তাহাও সত্য-প্রতিষ্ঠা-শূন্য, বীর্য্যহীন! চালাকিতে কাজ হয় না রে, প্রাণের বরণ ভিন্ন প্রাণ থাকে না—বর্ত্তমান উপেক্ষা করিয়া যাহারা ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করে, অপরোক্ষ উপেক্ষা করিয়া যাহারা পরোক্ষে আস্থা স্থাপন করে, তাহারা উভয় দিকেই ভ্রষ্ট হয়।

যাক্। কিন্তু যে বাহ্য জগৎকে প্রাণময় চিন্ময় আত্মার সত্য-মূর্ত্তি, মনোময়ের মনোময়মূর্ত্তি বলিয়া ধারণা করার কথা বলিতে-ছিলাম, তাহাতে সম্যক্ সক্ষম হইতে হইলে অধ্যাত্মেও তাঁহার ধারণায় অভ্যস্ত হইতে হয়—সত্যপ্রতিষ্ঠার মত প্রাণের ধারণাও উভয় দিক্ দিয়া করিতে হয়। সেই জন্য সমস্ত উপনিষদ্ এক-বাক্যে বাহ্য ও অন্তর উভয়তঃ তাঁহার বর্ণন করিয়াছেন, উভয়ের সমন্বয় করিয়াছেন, উভয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন এবং উভয় দিক্ দিয়া তাঁহাকে প্রাণে জড়াইয়া ধরিতে বলিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন,—বস্তুতঃ এ উভয়ই এক—একমাত্র অন্তরাত্মা, তাঁহার নামই অন্তর—তিনিই সর্ব্বান্তর এবং যে দিক্ দিয়াই ডাক, সে ডাক তোমার অন্তরেই বহন করিয়া লইয়া গিয়া অন্তরেই তাঁহার চরণতলে তোমায় উপনীত করে।

প্রাণোপাসনা

ওরে মৃত! জড়োপাসনায় সিদ্ধ জড়! অচেতনতার আঁধা
বক্ষে চেতন-হারা ঘুমে-ঘেরা জীবন্তে মরার দল! ওরে কঙ্
তুরুর স্বপ্নচ্ছিন্ন নতশির কিশলয়! ওরে নির্জিত কাঙ্গাল ক্ষুধ
তুর! তোরা কি জীবন চাহিস না রে? বাঁচিতে কি সাধ নাই-
বাঁচিতে, চিরদিনের জন্য জীবিত হইতে? যে জীবন আ
ফুরাইবে না, অনন্তের অন্তদর্শী যে জীবন—অনন্তের বৈচিত্র
বিহারী যে অফুরন্ত প্রাণ! সে মহাপ্রাণ লাভ করিয়া প্রাণম
হইতে তোদের মগ্ন প্রাণে কি আশার বিদ্যুৎ খেলে না রে
সে প্রাণময়ের সত্তা স্মরণেও কি তড়িতের ক্ষণিক বিকা
তোদের মেঘাচ্ছন্ন নিশার ললাটে চমকে না রে? যদি চমকে
তবে আলোর দেশের পথিক হয়ে তোরা বাহিরে আয়, বাহি
আয়, ও দীনতার পর্ণ-কুটীরের দ্বার খুলে! সে পথের ঋষিযাত্রী
পদচিহ্ন তোরা দেখতে পাবি—আর সেই পদচিহ্ন ধরে অগ্রস
হ'লে তবে সে আলোর রাজ্যে উপনীত হবি—যেথা সূর্য্য কখন
অস্ত যায় না—চন্দ্র যেথা কলাময় নয়!

ওরে, অন্ধের চক্ষে অন্ধকারের কালিমা দেখার মত তো
কত দিন আর অন্ধকারে দ্রস্টা রহিবি? অন্ধও যে দেখি
পায়—তোরাও যে দেখিতে পাইতেছিস্। দেখ্ ত অন্ধের
বিলুপ্ত হয় নি—তোদেরও বিলুপ্ত নয়! অন্ধ আর কিছু দেখি

পায় না, কিন্তু অন্ধকার দেখে। তোরাও চিন্ময়কে না দেখতে পেলেও অচেতনকে দেখিতে পাস্। যখন দেখিতে পাস্, তখন তাদের বুকের ভিতর যে এই অচিৎ আঁধারের দ্রষ্টা, তাকে দেখ, তোদের চক্ষের তারকা ফিরিয়া পাবি।

ওরে অন্ধ! তোদের নাকি সর্ব্বস্ব অপহৃত হয়েছে! তোরা নাকি লুণ্ঠিত—কোন যাদুকরীর মোহ-মরীচিকায়! তোরা নাকি হৃতসর্ব্বস্ব, পথের কাঙ্গাল! ওরে, সর্ব্বস্ব তোদের চুরি যায় নি—তোরাই সর্ব্বস্ব আমার আমার বলে অপহরণ করেছিস্। যার জিনিষ, তাকে "তোমার সর্ব্বস্ব, তোমার সর্ব্বস্ব" বলে ফিরিয়ে দে—সে আপনি শুদ্ধ তোর আপনার হয়ে যাবে।

ওরে, তুই আপনার উদরপূরণ করিতে চাহিস—তাই তোর ক্ষুধা কখনও মেটে না, তোর বুভুক্ষা নিবৃত্ত হয় না। তোর আহারে প্রকৃতপক্ষে যাহার আহার হয়—তাকে তুই তোর ক্ষুধার অন্ন ধরে দে, তোর ক্ষুধা অনন্তকালের জন্য নিবৃত্ত হবে।

কাঙ্গালের মুখ চাহিবি যদি, তবে তারই মুখপানে চেয়ে দেখ্—যাহাকে না দেখে তুই নিজেই কাঙ্গাল হয়েছিস—আর তার জন্যই যে বিশ্বপতি হয়েও নিত্য কাঙ্গাল।

ওই দ্রষ্টাকে দেখ, সর্ব্বস্ব তারই মহিমা বলে স্বীকার কর, ফিরিয়ে দে, তোর সকল ক্ষুধার সকল অন্ন তার মুখে তুলে দে, তার বুঝে নে, তোর মত পথের ধুলার অন্ধ, আতুর, নগণ্য যদি তাহারও প্রাণপ্রিয় হইতে পারে, তবে সে তারই—যে তোর প্রাণ—আপনার আদর আপনি করতে যে প্রাণ হয়েও প্রাণের

কাঙ্গাল সেজেছে। এই হলেই তোর প্রাণোপাসনা সিদ্ধ হবে।

তোর ঘরের ভিতর আলো জ্বলিতেছে—হউক মিটি মিটি তবু জ্বলিতেছে। দীপ-শিখা না দেখিতে পাস্, জ্ঞানের আলো রহিয়াছে, এ ত তুই দেখিতে পাইতেছিস্। ওই আলোকজ্বালই তোকে দীপ-শিখা দেখাইয়া দিবে। ওই আলোকেই তুই জগতের আলো বলিয়া বরণ কর। ওই আলোই দ্রষ্টা। ওই জগৎ দেখে—তোকেও দেখে। ওই আলোই তুই হয়—জগৎ হয়। ওই আলো দিয়েই আলো দেখ্‌তে হয়—অন্য আলো জ্বাল্‌তে হয় না। প্রদীপ জ্বেলে কে কোথায় সূর্য্য দর্শন করে?

ওরে, ঋষিরা বলেন—প্রাণই প্রজ্ঞা—প্রজ্ঞাই প্রাণ। তোর জীবন আছে, তুই জানিস্—তোর বোধশক্তি আছে, এ কথা তোকে শেখাতে হয় না। এই দুটি একই রে! আর ওই যে একজন, ওর ব্যবহারটার নামই ভালবাসা। ভালবাসাই ওর অভিব্যক্তি। ভালবাসাই ওর নিত্য-ধর্ম্ম। ওই আপনাকে কখনও কখনও পর ক'রে ভালবাসে—আর সব সময়েই আপনাকে আপনি করে ভালবাসে। তাই ও প্রাণময়কে প্রিয় বলে উপাসনা করতে সত্যপথের যাত্রীরা তোকেও শিক্ষা দেয়।

তুই প্রিয় বলে ওকে বরণ কর শিশু! প্রিয় বলে প্রাণকে তোর প্রাণের মাঝে বুকে ধর—প্রিয় বলে তোর জগৎজ্ঞানের যথাসর্ব্বস্ব ওর হাতে সমর্পণ কর—যেমন করে তুই তোর কষ্টে অর্জ্জিত ধনরত্ন তোর স্ত্রী-পুত্রের হাতে তুলে দিয়ে তৃপ্তি ভোগ

করিস্ ; তেমনই করে "এ সব তোমারই" বল্। এ ভব সংসারের মালিক ওই—আর তোর অনুভব সংসারের মালিক তুই ! ওরে, তোর মালিকানি স্বত্বটুকু ওকে তুই দিয়ে দে। উনি তোকে ওর মালিকান স্বত্ব লিখে দিবেন। তুই অন্তর্বাহ্যে ওঁকেই পাবি, ওঁকেই দেখবি—উনিই হয়ে যাবি।

তোর শ্বাস-প্রশ্বাস থেকে যত কাজ, সমস্ত তুই তখন করতে থাক্‌বি তোর ওই প্রিয়তমের মুখ চেয়ে। তুই আপনি শুইতে তাহাকে শোয়াইতেছিস্ দেখিবি, আপনি আহার করিতে তাহাকেই আহার করাইতেছিস্ অনুভব করিবি, তুই আপনি স্নান করিতে তাহাকেই স্নান করাইতেছিস্, আপনি চলিতে তিনিই চলিতেছেন বোধ করিবি ; ইহাই প্রকৃত ভগবানে কর্ম্মসমর্পণ।

আর তোর এই সকল ব্যবহার "প্রিয়"-বোধের ঘনীভূত বিকাশরূপেই অভিব্যক্ত হবে। "প্রিয়তম—সর্ব্বস্ব দিয়া সর্ব্বস্ব লইবার জন্য এত আকুলতা তোমার—শুধু তোমার আরও গুপ্ত ধন দিবার জন্য—দেখাবার জন্য ! তাই তুমি সকল দিয়া আবার সকল লইবার জন্য দীনের দ্বারে ভিখারীরাজ ! এ দেওয়া লওয়ার রঙ্গ শুধু তোমাময় তোমার রূপের পাগলকে তোমার জন্য পাগল্ করিতে। শুধু দেওয়া লওয়ার যোগ, ব্যাকুল দ্বৈতভেদটী অনন্ত কালের জন্য ঘুচাইয়া দিতে ! তুমি আমার প্রিয়তম প্রাণ—আমি তোমার প্রিয়তম প্রাণ"—ইহাই হবে তোমার জীবনব্যাপী আত্মিক, মানসিক ও কায়িক কর্ম্মসকলের প্রণোদক ভাবের ধারা।

এই চারিটি প্রাণোপাসনায় লক্ষ্য করিবার বিষয়,—তোমার চিন্ময়, মমতাবোধময় জীবনসত্তা, যিনি প্রকৃত প্রজ্ঞাস্বরূপ, তিনিই তোমার আত্মার প্রাণমূর্ত্তি। ইনিই তোমার সকল সুখ-দুঃখের দ্রষ্টা, ভোক্তা না হইয়াও ভোক্তা, তোমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী প্রাণ। ইনিই অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু আছে সমস্ত, মূর্ত্ত অমূর্ত্ত সমস্তই ইঁহারই মহিমা বা ইঁহারই বিকাশ বা ইনিই। আর এই দেবতাতে তোমার শ্বাসপ্রশ্বাস হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কর্ম্মের প্রাণময় অর্পণ অথবা এক কথায় আত্মসমর্পণ। আর সে সমর্পণ বুদ্ধি দিয়া নহে, কঠোর কর্ত্তব্যবোধে নহে, বিজেতাকে বিজিতের সমর্পণের মত নহে—জ্ঞান-বিচারে বুঝিয়া সিদ্ধান্ত স্বীকারের দ্বারা নহে—ভয়ে নহে—পরিত্রাণের জন্য নহে—প্রিয় বলিয়া, প্রাণ বলিয়া না দিয়া থাকিতে পারা যায় না বলিয়া, স্বতোনিবেদিত আত্মসমর্পণ—যে আত্মসমর্পণে প্রকৃত আত্মলাভই হয়, সেইরূপ সমর্পণ। প্রাণ উপাসনার এই চারিটি অঙ্গ।

ওরে, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, লয়যোগ, তোরা কত যোগেরই নাম শুনিয়াছিস। আমি সংক্ষেপে সেগুলি বুঝিয়ে দিই। "আমি তোমার" এই ভাবের যে অভিব্যক্তি, তাহাই কর্ম্মযোগ। আমি তোমার—আমার কৃত সকল প্রচেষ্টাই তোমার, এই ভাবে কর্ম্ম করিতে পারাই প্রকৃত কর্ম্মযোগ।

"তুমি আমার" এই ভাবের যে অভিব্যক্তি, তাহাই ভক্তি-যোগ। "ওগো, তুমি আমার—আর কারো নয়—কারও নয়,

আমারই প্রাণ তুমি," তোমার সকলপ্রাণের উচ্ছ্বাস যখন তাঁহাকেই মর্ম্মের মর্ম্মে চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে এই ভাবে উদ্বেলিত হইতে থাকিবে, তখনই বুঝিবে, প্রকৃত ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান হইতেছে।

আর যখন তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া থাকিয়া থাকিয়া আত্মহারা হইয়া যাইবে, তন্ময় হইয়া যাইবে, তখনই বুঝিবে, তুমি প্রকৃত লয়যোগী।

আর যখন "তুমি" "আমি" থাকিবে না, অথবা এক অপূর্ব্ব আত্মসম্বেদনময় প্রীতিকর সুখের নিস্তরঙ্গ অদ্বৈত প্রত্যয় বিরাজ করিবে, তখনই তুমি জ্ঞানযোগী।

আমি আত্মার চারিটি পাদের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। জাগ্রৎপাদ, স্বপ্নপাদ, সুষুপ্তিপাদ ও তুরীয়পাদ। বহির্মুখী জীব যেমন জগৎসম্বন্ধ লইয়া সাধারণ ভাবে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিভাবে বিভোর হয়, সাধকও তেমনই ভগবানে জাগে, স্বপ্নময় হয়, সুপ্ত (সমাবিষ্ট) হয় ও অদ্বৈতবোধে সম্বুদ্ধ হয়। ভগবানে এই জাগ্রতবোধই যেন কর্ম্মযোগ, স্বপ্ন ভক্তিযোগ, সমাধি লয়যোগ এবং অবস্থাত্রয়াতীত বিরজ জ্ঞানে বিহার জ্ঞানযোগ।

তুমি যখন জাগ্রত থাক, তখন তোমার চতুর্দ্দশ করণ কর্ম্মময় হয় অর্থাৎ বিষয় লইয়া অন্তরে ও বাহিরে মত্ত থাক। বিষয়মোহে মুগ্ধ হইয়া তুমি তোমার বিষয়-লালসায় যে কর্ম্মময় আবর্ত্তনে আপনাকে মজ্জমান কর, তাহা দেখিলে স্পষ্টই বলা যায়, তুমি যেন বিষয়ের ক্রীতদাস—যেন তুমি বলিতেছ, "বিষয়! আমি তোমার, আমি তোমার!"।

আর যখন বাহ্য ইন্দ্রিয় কর্ম্মবিরত করিয়া, মনে মনে বিষয় চিন্তায় মত্ত হও অথবা নিদ্রাকালে স্বপ্নে বিষয়-সকল আপনার অন্তরে ভোগ করিতে থাক, সে শুধু বিষয় প্রাপ্তির তৃপ্তি ও ভবিষ্যতে পাইবার তৃপ্তি অথবা অতীতে পাওয়ার তৃপ্তি অথবা বিষয় আপনার করিতে না পাওয়ার অতৃপ্তি তখন স্পষ্টই দেখা যায়, তুমি তোমার অধিকৃত বিষয়কে "আমার বিষয়, আমার বিষয়" বলিয়া গ্রহণ করিতেছ। বিষয়, তুমি আমার, ইহাই হয় তোমার তখনকার চেতনগতির মুখ্য অভিব্যক্তি। আর সুষুপ্তিতে তুমি আপন সত্তা পর্য্যন্ত হারাইয়া সকল কর্ম্ম ও সকল চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি লাভ কর।

সাধকের প্রাণও ভগবদভিমুখেই এই ভাবে জাগ্রত ও স্বপ্নময় হয়। অথবা তাঁহাতে আত্মহারা হইয়া তন্ময় হইয়া যায়। তাই বলিতেছিলাম, "আমি তোমার—তুমি আমার" এই ভাবে সাধক ভগবানে কর্ম্মময়, স্বপ্নময় হয়—অথবা তাঁহাতে ক্ষণিক লয় লাভ করে। সাধক জাগিয়া থাকে ভগবানে, স্বপ্নময় হয় ভগবানে, সমাহিত হয় ভগবানে। সে তার প্রাণময়কে লইয়াই শয্যাত্যাগ করে, প্রাণময়ের দর্শন ও সেবাতেই দিন অতিবাহিত করে, প্রাণময়কে বক্ষে লইয়া শয়ন করে, প্রাণময়কে দেখিতে দেখিতে তাঁহারই অঙ্কে নিদ্রিত হয়। তার সকল দর্শন প্রাণকে, সে সহস্র নয়নে সহস্রনয়নকেই দেখে, সর্ব্বত্র সে সর্ব্বতঃ-পাণিপাদকে হারান মানিকের মত খুঁজিয়া বাহির করে। সহস্র কর্ণে সে সহস্রাননের মধুময় বাণী শ্রবণ করে। তাঁহারই

বিরহ, তাঁহারই মিলন, ইহাই তাহার সমস্ত চাঞ্চল্যের ভূমি। সে দেখে, এই যে তার জীবন, এই যে প্রত্যক্ষ প্রাণ, এই যে তার চেতনা—বোধ—জ্ঞান, এই যে সকল মমতার আধার হৃদয়, এই তার দেবতা, প্রত্যক্ষ দেবতা, ইনিই অন্তর, ইনিই বাহ্য, ইঁহারই মহিমা মন, ইঁহারই মহিমা মনোময় এ বাহ্য বিশ্ব—শুধু প্রাণ—প্রাণ—প্রেমময়, প্রীতিময়, ভালবাসাময়, প্রাণের আধার প্রাণ।

প্রাণের সাড়া

কোথা প্রাণ, কোথা প্রাণ, ইহাই জীবের জন্ম জন্মান্তরের মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ। আহার বিহার শয়ন, দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ, স্পর্শন আস্বাদন, শ্বাস প্রশ্বাস—সমস্ত কর্ম্মই জীব প্রাণের জন্য করে; প্রাণের রক্ষণ, প্রাণের বিলাস, প্রাণের তৃপ্তি, প্রাণের পোষণ, ইহাই তোমাদের সকল ব্যবহারের একমাত্র লক্ষ্য। ইহাই সারা জীবনব্যাপী মহাযজ্ঞ এবং এই যজ্ঞের দেবতা প্রাণ। তোমরা রূপের জন্য রূপ দেখ না, প্রাণের তৃপ্তির জন্য রূপ দেখ, আহারের জন্য আহার কর না, প্রাণের তৃপ্তির জন্যই আহার কর, বিষয়ের জন্য বিষয় সংগ্রহ কর না, প্রাণের তৃপ্তির জন্যই বিষয় সংগ্রহ কর। স্ত্রীর জন্য স্ত্রী তোমাদের প্রিয় নহে, প্রাণের তৃপ্তির জন্যই স্ত্রী তোমাদের প্রিয়। পুত্রের জন্য পুত্র প্রিয় নহে, প্রাণের তৃপ্তির জন্যই পুত্র তোমাদের প্রিয়। বিত্তের জন্য বিত্তকে ভালবাস না, বিত্তকে ভালবাসিয়া প্রাণ তৃপ্তি পায় বলিয়াই বিত্ত তোমাদের প্রিয়। সমস্তের জন্য সমস্ত তোমাদের প্রিয় নহে, প্রাণের তৃপ্তির জন্যই সমস্ত তোমাদের প্রিয়। এমনই তোমরা প্রাণের সেবক, এমনই তোমরা প্রাণের উপাসক। অথচ কোথা সে প্রাণ, কোথা সে প্রাণ—ইহাতে সকল ব্যবহারের পর্য্যবসান। আকাঙ্ক্ষা কিছুতে মিটিয়া যায় না, প্রাণের ক্ষুধা কিছুতে নিবৃত্ত হয় না—প্রাণের বিরহ-নিশার সীমন্তে মিলন-রবির সিন্দূর-বিন্দু শোভা পায় না।

ইহার কারণ, জীব প্রাণের জন্য সমস্ত করে সত্য, কিন্তু পরোক্ষভাবে। প্রধানতঃ তাহারা বিষয়ের জন্যই বিষয় ভোগ করে, প্রাণের দিকে লক্ষ্য রাখে না। তোমরা ভিখারীকে যখন ভিক্ষা দাও, তখন মনে কর, ভিখারীর মুখ চাহিয়াই তাহার উপর দয়াপরবশ হইতেছ, ইহাই প্রধান ভাবে তুমি ধারণা কর। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তোমার প্রাণ যে দয়া প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না বলিয়া ভিক্ষা দিতেছ, এ কথা ভাব না। এইরূপ সমস্ত বিষয়েই তুমি সর্ব্বতোভাবে প্রাণের উপাসনা করিলেও উহার দিকে লক্ষ্য কর না বলিয়া যেন অজ্ঞাতসারেই করিয়া থাক—আর সেই জন্য তোমার প্রাণের সেবা করিয়াও তুমি প্রাণ হইতে বঞ্চিতপ্রায়।

হাঁ গা, তোমরা এত করিয়া যে প্রাণের সেবা কর, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সর্ব্বপ্রকারেই যে প্রাণকে লইয়া তোমরা মত্ত থাক, সে প্রাণের তোমরা কি কোন সাড়া পাও? কোন প্রতিদান, কোন প্রতিবেদন তিনি কি তোমাদের দেন?

দেন—পরোক্ষ ভাবে। তোমরা পরোক্ষভাবে তাঁর সেবাপরায়ণ, তাঁহার প্রতিবেদনও সেই জন্য পরোক্ষ ভাবেই উপলব্ধি কর। ওগো, এ জগৎ মানস বিলাস। জ্ঞানই ফলভোক্তা ও কর্ত্তা। কর্ম্ম জ্ঞানের বহির্বিকাশ মাত্র। বোধ অনুসারেই ফল। তোমরা প্রাণের সেবারত থাকিলেও যেমন মনে, যেমন জ্ঞানে সে কাজ কর, সেইরূপই ফললাভ কর। তোমরা অজ্ঞাতসারে প্রাণের উপাসনা কর, সেই জন্য প্রাণের প্রতিবেদনও তোমা-

দের নিকট অজ্ঞাত। সজ্ঞানে, প্রত্যক্ষভাবে, কর্ম্মসকল তাঁহার মুখ চাহিয়া করিতেছ ভাবিলে, প্রত্যক্ষ ভাবেই তাঁহার সাড়া পাইতে।

মুগ্ধকর প্রাণের সাড়া প্রধানতঃ পাঁচ প্রকারে আসে। বেদন, কম্পন, প্রকাশ, বিদ্রাবণ ও নিধন বা মোহন। তুমি যখন কোন বিষয়ের সংস্পর্শে আস, তখনই সেই বিষয়ের যে প্রথম বোধ হয়, উহাই বেদন। বেদন বলিতে আমি শুধু বুদ্ধি আদির ক্রিয়া বলি না। বুদ্ধি আদির ক্রিয়া বেদনের বাহ্য রূপ মাত্র। দুইটি বস্তু বা ব্যক্তি সন্নিহিত হইলেই তাহাদের মধ্যে যে আকারেই হউক, একটী জ্ঞানপ্রবাহ হয়—যে প্রবাহের আকার-প্রকারকে আমরা বুদ্ধি আদি নামে অভিহিত করি। সেই প্রথম সম্বেদনই বা অনুভূতিই বেদন। সে অনুভূতি হয় অনুভাব্যের সমবোধক।

তারপর সেই বস্তুর বা ব্যক্তির বিশেষত্বটুকু বুদ্ধিতে ফুটিয়া, সেই অনুভূতি যে ভালবাসা বা ঈর্ষা বা মমতা, যা হ'ক প্রকাশ পাইয়া সমগ্র হৃদয়ময় বিস্তৃত হয়, উহাই কম্পন। তারপর সে অনুভূতির সম্যক্তার যে তন্ময়তা বা তৎস্বরূপ বোধ উহাই হয় প্রকাশ। তারপর সেই প্রকাশের বশবর্ত্তী হইয়া সেই বস্তুর সহিত যে ব্যবহার কর, অর্থাৎ তাহার দিকে যে প্রাণের গতি হয়, উহাই বিদ্রাবণ ও প্রাণ সেই বস্তুতে বা ব্যক্তিতে একটী বিশিষ্ট সংস্কারে যে আবদ্ধ হয়, উহাই নিধন বা মোহন"। মনে কর, তুমি একজন মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিলে। তাঁহার

সঙ্গ প্রাপ্তিমাত্র যে মহান্ একটী পুণ্যময় ভাব প্রকাশ পায়, উহাই বেদন। তারপর উপদেশ শুনিতে শুনিতে তাঁহার দিকে যে হৃদয়ের আকুলতা অনুভব কর, উহাই কম্পন। ক্রমশঃ জ্ঞানে চিন্তনে সর্ব্বদা তাঁহার ভাব, তাঁহার ছবি তোমার বুকে যে ভাসিতে থাকে, উহাই প্রকাশ। তাঁহার আপনার হইবার জন্য তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ না করিয়া, তাঁহার তৃপ্তি বিধানে অনন্যচিন্ত, অনন্যকর্ম্মা হইয়া যে সেবা বা কর্ম্ম করিতে থাক, উহাই তোমার বিদ্রাবণ অর্থাৎ তুমিও যেন দ্রব হইয়া তন্ময় হইতেছ। আর তাঁহাতে একবারে অন্ধ হইয়া, তাঁহার হইয়া, প্রাণকে যে সর্ব্বতোভাবে তদনুবর্ত্তিতা দাও, তাঁহার সম্বন্ধ লইয়াই আপনার যে পরিচয়, তাহাই সার কর, ইহাই তোমার নিধন বা মুগ্ধতা, তাঁহাতে সম্যক্ তন্ময়তা।

তোমার বাহিরে আকাশ ওই প্রাণের বেদন; বায়ু ওই প্রাণের কম্পন, আদিত্যাদি ওই প্রাণের প্রকাশ, সলিল ওই প্রাণের বিদ্রাবণ, পৃথিবী ওই প্রাণের নিধন।

তোমার অন্তরে যে পঞ্চ প্রাণের কথা বলিয়াছি, উহাদিগের মধ্যে যে সমান বায়ু, উহাই বেদন; প্রাণবায়ু কম্পন, উদানবায়ু প্রকাশ, ব্যান বায়ু বিদ্রাবণ এবং অপান বায়ু নিধন।

তোমার আহার করিবার যে, ইচ্ছা উহাই বেদন, আহার সংগ্রহ কম্পন, আহারই প্রকাশ, আহারের তৃপ্তি বিদ্রাবণ এবং উহার পরবর্ত্তী ফলই নিধন বা মূঢ়তা।

স্ত্রীসঙ্গের যে উপমন্ত্রণা, উহাই বেদন, স্ত্রীর সহিত শয়নই

কম্পন, প্রচেষ্টাই প্রকাশ, আনন্দই বিদ্রাবণ, সমাপ্তি নিধন।

মেঘোদয় বেদন, সঞ্চারণ কম্পন, বিদ্যুৎ ও ধ্বনি—প্রকাশ, বর্ষণ বিদ্রাবণ এবং সমুদ্রে উহার মিলনই নিধন।

তোমরা প্রাণের সাড়া এইরূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বকর্ম্মে পাও। ঋষিরা এই ভাবেই প্রাণের সাড়া লক্ষ্য করিতেন, প্রাণের সহিত পরিচিত হইতেন। ওরে, এমন করিয়া প্রাণকে না দেখিলে প্রাণকে কেহ দেখিতে পায় না।

তোর সত্তা-বোধই প্রাণের বেদন, তোর সর্ব্ব অনুভূতিই প্রাণের কম্পন, তোর বিষয়-স্বপ্ন বা মননই প্রাণের প্রকাশ, তোর বিষয় সংগ্রহ ও ভোগই প্রাণের বিদ্রাবণ, তোর সংস্কারই প্রাণের নিধন বা মূঢ়তা।

এইরূপ, প্রাণে সত্যপ্রতিষ্ঠাই হউক তোর বেদন, তাঁহার অনুভূতিই হউক তোর কম্পন, তাঁহাতে তন্ময়তা হউক তোর প্রকাশ, সমগ্র মানস ও বাহ্য প্রচেষ্টা বা কর্ম্ম তন্মুখী হইয়াই হউক তোর বিদ্রাবণ—তুই তাঁহাতে মিলাইয়া গিয়া অনন্ত কালের জন্য আত্মহারা হইয়া আত্মস্থ থাক, ইহাই তোর নিধন।

জানিতে পার বা না পার, কিন্তু প্রাণ এই ভাবে সর্ব্বক্ষণ বেদনময়, কম্পনময়, প্রকাশময়, বিদ্রাবণময় ও লয়ময় হইয়া তোমার স্বীয় অস্তিত্বের সাড়া দিতেছেন, লক্ষ্য কর।

আকর্ষণ ও বিকর্ষণ

'ওগো প্রাণ! নিয়ে চল নিয়ে চল—বেয়ে চল কর্ণধার—বেয়ে চল! ওগো জীর্ণ তরীর কর্ণধার, তুমি তরীতে এসে হাল ধর না। বাদল-ঝরা গভীর রাতে সাগরের বুকে তরী ভাসিয়ে তুমি ডাঙ্গা দিয়ে গুণ টেনে কেন নিয়ে চলেছ? আমি যে তোমায় দেখ্‌তে পাচ্ছি না; শুধু টানে টানে তরীখানা যে চড়ায় চড়ায় থমকে যাচ্ছে—ঝলকে ঝলকে জল উঠছে—ঢেউয়ের দাপটে তরী কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে—আমার বড় ভয় হচ্ছে; ওগো খেয়ার নাবিক! তুমি গুণ ছেড়ে তরীতে উঠে হাল ধর না। ডুবু-ডুবু এ তরণী চড়ায় আট্‌কে দিয়ে কেন অমন আকুল টানে টানছ? হালে এসে তরী ভাসিয়ে দাও—পাল তুলে দিয়ে পাড়ি দাও উত্তরে—ওরে অবোধ নাবিক!

'ওগো অচিন দেশের অচিন নাবিক! তুমি কাছে না এলে আমি যে ভরসা পাই না আর এ তরণীতে থাক্‌তে—তোমায় না চিন্‌লে আমি মানের ভয়ে আমার সংসার-বাস খুলে পালের কাপড় করতে যে দিতে পাচ্চি না।

'উজান ঠেলে যেতে হচ্চে, তাই কি এত ঝাপটা নাবিক? এ যে আমায় বসতে দিচ্ছে না—আমার সর্ব্বাঙ্গ যে শীতল হয়ে গেল—তোমার বুকে আমার মাথাটি নিয়ে একবার হালে এসে ব'স না। আমি আঁধারের ভিতর হারা-দৃষ্টি তোমার মুখের উপর ফিরিয়ে ধরি। দু'টানায় যে অচল হ'ল তরী—অচল কূলের অচল সাথী!

'তুমি টানছ এক দিকে, তোমার সাগর টানে অন্য দিকে; সাগরের টানে আমার তরী দুলছে—তোমার টানে আমার হৃদয় কাঁপছে। তোমার গুণের রশি আমার কণ্ঠে যে জড়িয়ে গেছে। আমায় কেন রশি ধরতে বলেছিলে রে অবুঝ চতুর?

'তুমি নাকি জগতের পারের খেয়ারী—জগতের ঠাকুর। পাড়া-পড়সীর ঠাকুর দেখে আমার আশা মিট্‌বে কেন? তুমি আমার ঠাকুর হয়ে হালে এসে ব'স। নইলে শুধু গুণের টানে তরী চলে না—সে ত তুমি ভালই জান। নইলে যে অনন্ত তারকাকে টেনে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, সে কি আর এই অশান্ত তরীর শান্ত পথিককে টান্‌তে এত বেগ পায়। তুমি যতক্ষণ পরের ঠাকুর, ততক্ষণ ত পারের ঠাকুর নও।

'হালে এস, হালে এস! আপন ঠাকুর হয়ে হালে এস। এ তোমার পার করা নয়—শুধু টানের খেলায় ফাঁদে ফেলা। যারা এ পার ও পার দু'পার দেখে, তারাই পার হতে চায়, আর তাদেরই বেলায় সাগর তোমার ফুলে আর দু'লে বানচাল করে তাদের তরণী। আর তারাই এ দুটানে পড়ে—ঢেউয়ে ঢেউয়ে আছাড় খায়। আর যারা অপার গাঙ্গে পারের দিকে চোখ রাখে না, শুধু তোমার চোখে চোখ দুটি দিয়ে, কূলের কথা ভুলে গিয়ে, তোমার তরেই আকুল হয়, তাদেরই তুমি তোমার কোন্ অকূল দেশে নিয়ে যাও—যেখান থেকে আর কোন কূলেই সে ফেরে না।

'তুমি তেমনি ক'রে আমায় ভাসিয়ে নেবে কি টানের মাঝি?

যখন তোমায় ভুলে তোমার সাগর পানে চেয়ে থাকি—তার পাগল বুকের পাগল খেলায় হাসি কাঁদি, তখন মনে হয়, তুমি বুঝি আর টান্‌ছ না—উজান স্রোতে তরী আমার বুঝি ভেসে চলেছে ডুববে ব'লে।

'কিন্তু যখন চমকে ফিরে তরীর দিকে চাই, তখন দেখি, গুণের ঠাকুর, গুণ সমান টানেই টানা রয়েছে—রশি ত ছাড়নি তুমি। শুধু ভোলাপ্রাণের ভুল ভাঙ্গতে তরীকে তুমি ঢেউয়ের মাঝে ভাসিয়ে ধরেছ—সে ছেড়ে দেওয়াও তোমার টানের খেলায় ভোলা মনকে ভুলিয়ে নিতে—তোমার দিকে পথিকের চোখ ফিরিয়ে ধরতে। এ বিকর্ষণও তোমার আকর্ষণ ঠাকুর!

'তোমার রূপ দেখে তোমাতে মজব—কি তোমাতে মজে তোমার রূপ দেখব—এইটা শুধু আমায় দয়া করে বল্‌বে? ও! রূপ দেখে মজতে হবে—আর মজে রূপ দেখ্‌তে হবে। যত মজব, তত রূপ বদলাবে বহুরূপী? শেষ অরূপ—কেমন না?

'কিন্তু আমার চোখের দৃষ্টি যে অন্ধকারে রোধ হয়ে রয়েছে, জলের ঝাপটায় চাইতে পারছি না—একবার একবার শুধু ছায়ার মত যা চোখে ঠেখ্‌ছে, তাতেই মনে মনে নানা রকম ক'রে তোমায় গড়ে তুলছি—প্রাণের পিপাসা তাতে ত মিট্‌ছে না!

'না মিটুক। কিন্তু রয়েছ আর টান্‌ছ, এইটাই আমার প্রাণে তোমায় কত মধুর ক'রে এঁকে তুলছে সাথী! তোমার রূপ

না দেখলেও আমি তোমায় 'একটু একটু ভালবাসি।—এইটাই বুঝি তোমার দেওয়া আর একরকম টান। আর এই টানেই তুমি গুণ ছেড়ে হালে এসে বস।

'বড় সাধ হয় সাথী! তোমার ব্যথায় ব্যথী হ'তে। তুমি ত জগতের ব্যথাহারী; কিন্তু আমার ইচ্ছা হয় না, তোমায় আমার ব্যথা বহন করতে দিতে। শুধু যদি তোমার কিছু ব্যথা থাকে, সেই ব্যথায় আমায় ব্যথী হ'তে যদি তুমি দিতে! আমি যখন তোমার কাছে নিজের ব্যথা বল্‌তে থাকি, তখন সেটা বিকর্ষণ বলেই বুঝে নিতে হবে—কেন না, বস্তুতঃ তখন তোমার মুখ ত চাহি না—সে যে আমারই মুখ চাওয়া!

'দূর করে দাও এ ছদ্মবেশী বিকর্ষণ—এ ভালবাসার ছদ্মবেশে স্বার্থপরতা! ওগো প্রিয়! তুমি এ শ্রম ছেড়ে একটু এ তরীতে এসে বিশ্রাম কর—একটু স্থির হয়ে ব'স। তোমার শ্রান্ত মুখখানি আমি একবার মুছিয়ে দিই আমার মলিন বাসের অঞ্চল দিয়ে!

'ওগো, তুমি নাকি কিছুই কর না! শুধু সাক্ষীর মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ! তোমার নাকি সুখ দুঃখ, হাসি ব্যথা কিছুই নেই? আমি যে অবাক্ হয়ে যাচ্ছি দেখে—তুমিই সব করছ, আমি শুধু সাক্ষীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছি। তুমি হাসি দেখালে হাসছি—কান্না দেখালে কাঁদছি। তোমার মুখে হাসি না দেখলে কেউ কি হাসতে পারে—তোমার চোখে অশ্রু দেখে তবে না আমাদের চক্ষে অশ্রু ঝরে! আমি যে

তোমার দর্পণের প্রতিবিম্ব। প্রাণ না কাঁদলে কি প্রাণী কাঁদে—প্রাণের মুখে হাসি না ফুটলে কি প্রাণী হাসে?

'আহা, উঠে এস—উঠে এস। ব'স—তোমার চরণে কত ক্লান্তিই জড়িয়ে ধরেছে। ওগো খেলায় মত্ত নিত্য নবীন! সূর্য্যকিরণে লাল নীল সকল রকম রশ্মিই আছে—মোটামুটি সেগুলি দেখা যায় না—শুধু শাদা দেখায়। ক্ষুদ্র কাচখণ্ডে সব আলোই যে ধরা পড়ে। তোমাতে হাসি কান্না সবই আছে, মোটামুটি সবটা জড়িয়ে তোমার আনন্দের খেলা—তা আমি জানি। কিন্তু আমি অণুবীক্ষণ মাত্র—যে শুধু ছোট ধরারই যন্ত্র! তাই ত আমি আনন্দের বিশ্লেষণ ক'রে তার ভিতরকার হাসি-কান্নাগুলি ধরে ফেলছি। তোমার সবটা দেখবার যে দিন শক্তি দেবে, সে দিন আর হয়ত তোমার কান্না আমার চখে ঠেকবে না—কিন্তু তা' বলে আজ আমি কেমন ক'রে চুপ ক'রে থাকি দুরন্ত শিশু!

'আমার বড় সাধ হচ্চে—তুমি একবার আমার বুকে মাথা রেখে একটু ঘুমোও। 'আমি শুধু তোমার মুখখানির দিকে চেয়ে চেয়ে বিভোর হয়ে ব'সে থাকি। আহা! এই তুমি ধীরে ধীরে আসছ! এস এস!

'কি বললে? আর কেন সাগরের কথা—ঢেউয়ের কথা, তরীর কথা—নিজের কথা বলছি না? যতক্ষণ মানুষকে না পাই, ততক্ষণই তার ছবির দরদ। 'মানুষ এলে আর ছবির দরদ থাকে না ত!

'হাঁ,—ঠিক বুঝিয়ে দিয়েছ। এই রকম শুধু তোমার মুখ চাওয়া, এ-ই সত্যের আকর্ষণ। আর সসাগর সতরণী "আমির" মুখ চেয়ে যতক্ষণ তোমায় ভুলে থাকি বা আমির মুখ চেয়ে তোমার দৃষ্টির ভিখারী সাজি, "আমার" জন্য তোমার কাঙ্গাল সাজি—ততক্ষণই বিকর্ষণ।'

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

পূর্ব্বে আমি প্রাণ বলিলে কাহাকে বুঝায়, তাহা বলিয়াছি। তোমার প্রাণগ্রন্থি উপলব্ধি করিতে হইলে সত্যপ্রতিষ্ঠার সাহায্যেই করিতে হইবে, ইহা বলিয়াছি। সত্যবোধ না হইলে প্রাণ তাহাতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে পারে না। সত্যবোধের দ্বারা অনুভূতিক্রিয়া এবং অনুভূতিক্রিয়ার দ্বারা বোধসত্তা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে গেলে যে গগনবৎ প্রকাশ অন্তরে উদয় হয়, সেই আকাশই ক্রমে ক্রমে স্বচ্ছ হইয়া অনুভূতিময় অন্তরাকাশ প্রকাশ করিয়া দেয়।

ইহাই আমার প্রকৃত অন্তরত্ব, এইরূপ বোধ ফুটিলে তবে বুঝিতে হইবে, অন্তরাকাশ ফুটিতেছে। কিন্তু সেরূপ অন্তর-বোধ আসিলেও তখনও বুঝিবে, ঠিক হয় নাই—কেন না, যত ক্ষণ না তুমি তাঁহাতে একান্ত মুগ্ধ হইয়া যাও স্বেচ্ছায় প্রকৃত রূপে সুখ দুঃখ, আত্মরমণ প্রভৃতি আপনাতে প্রকাশ করিতে পার, স্বেচ্ছায় শব্দ স্পর্শাদি আপন অন্তরে ভোগ করিতে পার, স্বেচ্ছায় আপন প্রাণকে বিভক্ত করিয়া অথবা দীপ হইতে দীপান্তর প্রজ্বালনের মত আপন প্রাণ হইতে অন্য প্রাণকে অথবা অন্য কোন কিছুকে প্রাণময় করিতে পার, ততক্ষণ বুঝিবে, প্রাণে তোমার অধিকার আসে নাই; তুমি প্রাণকে লাভ কর নাই। কিন্তু তত দূর হইবার পূর্ব্বে তাঁহাতে ঐকান্তিক

অকৃত্রিম মুগ্ধতা যদি ফুটিতে থাকে, তবে বুঝিবে, প্রাণ লাভের পথেই তুমি অগ্রসর হইতেছ।

সেই জন্য এই প্রাণকে উপাসনার দ্বারা আপনার করিয়া লইতে হয়। সে উপাসনা কি? বলিয়াছি, ব্রহ্মভাবে সেই প্রাণকে দর্শন। তিনিই যে অন্তর বাহিরে অবস্থিত, এই ভাবে তাঁহাতে বার বার সত্যপ্রতিষ্ঠা করা আর সেই জগৎমোহনে মুগ্ধ হওয়া। প্রাণে সত্যপ্রতিষ্ঠা করাই এই মুগ্ধতা তোমায় আনিয়া দিবে।

তবেই দেখ, সত্যপ্রতিষ্ঠার মত প্রাণপ্রতিষ্ঠাও অন্তরে ও বাহিরে করিতে হইবে। আর অন্তরে করিবার সময় সেই অন্তরের প্রাণই যে বাহ্য বিরাট্ প্রাণ, ইহা ধারণা করিবে এবং বাহিরে করিবার সময় সেই বাহিরের প্রাণই যে তোমার অন্তরস্থ প্রাণ, ইহা দেখিবে। যিনি তোমার বাহিরে প্রাণময় প্রেমময়, সর্ব্ব-শ্রীসম্পদ্ময় বিষ্ণু, তিনিই তোমার অন্তরে প্রাণময়, প্রেমময়, সর্ব্ব-শ্রীসম্পদ্ময় বিষ্ণু। যিনি বাহিরে জীবনসত্তা, তিনিই তোমারও জীবনসত্তা। যিনি বাহিরে লীলাময়, মায়াময়, বংশী-ধারী, বৃন্দাবনের নটবিহারী, তিনিই তোমার প্রাণেও লীলাময়, মায়াময়, বংশীধারী, তোমার এ দেহ-বৃন্দাবনে নটবিহারী। যিনি বাহিরে, ভূমি, অপ্, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহংকাররূপ অষ্ট প্রকৃতি লইয়া এবং জগৎসবিত্রী জীবভূতা চিৎশক্তিরূপা অন্য পরা প্রকৃতি লইয়া রাসলীলায় মত্ত, তিনিই তোমার অন্তরে ওই অষ্ট তত্ত্বরূপা প্রকৃতি ও তোমাকে লইয়া রাসলীলাময়। এই ভাবে উভয়তঃ তাঁহাকে ধরিবে।

শোন, তুমি যদি কোন দেবতার উপাসক হও, তবে সেই দেবতা যে তোমার প্রাণই, ইহা ধারণা করিবে। কালী, কৃষ্ণ, শিব, যে মূর্ত্তি লইয়াই তুমি উপাসনা কর, সেই মূর্ত্তিকেই আমি প্রাণ-দেবতার যেরূপ বর্ণনা করিয়াছি, সেইরূপ প্রাণময় বলিয়া ধারণা করিবে। সেই প্রাণই ওই মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া তোমার সাধের সাথী হইয়া রহিয়াছেন, বিশ্বময় হইয়া রহিয়াছেন, এই ভাবে তোমার প্রাণকে দেখিবে। অথবা যদি কোন মূর্ত্তির উপাসক না হও, তবে মাত্র স্বরূপ বা স্বসত্তা লইয়াই উপাসনা-তৎপর হইবে। ইহাতে কোন ফলের তারতম্য হইবে না। মূর্ত্তি লইয়া ধারণা করিতে অভ্যাস করিলে ঠিক্ প্রাণের ধারণা না হইয়া একটী মূর্ত্তিই স্ফুটতর হইবে, এ আশঙ্কা করিও না। মূর্ত্তি লইয়া করিতে পারিলে তাহা দুই দিকেই তোমার সহায়তা করিতে পারে। যদি মাত্র স্বস্বরূপপ্রার্থী হও, আত্মতত্ত্বসন্ধানপরায়ণ হও, তবে সে মূর্ত্তিটী লীন হইয়া গিয়া আত্মভাবের প্রকাশটী প্রতিষ্ঠিত হইবে। অথবা যদি তাঁহাকে কোন বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইতে দেখাই তোমার লুব্ধ জ্ঞানের পিপাসা হয়, তবে জীবন্ত মূর্ত্তিমান হইয়া, তিনি তোমায় দেখা দিয়া, তোমার সাধনার কৃতকার্য্যতা দেখাইয়া দিবেন। ওরে, তোর প্রাণ কল্পতরু। সে জানে তোর তৃষা, সে জানে তোর আকাঙ্ক্ষা, সে জানে তোর শক্তি বা তপস্যার বল। তোর তৃষা সে যে আপনার তৃষারূপেই অনুভব করে—তোর ক্ষুধা সে তার নিজের ক্ষুধা বলিয়া বোধ করে—তোর দুঃখ তারই বুকে শত দুঃখের

ঝঞ্ঝাবাত সৃজন করে, তোর সুখ তারই মুখে শুভ আনন্দের দীপ্ত হাস্য আঁকিয়া দেয়। তুই কাঁদিলে সে-ই কাঁদে, তুই হাসিলে সে-ই হাসে—সে তোকে ছাড়া কিছু জানে না--জানে না; জানিয়াও জানে না—সে যে তোতে আত্মভোলা। তোর বুকে সে শুধু তোরই—তোরই—অন্য কাহারও নয়। তুই কি দেখিস না রে, তোর শরীর অবসন্ন হইলে, ক্লান্তিতে তোর মুখ মলিন হইলে, কেমন করিয়া সে আপনার লীলা ভুলিয়া, তোকে বুকে ধরিয়া, নিদ্রার শান্তিতে তোকে মগ্ন করে—আর আপনি অনিমিষ নয়নে চাহিয়া চাহিয়া অপেক্ষা করে, তোর ক্লান্তির পর্য্যবসান যতক্ষণ না হয়। তুই কি জানিস না, তোকে প্রভাতের নবীন জীবনের ক্ষেত্রে জাগ্রত করিয়া দিয়া তোকে বলে, দাও আমায় কিছু খাইতে, নচেৎ তোমার শরীব থাকিবে না, দাও আমায় স্নান করাইয়া, নতুবা তুমি বিধৌতমল হইবে না? সে বলে, দেখ আমার শব্দমূর্ত্তি, দেখ আমার মোহন পরশ, দেখ আমার বিচিত্র রূপ, দেখ আমার রস-বৈচিত্র্য, দেখ আমার পুণ্য গন্ধ। তোমার আকাঙ্ক্ষার মত ও সে আকাঙ্ক্ষার ফলের মত বিষয় বাছিয়া তোমার সম্মুখে রাখিয়াছি—ভোগ কর। তুমি জন্ম-জন্মান্তরে যেমন চাহিয়াছ, তেমনই তোমার সম্মুখে বহন করিয়া আনিয়াছি। আর তোমার জাগ্রত অবস্থায় সেই সব ভোগ করিতে করিতে যখন তুমি সুখী হও, তখন সে হাসে, আর যখন বিষয়ের বিষময় জ্বালায় অস্থির হও, তখন বলে,—"আমি সেই জন্য তোমায় সর্ব্বদা এ বিষয়-রূপের ভিতর দিয়া

ডাকি, শুধু আমাকে চাহিতে। প্রিয়তম! কেন আমার দিকে না চাহিয়া ভোগ কর, সেই জন্য এ জ্বালা। তোমার বিষয়-বহের জ্বাল—ও ত প্রকৃতপক্ষে বিষের জ্বালা নহে—ও যে আমার বিরহের তপ্ত শ্বাস—আমার দিকে না চাওয়ায় আমার যে তপ্তশ্বাস উপস্থিত হয়, ও যে তারই আঘাত প্রিয়!”

হাঁ, তোমাকে কেহ কোন বাধা দিলে, কেহ কোন অনিষ্ট করিলে তুমি তাহার উপর যে ঈর্ষা বিদ্বেষ বা হিংসাময় হও, ইহা তোমার প্রীতিময় সুখময় প্রাণেরই বিসদৃশ মূর্ত্তি; তোমার প্রাণ যেমন তাহার উপর বিদ্বেষময় হয়, তেমনই আবার তুমি তোমার প্রাণস্বরূপ দেবতার মুখের দিকে না চাহিয়া যে সব কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর, সে সমস্ত কর্ম্ম হইতে যে পাপ ও দুর্ভাগ্য সূচিত হয়, সেও তোমার প্রাণেরই তপ্ত শ্বাস।

কিন্তু যাক্ সে কথা। তোমার দেবতাকে মূর্ত্তিময়ী করিয়া স্বচ্ছন্দে সাধনা করিতে পার। অথবা মূর্ত্তি না লইয়া তৎসম্বন্ধীয় যে প্রকার তোমার ধারণা আছে, সেই ভাব লইয়াই করিতে পার। তবে মূর্ত্তি লইয়া সাধনায় সজীব বোধটি শীঘ্র ফুটিয়া উঠিতে পারে। কিন্তু ইনিই যে আমার আত্মা, এ ভাবটি ফুটান একটু দুষ্কর হয়। আবার অমূর্ত্ত ভাবের সাধনায় অদ্বৈত-ভাবটির একটু আভাস সহজে পাওয়া গেলেও জীবিত ভাবটি সাধারণ জ্ঞানে সহজে প্রকাশ পায় না। এই জন্য যে দিক্-দিয়াই সাধনা কর না কেন, আগে বিশেষ করিয়া ধারণা করিয়া লইবে, তুমি কি দেখিতে চাহিতেছ। তোমার অন্বেষ্য প্রাণ,

প্রাণময় দেবতা, প্রাণগ্রন্থির ইহাই সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্যের ধারণা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখাই প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

যেমন সত্যবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সত্যপ্রতিষ্ঠা, তদ্রূপ মায়াময় মোহন প্রাণবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই প্রাণপ্রতিষ্ঠা। সত্যকে প্রাণরূপে বোধ করাই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা। প্রাণকে বোধ করা, প্রাণে বিচরণ করা, প্রাণের তৃষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রাণের মহিমা বা প্রাণ বলিয়া সমস্তকে দেখা, ইহাই প্রাণ-প্রতিষ্ঠার অনুশীলন।

সত্যপ্রতিষ্ঠার কথা বলিতে যে আত্মীয়-বোধের কথা বলিয়াছি, তাহা প্রাণদর্শনের অন্তর্গত। কিন্তু প্রাণ দর্শনের সময় তাঁহার মাত্র ক্ষুদ্র ভাবটী লইয়া মত্ত হইবে না। প্রাণ তোমার অনুভূতিতে আবির্ভূত হইলে তাঁহাকে সর্ব্বভূত-মহেশ্বর বলিয়া ধারণা করিবে। না করিলে তাঁর অবজ্ঞা করা হয়। তিনি গীতায় বলিয়াছেন—মানুষী তনু আশ্রিত আমাকে জীব, সর্ব্বভূতমহেশ্বর বলিয়া না জানিয়া অবজ্ঞা করে।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা নিত্য কি ভাবে করিবে, আমি তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। সাধারণ ভাবে সর্ব্বদা তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। প্রত্যেক কর্ম্ম যে প্রাণেরই সেবা হইতেছে, প্রাণই যে প্রতিকর্ম্মে বেদনময় হইতেছেন, ইহা দেখিতে হইবে এবং বেদনময় হইতে হইবে। ইহাই প্রকৃত কর্ম্মসমর্পণ। শুধু মুখে তোমারই কাজ করিতেছি বলিলে চলিবে না। তদাকার অনুভূতি ফুটাইয়া তুলিবে। আপনার আহার

বিহার স্নান সমস্ত কর্ম্ম, সাক্ষাদ্‌ভাবে তাঁহার তৃপ্তি বিধান করিতেছে, ইহা প্রাণোপাসক সর্ব্বদা উপলব্ধি করে। তোমরা বিষয় ভোগে যে তৃপ্তি পাও, সে তৃপ্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হয়—যদি প্রাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, তাঁহার সেবা বলিয়া সেগুলি ভোগ কর।

মনে কর, তুমি স্নান করিতেছ। সেই স্নানের সময় তুমি যদি অন্তরস্থ সেই প্রাণময় আত্মাকে স্নান করাইতেছ, তোমার অঙ্গে সলিল সিঞ্চন করিতেছ না—তোমার অন্তরকেই অভিস্নাত করিতেছ, তোমার অন্তর-দেবতার অঙ্গ পরিমার্জ্জিত করিতেছ, এরূপ অনুভব করিতে পার, তবে দেখিবে, সে স্নানে কি মহা-স্নান অনুষ্ঠিত হইতেছে। আবার সেইরূপ স্নান করাইবার সময় সেই তোমার স্নানের বারিকে সাধারণ বারি জ্ঞান না করিয়া, তাহা সমুদ্র, গঙ্গাদি পবিত্র নদী অথবা ব্যোমগঙ্গাদির বারি কিংবা কোন পুণ্যগন্ধময় বারি বলিয়া ধারণা করিলে তোমার অন্তর্য্যামীর সেইরূপ বারিতেই স্নান অনুষ্ঠিত হইবে এবং সেরূপ বারিস্পর্শের ফল তুমি অবশ্যই লাভ করিবে।

শুধু স্নানে নয়, আহার বিহারাদি সকল কর্ম্মে এইরূপে তাঁহার সেবা করিবে এবং সে সেবায় সাধারণ উপকরণগুলি অসামান্য উপকরণে পরিণত করিয়া লইবে। শাস্ত্রে যে পূজার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে এই সাধারণ পূজার উপকরণগুলি অসাধারণ ভাবিয়া অর্পণ করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু এ সকল সাধারণ ভাব ব্যতীত নিত্য অন্ততঃ একবার

করিয়া বিশেষভাবে তৎকর্ম্মপরায়ণ হইতে হইবে। আর সে কর্ম্মধারা কতকটা এই ভাবে হইবে,—

প্রথম তুমি আসনে উপবেশন করিয়া সত্যবোধের দ্বারা অন্তরাকাশ উপলব্ধি করিবে। যাহার যতটুকু স্বচ্ছ হইয়াছে, সে সেইরূপ স্বচ্ছতা লইয়াই করিতে পারে। তবে যত পারা যায়, সত্যপ্রতিষ্ঠার সাহায্যে আকাশ স্বচ্ছ করিয়া লইবে।

তারপর সেই আকাশকে প্রাণ বলিয়া ধারণা করিবে। প্রাণ বলিতে কি বুঝায়, আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। তোমার সচেতন সত্তাবোধ, সেই সত্তা জীবনময়, জীবন্ত ও পরম-সুখস্বরূপ, প্রীতি ও মমতাময় এবং তিনিই দ্রষ্টা মন্তা ঘ্রাতা শ্রোতা রসয়িতা আর তিনিই তোমার জন্মস্থিতিলয়ের আশ্রয়—তোমার 'অহং'টির একান্ত আশ্রয়। 'আমি' বলিয়া যে বুদ্ধি তুমি সর্ব্বদা অনুভব কর, তাহা সাক্ষাদ্‌ভাবে প্রাণেই প্রতিষ্ঠিত। তিনিই 'অহং' আকার লইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, এইরূপ ধারণা করিবে।

অনুভূতির দুই অংশ আছে—যে অংশে নামরূপগুলি ফোটে, সেই অংশ মন, আর সেই গুণ বা রূপ ফুটিয়া তোমার যে হৃদয়োদ্বেলন হয়, উহাই সাক্ষাৎ প্রাণপ্রকাশ। যেমন পিতা বলিলে পিতার রূপ অনুভব হয় এবং সঙ্গেসঙ্গে পিতৃত্বের বোধে অভিভূত হইয়া তোমরা ভক্তিপ্লুত হও। এই যে ভক্তিপ্লুত হওয়া, ইহাই প্রাণের সাক্ষাৎ প্রকাশ। এইরূপ ভগবান্‌কে যখন ধারণা করিবে, তখন ভগবানে সত্যবোধের সাহায্যে এই

হৃদয়োদ্বেলন উদ্বুদ্ধ করিবে। সত্যবোধ হইলেই ইহা হইতে বাধ্য।

প্রাণ দর্শনের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, তুমি যেরূপ ধারণা করিবে, সেইরূপ বোধ তোমার সমগ্র দেহে বা তোমার সমগ্র অস্তিত্বে ব্যপ্ত হইয়া পড়িবে। অনেক সময় এমন হয় যে, বুদ্ধির এক প্রান্তে ধারণানুযায়ী বোধ হইতে থাকে, কিন্তু বুদ্ধির অন্যাংশে তোমার সাধারণ সত্তাভাব ও অচেতন জগদ্‌ভাবের ছায়া থাকে। যেমন পানা-ঢাকা পুকুরে কোন স্থানে পানাগুলি সরিয়া গেলে একটু জল দেখা যায়, কিন্তু তাহার চারি পার্শ্বে পানা দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ চিত্তাকাশটীর একটী পরিধি প্রকাশ পায়; কিন্তু অন্যান্য বুদ্ধি, অন্ততঃ তোমার নিঁজের অহংবুদ্ধিটি স্বতন্ত্র ভাবে কখনও খুব স্পষ্ট, কখনও বা অস্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান থাকে। এরূপ অবস্থায় বুঝিবে, তুমি বুদ্ধিক্ষেত্রেরই বিবর্ত্তন দেখিতেছ। সে আকাশ অন্তরাকাশ নহে। বাহা দৃষ্টিতে একান্ত নির্ম্মল, গগনতুল্য যে আকাশ দূর হইতে দেখিতে অতি উজ্জ্বল জ্যোতিঃসম্পন্ন, নীলিমার স্নিগ্ধতামাখান—যে আকাশ উদয় হইবামাত্র তোমার সমগ্র তুমিত্বের বোধটুকু তন্ময় হইয়া যাইবে, উহাই যেন তুমি, ঠিক এই প্রকারের বোধ আসিতে থাকিবে, প্রবিষ্ট হইলে যাহা অরূপ প্রত্যক্ষময়, সেই আকাশ উদয় হইলে, তখন বুঝিবে, অন্তরাকাশ নিকটস্থ হইতেছে। ওরে, গগন যেমন 'নিকটে বর্ণহীন—দূরে বর্ণময়, অন্তরাকাশও তেমনই রে! তোমার সর্ব্বদেহের—সমস্ত সত্তা-

বোধের অন্তরে অন্তরে যেন উহাই রহিয়াছে, এইরূপ যখন বোধ হইতে থাকিবে, তখন বুঝিবে, অন্তরাকাশ আগতপ্রায়।

ওরে, অহংবোধ এককালে বিলুপ্ত বা উপাস্যভাবে সহজে পরিণমিত হয় না: অনেক পরিমাণে হইয়া যায়। এবং তখন দ্রষ্টা-দৃশ্য-ভেদ সহজে অনুমান করা যায় না; কিন্তু যতক্ষণ দৃশ্য-বোধ এককালীন গিয়া আপনি আপনাকে জানিতেছ, এরূপ স্বসম্বেদনের ভাব না হয়, ততক্ষণ পূর্ণ চিৎক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হওয়া হয় না।

তা নাই হউক, ক্ষতি নাই। ওই আকাশই যখন দৃশ্যবৎ ভাসিতে থাকিবে, তুমিও আপনাকে কতকাংশে ওই আকাশবৎ বোধ করিবে, তখন তোমার ভূমি পাইয়াছ বলিয়া ধরিয়া লইবে।

তখন তোমার মনে হইবে, যেন একটা আকাশ দ্বারা তুমি সর্ব্বতোভাবে—চর্ম্ম যেমন দেহ আবৃত করিয়া রাখে, তদ্রূপ বেষ্টিত হইয়াছ অথবা তুমিই ওই আকাশ। ইহাকে যোগশাস্ত্রে বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী বলে।

দ্রষ্টা ও দৃশ্যের এইরূপ আংশিক সংমিশ্রণ ভাব ফুটলে, উহা যে জ্ঞানমূর্ত্তি এবং উনিই প্রাণ, সত্য সত্য উনিই প্রাণ, এই ভাব আরোপ করিবে।

প্রাণ তুমি, প্রাণ তুমি। প্রাণ তুমি আমার, প্রাণ তুমি এ বিশ্বের, তুমিই রহিয়াছ, অন্য কেহ নাই, কেহ নাই, শুধু প্রাণময়, চৈতন্যময় আত্মা,—এইরূপে চৈতন্যময় হইতে থাকিবে।

ভেদ করিতে থাকিবে—আকাশের পর আকাশ। প্রাণের অর্থ অনুভব করিতে করিতে যত সত্যবোধে বীর্য্যবান্ হইবে, তত আকাশের পর আকাশ ভেদ হইতে থাকিবে। জড় আকাশভাব ঘুচিয়া তত বোধময়, অনুভূতিময় বা বেদনময় নির্ম্মল গগন প্রকাশ পাইতে থাকিবে। আর তত মনে হইবে, এই আমি—এই যথার্থ আমি।

এইরূপে প্রাণের সান্নিধ্য লাভ করিলে তোমরা অন্তরাকাশচারী জীব হইবে।

ওরে! ওই আকাশে সব আছে রে সব আছে। বাহিরের এই বিশ্ব, এই আকাশ, এই সূর্য্য, এই চন্দ্র, এই সমস্ত মনে করিবামাত্র তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে। সংযত হইয়া থাকিলে তুমি সেই সূর্য্যে, চন্দ্রে প্রবেশ করিয়া, তাহার সমস্ত পরিচয় জ্ঞাত হইতে পারিবে।

কখনও মনে হইবে, আমিই সব হইয়াছি। আমিই সূর্য্য, আমি চন্দ্র, আমিই আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, বিদ্যুৎ, লোক-সকল, যাহা কিছু সব আমি—আমি—আমি।

আবার কখনও মনে হইবে, তিনিই সব—আমি তাঁহাকে দেখিতেছি।

আবার কখন ভোক্তা ভোগ্য কিছু থাকিবে না, শুধু চুম্বকময়, প্রিয়ত্বময়, সুখস্বরূপ, জীবনস্বরূপ, সত্তাস্বরূপ ক্ষণিক অবস্থান ও উদ্বেলনিময় আনন্দের উচ্ছ্বাসে তদ্ভাব হইতে বিচ্যুতি।

আর অধিকাংশ সময় এ ক্ষেত্রের গভীরতা অনুসারে বিক্ষেপ,

গদ্‌গদভাব ও ভাষা, প্রাণোন্মাদকর উল্লাস, কম্পন, লম্ফন, অচল অটল জীবন্ত বোধের প্রকাশ ও তাহার স্ফূর্ত্তিতে অলৌকিক শক্তি ও ভাবের বিকাশ এবং আপনাকে স্বাধীন ও মুক্ত বলিয়া বোধ ফুটিতে থাকিবে।

মনে হইবে; আর কিছু দেখিব না, আর বাহ্য জগতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইব না; তোমাকে এই বক্ষে যেমন পাইয়াছি, এইরূপ বক্ষে ধরিয়া চিরদিন অবস্থান করি। ওগো, তুমি থাক—যেও না গো—যেও না গো—আমি তোমায় ছাড়িব না, আমি তোমায় এ হৃদয় হইতে বাহির করিয়া দিব না, তুমি আমায় তোমার ঐ হৃদয় হইতে বাহির করিয়া দিও না। "মাহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং, মা মাং ব্রহ্ম নিরাকরোৎ।"

আবার বাহিরে যখন সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে করিতে ওই আকাশমূর্ত্তি আবির্ভূত হইবেন, তখন তোমার লম্ফন, আবেগ, লুণ্ঠন, জড়াইয়া ধরিতে যাওয়া, তাঁহার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইবার জন্য উদ্ভ্রান্ত প্রয়াস, বিকট চীৎকার, এই সব প্রবলবেগে ফুটিতে থাকিবে। তোমরা শ্রীচৈতন্যাদি মহাপুরুষের যে ভাবসকলের কথা শুনিয়াছ, তাহা এই প্রাণোন্মেষের বাহ্য লক্ষণ। ওরে, জল অগ্নি বিষ অমৃত জ্ঞান থাকে না তখন, বাহিরের বস্তু অবলম্বন করিয়া প্রাণগ্রন্থি প্রকাশ হইয়া পড়ে।

অবশ্য সত্যপ্রতিষ্ঠার দৃঢ়তা আসিলেই এ সব লক্ষণ প্রকাশ পায়; কিন্তু প্রাণগ্রন্থির প্রকাশেই ইহা অতি নিবিড় ও স্থায়িভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে।

যাহারা মূর্ত্তিবিশেষের উপাসক, তাহারা ইচ্ছা করিলে ওই অন্তরাকাশে তাহাদিগের ঈপ্সিত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। তাহারা ওই আকাশ আবির্ভাব হইবার পর যখন দেখিবে, আকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নাই,—অন্ততঃ কতক পরিমাণে ফাঁকা হইলেও চলিতে পারে—যখন সে নিজেও ওই আকাশ, এইরূপ উপলব্ধি হইতে থাকে এবং সে আকাশের মধ্যেই নিজেকে মগ্ন দেখে, তখন কোন মূর্ত্তি স্মরণ করিবামাত্র সে আকাশ মূর্ত্তিময়ী হইয়া যায়। হয় আপনিও তাহাই হইয়া যায় অথবা আপনি সেই মূর্ত্তিময়ীর অন্তরে থাকিয়াই তাহাকে দেখিতেছে, এরূপ বোধ করে। তখন সেই মূর্ত্তিতে প্রাণ উপাসনা করিতে হয়। তুমি আমার প্রাণ, আমার সাক্ষাৎ প্রাণ তুমি, এই ভাবে করিতে গেলে দুই দিকে চেতন-গতি হইতে পারে,—স্বরূপের দিকে অথবা মূর্ত্তির দিকে। প্রাণ-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে ইচ্ছুক হইলে—তুমি প্রাণ, সাক্ষাৎ প্রাণ, এই ভাবে সে প্রতীকে প্রাণস্বরূপের ভাব আরোপ করিতে থাকিবে। এবং জীবনময়ী মূর্ত্তি দর্শনই তোমার অভিলাষ হইলে, তোমার প্রাণ যে এই মূর্ত্তিই পরিগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতেই বিশেষ করিয়া সত্যপ্রতিষ্ঠা করিবে; অর্থাৎ প্রাণের স্বরূপভাবের যতটা সেই আকাশরূপে উপলব্ধ হইতেছে, তাহার উপর মূর্ত্তি আরোপ করিয়া রাখিবে এবং সেই মূর্ত্তিই যে সর্ব্ব-তত্ত্বময়, শব্দময়, রূপময়, রসময়, গন্ধময়, বাঙ্‌মনোময়, ইন্দ্রিয়ময়, প্রাণময়, এইরূপ ধারণা করিয়া, নিজের ইন্দ্রিয়-সকল তাঁহাতে

আরোপ করিতে থাকিবে। আর ভাবিবে, ইনি প্রিয় অপেক্ষা প্রিয়। বুদ্ধির কতটুকু অংশ মাত্র সেই মূর্ত্তিতে তন্ময় হয় ত হইবে এবং তুমি ও তোমার ইন্দ্রিয়াদিময় সত্তা যেন স্বতন্ত্র একজন, এরূপ বোধ হইতে পারে; কিন্তু তোমার সমগ্র ইন্দ্রিয়াদিই যে তাঁহার ইন্দ্রিয়, তোমাতে অবস্থিত সকল তত্ত্ব যে তাঁহারই তত্ত্বময় প্রকাশ, তুমি আর নাই, তিনিই সর্ব্বেন্দ্রিয়ময় হইয়া রহিয়াছেন, ইহাই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। যে যত অন্তরাকাশে অধিকার লাভ করিয়াছে, সে-ই তত সুচারুরূপে এ ভাবে আপনার জীবন-সত্তা হইতে মন, ইন্দ্রিয় ও সমস্ত তত্ত্ব তাঁহার করিয়া দিতে পারে বা সম্যক্‌ভাবে সে ততই তৎস্বরূপ পরিগ্রহণ করিতে পারে।'

কিন্তু সম্যক্‌রূপে না পারিলেও এই ভাবে সমস্ত তাঁহাতে আরোপ করিতে প্রয়াস পাইবে।

মোট কথা, সর্ব্বতোভাবে প্রাণ হইতে বাহ্য দেহ অবধি অভীষ্ট মূর্ত্তির আকার লাভ করিলেই সেই দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা হয়। ওইরূপ করিতে পারিলে পরমাত্মার ক্ষেত্র হইতে তদ্ভাবীয় শক্তি তোমাতেই বিকাশ পাইতে থাকিবে।

প্রাণগ্রন্থিকে এইরূপ ভাবে নিত্য অনুশীলনময় করিয়া রাখিবে। এইরূপ রাখিতে রাখিতে প্রতিভাজ্ঞান ও তত্ত্বপ্রজ্ঞা উদ্ভাসিত হইবে।

তত্ত্বপ্রজ্ঞা অর্থাৎ তত্ত্ব উপলব্ধি। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ আপনার ভিতরই ধীরে ধীরে অনুভব করিতে থাকিবে।

পরমতত্ত্ব অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপতার বোধ উজ্জ্বলতর হইতে থাকিবে; সংজ্ঞার দ্বারা যাহা কিছু বুঝা যায়, সে সমস্তই যে জ্ঞানেরই বিভিন্ন আয়তন ও হৃদয়েই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত, ইহা দেখিতে পাইবে।

মনে কর, তোমার মৃত পিতার উদ্দেশে তুমি তর্পণ করিতেছ। তুমি অন্তরেই সে পিতাকে দেখিতে পাইবে ও তাঁহার তৃপ্তি বিধান হইতেছে দেখিয়া তুমি পুলকময় হইবে, যদি তোমার এই অন্তরাকাশে এমন অধিকার আসিয়া থাকে যে, পিতৃবোধ আবাহনমাত্র ফুটাইয়া তুলিতে পার। এই হৃদয়ই পিতা মাতা ভ্রাতা সখা গুরু—সকল মূর্ত্তি। এ সকল তোমার হৃদয়েরই ভিন্ন ভিন্ন আয়তন। আর বিরাটেও ওইরূপ আয়তন-সকল বিদ্যমান। বিরাটে পিতৃলোক, মাতৃলোক, সখিলোক প্রভৃতি সমস্ত রহিয়াছে। বিরাট্ হৃদয়েরই ভিন্ন ভিন্ন ওই সকল আয়তন, বিরাটে না থাকিলে আমাদিগের হৃদয়েও থাকিত না। আমরা হৃদয়ে ওই আয়তন ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইলে এই সকল আয়তন বিরাটস্থ উক্তরূপ আয়তনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বা এক ক্ষেত্র বলিয়া তোমার পিতা প্রভৃতির উদ্দেশে কৃত তর্পণে বিরাটে সেই লোক পরিতৃপ্ত হয়।

যেমন ধর্ম্মশালা সর্ব্বসাধারণের জন্য, সকলেই তাহাতে পথের মাঝে আশ্রয় লইতে পারে; কিন্তু সেই ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিতে বা তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে যদি কেহ সাময়িক বা এককালীন কোন প্রকার সাহায্য করে, তবে সেই

সাহায্যকারীর আত্মীয় সে ধর্ম্মশালায় যেমন বিশিষ্ট সম্বর্দ্ধনা পায় ও বিশিষ্ট গৌরব বোধ করে, তদ্রূপ আমাদিগের কৃত শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার দ্বারা পারলৌকিক পথে ওই পিতৃলোকে মৃত আত্মীয়েরা বিশিষ্ট আনন্দ, বিশিষ্ট সংবর্দ্ধনা লাভ করিতে পারেন।

কিন্তু এ সকল কথা এখানে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। শুধু জানিয়া রাখ, তোমার প্রাণ-ক্ষেত্র লাভ হইলেই তোমার ভুক্তি ও মুক্তি, উভয় লাভ হইবার কেন্দ্র লাভ হইল। এ ক্ষেত্রের অন্যতম লক্ষণ স্বাধীন ভাব। সাধারণতঃ মানুষ "আমি" "আমি" করে, কিন্তু কোন্‌টী ঠিক "আমি", ইহা ধরিতে পারে না। এই ক্ষেত্রে সেই "আমি" যেন বাহির হইয়া পড়ে। "আমি" বলিতে "অহং" বুদ্ধির কথা বলিতেছি না। প্রকৃত "অন্তর" বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার উপলব্ধিই এখানকার বিশিষ্ট লক্ষণ। তাহার অন্তর বলিয়া আর কোন আবরণগুপ্ত সত্তা নাই। যত কিছু, সমস্ত বাহির—আর ইনি অন্তর, এইরূপ বোধ হইতে থাকিবে।

এখানে আর একটী উপলব্ধি প্রত্যক্ষীভূত হয়। এখানে প্রবেশ করিয়া যাহা মনে পড়িয়া যাইবে, তাহাই প্রকাশ হইবে। কিন্তু মনে হইবে, উহা ওই অন্তরেই প্রকাশ পাইল; কিন্তু তবু যেন অন্তরের বাহিরে। অনুভূতি হইতে অনুভাব্য প্রকাশ পায়, কিন্তু অনুভূতি ও অনুভাব্য ভিন্ন হইয়া যায়, আর ওই অনুভাব্যটিকে যেখানে দেখিতে পাই, উহাই বুদ্ধি বা মন। পিতার দৃষ্টান্ত দিতেছিলাম। পিতার মূর্ত্তি যেখানে ফুটিল, উহাই মন

এবং পিতৃস্বরূপ যে বোধপ্রবাহ, উহাই প্রাণ। আর সেই প্রবাহ ধরিয়া রাখিতে পারিলেই সে পিতৃমূর্ত্তি প্রাণময় হয়।

ইহা খুব সহজ, যদি অন্তর বা প্রিয়বোধ খুলিয়া থাকে; নতুবা শুনিতে কঠিন বোধ হইতে পারে। যাহা হউক, এই-রূপ অনুশীলন করিতে করিতে তবে প্রাণ-সত্তায় স্থিতিলাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু সে স্থিতি লাভ করিতে হইলে এ প্রাণ বা হৃদয়গ্রন্থির গতি লয়ের পথে লইয়া যাইতে হইবে। সে কথা রুদ্রগ্রন্থি বলিবার সময় বলিব। আর লয়ের পথে গতি তখনই তোমার পক্ষে সম্ভব হইবে, যখন তোমার প্রাণকে পাইয়া প্রাণেই তুমি থাকিতে চাহিবে, অন্য কিছু চাহিবার তোমার বৃত্তি ফুটিবে না। অবশ্য আমি ক্ষণিক লয়ের কথা বলিতেছি না, নির্ব্বিকল্প লয়ের কথা বলিতেছি।

কিন্তু প্রাণগ্রন্থির আর একটা লক্ষণের কথা বলি এই প্রাণগ্রন্থিতে কোন কিছু আবির্ভূত হইলে জীবিতভাবেই আবির্ভূত হয়। যৌবনে স্ত্রী বা পুরুষের যে ভালবাসার অস্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব হয়, উহা এই প্রাণগ্রন্থির প্রবাহ। প্রাণগ্রন্থিতে যে আমায় পরম পরশ দিবে, সে আমাতে জীবন্ত—সজীব—তাহাকে আমি সর্ব্বদা অনুভব করিব, সে আমায় আকর্ষণ করিতেছে, তাহাকে মূর্ত্তিমান্ হইয়া আবির্ভাব হইতে দেখিতে পাইব। তাহার ইঙ্গিত মত চলিতে আমি সহস্র বাধা উপেক্ষা করিব। অবশ্য প্রাণগ্রন্থিতে আকস্মিক অভিভূতির ফলস্বরূপ এরকম হয়। কিন্তু সাধন-পথে এ গ্রন্থিতে প্রবেশ করিলে

প্রাণের জন্য এ প্রাণের গতি প্রাণের অভিভূতি নয়—প্রকাশ।

কোন প্রিয় বস্তু বা প্রিয় ব্যক্তিকে নিকটে পাইলে যেন প্রাণ লাভ করিলে, এইরূপ তোমাদের মনে হয়। সেই অনুভূতিটি ধরিয়া স্বীয় জীবন্ত সত্তার অনুভূতি লক্ষ্য করিবে। সেটি হৃদয়ের সম্যক্ তৃপ্তি, আর সেই সম্যক্ তৃপ্তি তোমার ভৌতিক জীবন বা জীবনের বর্দ্ধক। প্রাণের যে দুই মূর্ত্তির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেই দুইটির ভাবের এইরূপ সমন্বয় করিয়া লইয়া, তাঁহাতেই যে তোমার মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি এবং শব্দ স্পর্শাদি জাত হয়, ইহা ধারণা করিয়া, উহাতে বুদ্ধিযুক্ত থাকিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠার অভ্যাস করিবে। প্রিয়ত্ববোধই প্রাণগ্রন্থির প্রধান অবলম্বন, ইহা ভুলিও না। শ্রুতি সেই জন্য প্রাণকে প্রিয় বলিয়া বিশেষভাবে উপাসনা করিতে বলিয়াছেন। "প্রিয়! আমার জীবন, আমার সর্ব্বস্ব, আমার সত্তা, আমার সকল ব্যথার সমব্যথী, আমার সকল বেদনের আদরকারী, আমার সকল চাঞ্চল্যের দরদী ওগো আমার আদরের কাঙ্গাল, আমার প্রতিদানের মুখাপেক্ষী, ওগো অবহেলায় অবিচল, অগ্রাহ্যেও অনিমিষ দ্রষ্টা, তুমি আমায় বরণ করিয়া লও, বরণ করিয়া লও—" এই ভাবে প্রাণকে প্রাণে প্রতিষ্ঠিত করিবার অভ্যাস করিবে।

———

অন্তরাকাশ প্রকাশ-প্রণালী

নামরূপাদি বাদ দিয়া শুধু থাকাটুকু ভাবিতে গেলে যাহা পাও, সেইটাই আত্মার থাকা এবং তাহাই তোমার জন্মলয়েরও অবস্থানের আশ্রয়, এই ভাবের প্রত্যয়টা ফুটাইয়া বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিলেই তাঁহার অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা হইল বুঝিবে। এই অস্তিত্বের এক দিকে আছ তুমি, আর উহারই অন্য দিকে তোমার উপাস্য। অর্থাৎ বিশুদ্ধভাবে ওইটি ফুটাইয়া তুলিলেই তোমার দেবতার সত্তার যেন দেখা পাইয়াছ, শুধু তাহাতে তাঁহার রূপ, গুণ, ধর্ম্ম বা মহিমা, এইগুলি মাত্র যেন দেখিতে বাকী রহিয়াছে, এইরূপ জানিবে।

তারপর সেই অস্তিত্ব যে বোধময়, এইরূপ প্রত্যয় ফুটিলেই "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—আর কিছু নাই, কেহ নাই, ইনিই রহিয়াছেন, এই ভাবে তাঁহার উপর সত্যপ্রতিষ্ঠা করিবে। কিন্তু পূর্ব্বের সত্তা-বোধটি যেন ভাঙ্গিয়া না যায়। আমি বলিয়াছি, উহাই তোমার সমস্ত চিন্তা, ভাবনা বা অনুভূতির, এমন কি, তোমার নিজের সত্তার ও অবস্থানের একমাত্র ভূমি। "আর কেহ নাই, আর কিছু নাই, ইনিই রহিয়াছেন, ইনিই রহিয়াছেন" এই ভাবে ইনিই আমার আশ্রয়, এইভাবের সাহায্যে সেইটিকে স্বীয় অন্তরে অখণ্ডভাবে উদ্বুদ্ধ করিবে। এইরূপ করিলে সমস্ত বুদ্ধি তিরোহিত হইয়া গিয়া, মাত্র এক অকাশলিঙ্গ সত্তা উপলব্ধি

হইতে থাকিবে; আকাশমোড়া আকাশের মত নিজেকে বোধ হইতে থাকিবে। ইহা অপূর্ব্ব শান্তিপ্রদ এবং সমস্ত দুঃখ যেন দূর হইয়া গেল, এইরূপ তখন বোধ হইতে থাকিবে।

কিন্তু সকলের তত দূর প্রথমেই হইবে না। খানিকটা আকাশ যেন বুকের ভিতর রহিয়াছে, আর তাহার চারি ধারে যেন অন্যান্য বুদ্ধি ছায়াবৎ রহিয়াছে, এইরূপ বোধ হইবে; যেমন পানা পুকুরে একটু পানা কোনও স্থান হইতে সরাইয়া দিলে চারি ধারে পানার দ্বারা বেষ্টিত একটু জল দেখা যায়, সেই মত আকাশ যেন দেখিতে পাইতেছ, এইরূপ কাহারও কাহারও বোধ হইবে। আবার অনেকেরই প্রথমে উহা যেন চক্ষের সম্মুখে—বাহিরে দেখিতেছি, বুকের ভিতরে নহে, এইরূপ মনে হইবে। যাহা হউক, যথাসাধ্য অন্তরবোধের উপর সত্যপ্রতিষ্ঠার সাহায্যে উহাকে অন্তরস্থ বলিয়া দেখিতে প্রয়াস পাইবে এবং "আর কেহ নাই, অন্য কিছু নাই" এইরূপ সত্যপ্রতিষ্ঠার সাহায্যে এই আকাশকে নির্ম্মল, সর্ব্বান্তর্ব্যাপী ও স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়রূপে আবির্ভূত করিতে চেষ্টা করিবে। বিরাট্ বিশ্বরূপের ধারণা করিতে পারিলেও এই আকাশ আপনি ফুটিয়া উঠে। ইহাই বাহ্য সত্যপ্রতিষ্ঠার সার্থকতা।

যোগশাস্ত্রে এই আকাশকে বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী বলে। এ আকাশ হৃদয়েই ফোটে, এ জন্য ইহাকে হৃদয়াকাশ বলা যাইতে পারে সত্য, কিন্তু যতক্ষণ ইহা দৃশ্যবৎ থাকিবে, ততক্ষণ ইহাকে ঠিক হৃদয়াকাশ না বলিয়া চিত্তাকাশই বলিবে।

হৃদয়াকাশ মাত্র দৃশ্যবৎ থাকে না, দ্রষ্টা দৃশ্য এক হইয়া গিয়া অনাবিল অনুভূতির গগন বিরাজ করে, উহাই প্রকৃত হৃদয়াকাশ। ললাটে মন ও চক্ষু ধারণা করিলে যে তীব্র জ্যোতি ও আকাশ ফোটে, উহা চাক্ষুষাকাশ ও চাক্ষুষ জ্যোতি। উহা তোমাদিগের লক্ষ্য নহে এবং উহাতে তীব্র বেগ দিয়া হঠক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিতে তোমাদিগকে আমি বলি না। কেন না, উহাতে প্রাণসত্তা দুর্লভ হইয়া পড়ে। তবে অবশ্য উহাও চিত্তাকাশ ও পরে চিদাকাশ আনিয়া দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু উহা দেখিবার আবশ্যকতা নাই। কেন না, সময়ে সময়ে উহা করিতে করিতে শিরঃপীড়া দেখা দিতে পারে। অনেকে আজ্ঞাচক্রে বা ললাটে ওইরূপ বেগ দিতে গিয়া শিরোরোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। তবে যাহারা ধীরে ধীরে অভ্যাস করে, তাহাদিগের সহসা আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই। তাহারা আজ্ঞাচক্রে চিত্ত ধারণা করিয়া, জ্যোতি ফুটাইয়া লইয়া, সেই জ্যোতিকে ব্যাপক করিয়া লইতে পারে। অনেকে নাদ অবলম্বন করিয়া জ্যোতি ও আকাশ ফুটাইয়া লয়। আমি বলি, কৃত্রিম হঠ উপায়-সকল অবলম্বন না করিয়া, ভগবদ্‌ভাব প্রণোদিত হইয়া উপাসনা করিতে করিতে হৃদয়াকাশ আবির্ভাব হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও যথার্থ সার্থকতা। নতুবা মাত্র জড় চিত্তাকাশ ফুটিয়া বিশেষ কোন উন্নত ক্ষেত্রে জীবকে পরিচালিত করিতে পারে না। ওরে, "প্রাণের জন্য প্রাণ না কাঁদিলে প্রাণের দেখা পাওয়া যায় না" এ কথা তোরা ভুলিস

না। তবে এই আকাশাদি প্রাণাবির্ভাবের লক্ষণ বলিয়া এগুলির সম্বন্ধে একটু বলিতেছি।

প্রাণায়াম সাহায্যেও এই আকাশকে স্থির ও স্থায়িভাবে ধরিয়া রাখা যাইতে পারে। যখন নিজের অন্তরে আকাশ ফুটিবে, তখন শ্বাস-প্রশ্বাস যেন মেরুদণ্ড অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধ ও নিম্নভাবে যাতায়াত করিতেছে, এইরূপ বোধ করিবে। ইহাতে শ্বাস-প্রশ্বাস স্থির হইয়া আসিবে ও আকাশ স্থায়ী হইবে। পরে, সত্যপ্রতিষ্ঠা হইলে এসব আপনা হইতেই হইতে থাকিবে, ভাবিতে হইবে না। প্রথম অবস্থায় ইহা সহায়ক হইতে পারে।

"স বহুধা ভবতি"

তোমরা সৌভরি মুনির বৃত্তান্ত বোধ হয় অনেকেই জান। তিনি সমাধিভঙ্গে একদিন সংসারী হইবার ইচ্ছা করিলেন। সত্যপ্রতিষ্ঠ পুরুষের প্রাণে যাহা উদিত হয়, তাহা একান্ত সজীব। ইচ্ছা হইলে আর তাহা সম্পন্ন না হইয়া যায় না। সত্যপ্রতিষ্ঠ পুরুষের "কু" "সু" বিচারের অবসর থাকে না। তাঁহার চক্ষে সবই সু। যে ভগবানকে আশ্রয়রূপে পায়, সে কি এ ভগবন্মূর্ত্তি জগতের কোন কিছুতে "কু" দেখিতে পায়? স্বাধীন আপ্তকাম পুরুষের কামনায় যাহা উদিত হয়, তাহাই তিনি পূর্ণ করিয়া লয়েন। সৌভরি দেশের রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"আমি সংসারী হইতে অভিলাষী হইয়াছি। শুনিলাম, আপনার কন্যা আছে, আমার করে আপনার কন্যাকে সমর্পণ করুন।" সর্ব্বনাশ! অনন্ত সুখসম্পদে প্রতিপালিতা কন্যাকে দরিদ্র, কদাকার তপস্বীর করে কেমন করিয়া সমর্পণ করিবেন। অথচ তপঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রত্যাখ্যাত হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ করিতে পারে, সে ত আরও ভীষণ! কূটবুদ্ধি নৃপতি বিশেষ বিবেচনা করিয়া বলিলেন, "আপনার প্রার্থনা পূরণ করিতে পারিলে আমি কৃতকৃতার্থ হইতে পারিতাম; আমার নিজের কোন অমত নাই কিন্তু আশঙ্কা হয়, আমার কোন কন্যাই যদি আপনার সহিত বিবাহে অভিমত না দেয়?" ঋষি হাসিয়া বলিলেন, "সে জন্য আপনার কোন

চিন্তার কারণ নাই—আপনার কন্যাদিগের মধ্যে কেহ যদি আমায় বরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবেই এ পরিণয়-কার্য্য আপনি সম্পন্ন করিয়া দিবেন। অস্বীকৃতা হইলে আমি সন্তুষ্ট-চিত্তে ফিরিয়া যাইব। আপনার সে জন্য কোন আশঙ্কা নাই।”

নৃপতি শ্বাস ফিরিয়া পাইলেন। ভাবিলেন, এ কদর্য্য কঠোর মূর্ত্তি দেখিয়া কন্যাদিগের মধ্যে কেহই ইহাকে পতি বলিয়া বরণ করিতে স্বীকৃত হইবে না।

সৌভরিকে কন্যাদিগের মহলে প্রেরণ করা হইল। ক্ষণ পরে রাজা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কন্যাদিগের আলয়ে গিয়া দেখিলেন, কি আশ্চর্য্য! রাজার কন্যারা, সকলেই সেই ঋষিকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্পা!

একান্ত বিষণ্ণ মনে কন্যাদিগের সানুনয় অনুরোধে রাজা সকল কন্যাগুলিকেই ঋষির করে সমর্পণ করিলেন। বিবাহান্তে ঋষি স্ত্রীগুলিকে অনেক বুঝাইলেন,—দেখ, আমি দরিদ্র গৃহহীন; তোমরা অসীম সুখে প্রতিপালিতা রাজকন্যা, আমার অনুগমন করিয়া অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। রাজদুহিতারা সে কথায় কর্ণপাত করিল না। প্রান্তরে হউক, বৃক্ষতলে হউক, তাঁহার সহিত একত্রে থাকিতে পারিলেই তাহারা কৃতার্থ হইবে।

রাজা সকল কন্যাকেই ঋষির সহিত পাঠাইয়া দিলেন। বনচারিণী কন্যাদিগের কত না দুর্দ্দশা হইতেছে ভাবিয়া রাজা কিছু দিন পরে সৌভরির অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। বহুদূর-ব্যাপী ঘন অরণ্য। সেই যোজনব্যাপী অরণ্যের মধ্যে সৌভরির

আশ্রম, এই মাত্র সন্ধান অবগত হইয়া রাজা অন্বেষণ করিতে করিতে বনের মধ্যে বহুদূর প্রবিষ্ট হইয়া সহসা দেখিলেন, এক প্রকাণ্ড নগরের সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানে কোন ধনজনসম্পন্ন নগর থাকিতে পারে, ইহা রাজার জানাই ছিল না। তিনি জনৈক পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন—সে নগরের নাম কি? সৌভরিনগর—সে কি মহাশয়! আপনি কোন্ দেশ হইতে আসিতেছেন? সৌভরি ঋষির রাজধানী—সৌভরিনগর আপনি জানেন না? রাজা স্তব্ধ! সৌভরি ঋষির রাজধানী—সৌভরি রাজা! বিস্ময়ে ধীরে ধীরে ক্রমে রাজপ্রাসাদের সমীপে গিয়া দ্বারবানদিগকে স্বীয় যথার্থ পরিচয় দিলেন ও পরে তিনি স্বীয় কন্যাদিগের নিকট নীত হইলেন।

এত সমৃদ্ধি—এত সম্পৎসমাবেশ রাজার নিজেরও নাই। রাজা বিস্ময়পুলকে প্রথমা কন্যাকে কেমন সুখে আছে, জিজ্ঞাস করিলেন। কন্যার উত্তর রাজাকে আরও বিস্মিত করিল। ঋষির গৃহে আসিয়া অনন্ত সম্পদের, অনন্ত সুখের অধিকারিণী হইয়াছি, ঋষি সর্ব্বাপেক্ষা তাহাকেই প্রীতির চক্ষে দেখেন ঋষির বিবাহ অবধি আর তপস্যাদি কিছুই নাই, দিবানিশি ঋষি তাহারই মহলে অবস্থান করেন। সে কন্যাটির বড় দুঃখ, সে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও ঋষিকে একদিনের জন্যও তাহার অন্য ভগ্নীদিগের নিকট পাঠাইতে পারে না। তাহারও অবসর হয় না যে, নিজে গিয়া দেখিয়া আসে। ঋষির এ অবিচারে সে ভগ্নীগুলি কত মর্ম্মাহতা!

রাজা দ্বিতীয় কন্যার মহলে গেলেন। এ কি ! তাহারও কাহিনী ওই একই। সে অনন্ত সুখে আছে ; কিন্তু এক দুঃখ— ঋষি তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন ; তাহার নিকট হইতে এক দিনের জন্যও অন্য ভগ্নীর গৃহে পদার্পণ করেন না ! তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, একে একে সকল কন্যার সহিত রাজা সাক্ষাৎ করিলেন। ওই একই সৌভাগ্যের কথা, একই দুঃখের কথা। এ কি বিস্ময়কর কাহিনী ! এ কি ঋষির অপূর্ব্ব মহিমা ! একা সৌভরি সকল কন্যার গৃহে সর্ব্বসময়ে উপস্থিত ! প্রত্যেকের প্রতি সম অনুরাগময়, প্রত্যেকের নিকট একই সময়ে। একজনের নিকট যখন আহারে ব্যাপৃত, অন্যের নিকট তখন হয় ত স্নানরত। অন্যের নিকট হয় ত আহারান্তে পালঙ্কে বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। অন্যের সহিত হয় ত রঙ্গ-বিলাসে মত্ত আছেন ! এই যে সোভরি ঋষির কাহিনী বলিলাম, পরমাত্মাও ঠিক এইরূপেই বহু হইয়া বিশ্ব রচনা করেন। একা বহু হইয়া, বহুরূপে বিভক্ত হইয়া আপনি আপনাকে ভোগ করেন।

এইখানে একটা কথা বলিব। তোমরা সময়ে সময়ে সাধনা-প্রণালী সম্বন্ধে কতকগুলি জটিল সংশয়ের মধ্যে হয় ত পড়িয়া থাক। কেহ ভাব, যখন একমাত্র তিনিই রহিয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্য কিছু কোথাও নাই, তখন "আমি সেই" এই ভাবে সাধনা করাই ত শ্রেয়ঃ। আমা হইতে অন্য বলিয়া কেন তাঁহারই ধারণা করিব ? এই সম্বন্ধে সাধারণতঃ তিন রকম সংশয় হইতে পারে।

একান্ত ভিন্ন বোধ বা দ্বৈত বোধ, বিশিষ্টাদ্বৈত বোধ অর্থাৎ তাঁহারই শক্তি আমি বা অংশ আমি, কিন্তু তিনি নহি, আর অদ্বৈত বোধ বা আমি তিনি এক ; এই তিন প্রকার ভাবের কোন্‌টি অবলম্বনীয়, এই সংশয়। তোমরা কিছু কর বা না কর, কিন্তু কৌতূহল চরিতার্থ করিবার প্রয়াস তোমাদের প্রায়ই দেখিতে পাই—আর মেধার দ্বারা ও আগ্রহবশে বা কৌতূহলবশে তাঁহাকে জানিতে তোমরা সর্ব্বদাই প্রায় ব্যস্ত হও। প্রকৃত সত্য জ্ঞানে তাঁহাকে স্বীকার করিলে এ সকল আপনা হইতেই মীমাংসা হইয়া যায়। যাহা হউক, এইটুকু জানিয়া রাখ, তত্ত্বতঃ তুমি তাঁহা হইতে কোন রকমেই ভিন্ন নহ। কিন্তু তাঁহার বহু হওয়ার ইচ্ছার সম্যক্ সিদ্ধির জন্য তাঁহার কৃত ইচ্ছা দ্বারা তাঁহাতে থাকিয়াই তাঁহা হইতে তুমি ভিন্ন। তুমি বলিতে তোমার জীবত্ব লক্ষ্য করিতেছি। সুতরাং সাধনা দ্বৈতভাবেই সূচনা করিতে হয়। কিন্তু তাঁহারই শক্তি তুমি এবং তাঁহা হইতে প্রকাশ পাইয়াছ ; সুতরাং ভিন্ন হইয়াও তাঁহাতেই আছ ; এই জন্য বিশিষ্টাদ্বৈত বোধেই সে সাধনা চালনা করিবে। আর সেইরূপ সাধনা করিতে গিয়া একটু উন্নত অবস্থায়, অর্থাৎ সারূপ্য লাভের সময়ে "আমি সেইই" এই ভাবে গিয়া স্বতঃ পৌঁছাইতে থাকিবে। আমি"ই" সেই, এ ভাব প্রথম লইবে না—আমি সে"ই" এইভাবে তাঁহার সত্তায় লয় আপনা হইতে হইবে। তার পর "আমি" এককালীন বিলয় হইয়া গেলে আমি তুমি থাকিবে না, তখন আমি তুমি উপাধিশূন্য আত্মাই রহিয়াছেন, বোধ এইরূপ আকার গ্রহণ

করিবে। উপনিষদে এই জন্য এ সম্বন্ধে অতি চমৎকার ক্রমের আদেশ দেখা যায়,—প্রথম "স এব পুরস্তাৎ স এব পশ্চাৎ...... ......স এব ইদং সর্ব্বং।" তাহার পর "অহমেব পুরস্তাৎ অহমেব পশ্চাৎ............অহমেব ইদং সর্ব্বং।" তাহার পর "আত্মৈব পুরস্তাৎ আত্মৈব পশ্চাৎ.........আত্মৈবেদং সর্ব্বং।" ঋষির অনুমোদিত বোধের এই ক্রম অবলম্বন করিবে। মায়াবাদীরা অহংগ্রহ সাধনায় জোর দিতে বলেন। তাঁহারা মুক্তি সম্বন্ধে কেবল নিগুর্ণ-স্থিতি, এইমাত্র ধারণার পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়। আর সেই জন্য সর্ব্বপ্রকার উপাধিভেদকে অকিঞ্চিৎকর বোধে পরিহার করিয়া "আমি সেই" এই ভাব অবলম্বন করিতে বলেন। কিন্তু তোমরা জানিয়া রাখ, ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্বই নিত্য স্বরূপ। তাঁহার জগৎপ্রকাশরূপ আত্মশক্তি কখন তিরোহিত হয় না। মহিমা প্রকাশ ও মহিমা সংহরণ, ইহাই তাঁহার সনাতন ভাব। সেই ব্রহ্মই যখন তোমাদিগের সাধ্য, আর সাধনার অর্থ যখন সাধ্যকে পাওয়া বা সাধ্যে মিশিয়া যাওয়া, তখন মুক্তি মাত্র নিগুর্ণস্থিতি নহে, ইহা ভুলিও না। সুতরাং তোমরা অহংগ্রহ সাধনা অর্থাৎ আমি তিনি, তিনি আমি, এ ভাবের সাধনা অবলম্বন করিবে না। যতক্ষণ তাঁহা হইতে ভিন্ন, ততক্ষণ পূর্ব্বোক্তরূপে ভিন্ন জ্ঞানে সাধনা করিয়া সারূপ্য-বোধে উঠিতে চেষ্টা করিবে। এবং উঠিলে তখন "অহমেব সঃ" এ বোধ আসিলে, সে বোধে অবস্থান করিবে। কিন্তু সূচনায় সোঽহং ভাব লইবে না। প্রথমে দ্বৈতবোধে আত্মাকে দৃঢ়

প্রতিষ্ঠিত করিয়া, প্রীতি ও মমত্ব আরোপের সাহায্যে তাঁহাকে আপনার করিয়া লইবে বা বিশিষ্টাদ্বৈত বোধে পৌঁছাইবে এবং মমত্ব-প্রতিষ্ঠা একটু ঘনভাবে হইলেই তখন তুমি সেই হইয়া যাইবে। মেধার দ্বারা সোহহং জ্ঞানে উঠিতে চেষ্টা করিবে না, প্রীতির দ্বারা এক হইতে হইবে। কিন্তু দৃষ্টি রাখা আবশ্যক যে, তুমি যখন "স"এর প্রতিষ্ঠা করিবে, তখন সে "স" যেন একান্ত দ্বৈত হইয়া না যায়—আমার অন্তরই বা আমার সত্তাই "স" এই ভাব গ্রহণ করিবে।

দেখ, অনেক সময়ে তোরা রাতারাতি বড়লোক হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িস। যেমন সোহহং সম্বন্ধে বলিলাম, তেমনি হিন্দুর আচার ব্যবহার, জাতি-বিচার প্রভৃতি সম্বন্ধে সব মুছিয়া হঠাৎ ব্রহ্মভাবে উপনীত হইতে চাহিস। তোরা কড়া সামরিক শৃঙ্খলার উপকারিতা মানিস। কিন্তু ধর্ম্মের বেলায় কড়া শৃঙ্খলা মানিতে চাহিস না—ওগুলা কুসংস্কার বলিয়া বাদ দিতে ব্যস্ততা দেখাস্। অজ্ঞতা, আইন অমান্যতার একটা কাটান হইতে পারে না—অথবা আইনের উদ্দেশ্য যাহা, তাহা রক্ষা হইলেও আইনের বাহ্য আকার যাহা, তাহা যেন প্রত্যেকে মানিতে বাধ্য, তেমনই প্রকৃত জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে ত বটেই, এমন কি, পরে পর্য্যন্ত হিন্দুর বিধানগুলির বাহ্য ব্যবহার মানা অতীব কর্ত্তব্য, এ কথা ভুলিস্ না। একটু বাচনিক ও মেধাগত বা চিন্তাপ্রসূত জ্ঞান হইলেই বা একটু সাধনার তৎপরতা-বশতঃ কোন কিছু সামান্য লাভ হইলেই অমনি আর বিধি-

নিষেধের গণ্ডির মধ্যে বড় একটা কেহ থাকিতে চাহে না এবং সেগুলির তুচ্ছতা প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত হইতে অনেককে দেখিতে পাই। আর সেই সকল শিক্ষায় মুগ্ধ হইয়া আমরা সেই রকমের উপদেষ্টাকে মহাপুরুষ করিয়া তুলি, আর অভিনব সোজা রাস্তা বাহির হইয়াছে ভাবিয়া লাফাই। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই সাধু পুরুষের পাদুখানা এত উচু করিয়া তুলিয়া ধরি যে, সাধুর মাথা উল্টাইয়া নীচে নামে। কিন্তু এ সব বাজে কথা থাক। এবার প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুশীলনের কথা বলি।

———

প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুশীলন

প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুশীলন করিতে হইলে প্রাণতত্ত্বের সহিত সারূপ্য লাভ করাই একমাত্র প্রধান লক্ষ্য। মুক্তির সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সাযুজ্য নামে যে চারিটি অবস্থার কথা বলিয়াছি, কোন তত্ত্বে আপনাকে বা আত্মাকে তন্ময় করিতে হইলে ঐ চারিটি ক্রমই পর পর ফুটাইয়া তুলিতে হয়। অথবা সত্যপ্রতিষ্ঠার সাহায্যে ঐ চারিটি ক্রমই পর পর ফুটিতে থাকে। মনে কর, তুমি জলের সহিত তন্ময়তা লাভ করিতে চাহ অথবা রসতত্ত্ব জয় করিতে চাহ। তোমার প্রথম সত্যজ্ঞানে বোধ করিতে হইবে, একমাত্র জলই বিরাজমান রহিয়াছে অর্থাৎ জলেরই বিশ্বরূপত্ব সত্যবোধে ধারণা করিতে হইবে। তখন প্রথম তোমার এই উপলব্ধি হইবে, যেন জলই লোক এবং সেই লোকেই তুমি অবস্থান করিতেছ। আর কিছু নাই: শুধু জল—জল—জল। ইহাই তোমার জলের সহিত সালোক্য লাভ বলিতে পার। এইরূপ করিতে করিতে উক্ত ভাব ঘনীভূত হইলে ঐ জল তোমার অন্তরেও অবস্থিত, এইরূপ বোধ অথবা তোমার অন্তরও জলময়, অথবা কল্পনায় বাহিরে সে জলরাশি দেখিতেছিলে, উহা তোমার অন্তরেই বা অন্তরেরই মূর্ত্তি বা তোমার অনুভূতিরই জলনামীয় আকারবিশেষ, এইরূপ উপলব্ধি হইতে থাকিবে। ইহাই তোমার জলের সহিত সামীপ্য

লাভ। এই সামীপ্য লাভের পর জলের শৈত্যাদি ধর্ম্মসকল তোমার অনুভূতিতে ফুটিতে আরম্ভ হইবে এবং সত্যবোধ দৃঢ়তর করিয়া লইয়া তাহাতে নিযুক্ত থাকিলে "আমিও জল" এই ভাবের উপলব্ধি উদ্ভাসিত হইবে। এই উপলব্ধিই জলের সহিত সারূপ্যবোধ এবং এই বোধে থাকিয়া আত্মাকে জলময় করিয়া লইতে পারিলেই বা তাহাতে সমাধিস্থ হইলেই রসতত্ত্ব তোমার প্রজ্ঞায় সমুদ্ভাসিত হইবে। রসতত্ত্বে যাহা কিছু আছে, তখন তাহারই প্রজ্ঞা বা তাহাই লাভ হইতে থাকিবে। তার পর সেই তত্ত্বে এক হইয়া অবস্থানই সাযুজ্য বা লয়।

এইরূপ সকল তত্ত্ব বিষয়েই। কি আত্মতত্ত্ব, কি পদার্থ-তত্ত্ব, যে তত্ত্ব লাভের প্রয়োজন, সেই তত্ত্বেই এইরূপে তোমায় সারূপ্যলাভ করিতে হইবেই। একমাত্র আপনাকে বা আপনার অনুভূতিকে তত্ত্বের সহিত সারূপ্য লাভ করানই তত্ত্বজ্ঞানের ও তত্ত্বজয়ের উপায়। ইহা শুধু আমার কথা নহে, শাস্ত্রও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন।

অবনিজলানলমারুতবিহায়সাং শক্তিভিশ্চ তদ্বীজৈঃ।
সারূপ্যমাত্মনশ্চ প্রতিনীত্বা তত্ত্বদাশু জয়তি সুধীঃ॥
এবংপ্রোক্তৈর্যোগৈরাযোজয়তোহম্বহং তথাত্মানং।
অচিরেণ ভবতি সিদ্ধিঃ সমস্তসংসারমোচনী নিত্যা॥
ইতি যোগমার্গভেদৈঃ প্রতিদিনমারূঢ়যোগযুক্তধিয়া।
সিদ্ধয় উপলভ্যন্তে মুক্তিপুরীসম্প্রবেশনদ্বারঃ॥

ওরে! আমি তোদের এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি, বুঝিবি,

ঋষিদিগের উপদেশও ঠিক তাহাই। এইরূপে প্রাণ বা আত্মার সারূপ্য অনুশীলন করিবি। কম্প, পুলক, আনন্দ, বিমলতা, স্থৈর্য্য, লঘুতা, প্রকাশময়তা এবং প্রজ্ঞাভাস, এইগুলি হইবে তোর সাধনার সিদ্ধির সূচনা। ক্রমশঃ সাধনার ঘনীভূত অবস্থায় তোর ত্রিকালব্যাপী অবিনশ্বর সত্তার উপলব্ধির প্রচেষ্টা, তোর স্থূল-শরীরময় সত্তা উপেক্ষিত হইয়া, জ্ঞানময় ত্রিকালসত্তায় প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠানেচ্ছা, মনোজ্ঞতা বা পরমনজ্ঞান, প্রাণচালন, শ্বাসপ্রশ্বাসহীন অবস্থান, নাড়ীসংক্রমণবিধি অর্থাৎ তোর দেহের সর্ব্বাঙ্গে সকল প্রকার প্রবাহে স্বেচ্ছায় গমনাগমন, দেহ হইতে দেহান্তরে গমন, বাক্‌সিদ্ধি ইত্যাদি শক্তি আসিতে থাকে। এমন কি, অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য এই যোগানুভবরূপ মহা অমৃতরসপানানন্দনির্ভর পুরুষের লাভ হইতে থাকে। কিন্তু সিদ্ধির কথা থাক।

সাধনার একমাত্র উপায় ও উদ্দেশ্য, অনুভূতিকে বা নিজ অনুভবশক্তিকে স্বেচ্ছামত আকারে সারূপ্য দিবার অধিকার; যখন যাহা মনে করিব, তখন তাহাই অনুভব করিব, অর্থাৎ আমার তদাকারীয় অনুভূতি হইবে বা আমার চেতনা তদাকার গ্রহণ করিবে, এই শক্তিটুকু হওয়া চাইই। আর এই সারূপ্য লাভের শক্তি পাইতে হইলে, বিশেষতঃ পরমাত্মা সম্বন্ধে—সত্য-প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজনীয়। কেমন করিয়া এই সারূপ্য লাভের অধিকার পাইতে হইবে, সে কথা "মন্ত্রচৈতন্যে" বিশদ-ভাবে বলিব। এখন। প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুশীলনের কথা বলি।

প্রতীকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে যেগুলি একান্ত প্রয়োজনীয়, আমি সেগুলির কথা আগে বলিতেছি। প্রকৃতপক্ষে দীপ হইতে দীপান্তর যেমন প্রজ্বালিত হয়, এ প্রাণপ্রতিষ্ঠাও সেই-রূপ। কিন্তু আপনি প্রাণময় না হইলে, প্রতীকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যায় না, আর আপনি প্রাণময় হইতে হইলে, আত্মার প্রাণমূর্ত্তিতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সালোক্য সামীপ্যাদি ক্রম অনু-সারে নিত্য সারূপ্যলাভের অনুশীলন করিতে হয়। আর সেই সারূপ্যলাভের উপায়স্বরূপই পূজা-পদ্ধতিতে ভূতশুদ্ধ্যাদির ব্যবস্থা আছে। তত্ত্বসকলকে জ্ঞানে লয় করিয়া, জ্ঞানস্বরূপে সোহহংভাব ফুটাইয়া তোলাই ভূতশুদ্ধির উদ্দেশ্য। কিন্তু যদি প্রাণময় পরমাত্মার সত্যবোধ উদ্দীপিত হয়, তাহা হইলে আপনা হইতেই সালোক্যাদিক্রমে প্রাণময়ে মন প্রাণ মিশিয়া যায়— কোন কৌশল অবলম্বন করিতে হয় না। যাই হউক এই প্রাণময়ের সত্যধারণা করিবার সময় সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে চক্ষুময় বা দর্শনশক্তিময় বলিয়া ধারণা করিতে হইবে। তাঁহার চক্ষুর তলে আমি অবস্থান করিতেছি, আমার অন্তর্ব্বাহ্য সমস্ত তাঁহার নয়নের আলোকে পরিদৃশ্যমান হইয়া রহিয়াছে, এই বোধে সারূপ্য লাভ করিতে অভ্যাস করিবে। প্রতিমাদি পূজার সময় যে চক্ষুদান করার বিধি আছে, তাহার উদ্দেশ্য ইহাই। এই বোধে সারূপ্য লাভ করিতে পারিলে স্বীয় চক্ষুতেই আপনার অন্তর্ব্বাহ্য পরিদৃষ্ট হইতে পারে। আর এই ভগবৎচক্ষুর তলে অবস্থান-রূপ মহা আশ্রয় ও এই স্বীয় অন্তর্দ্দৃষ্টি ফুটাইবার অভিনব যোগ-

কৌশল প্রাথমিকভাবে অভ্যাস করিতে ও ভগবৎসান্নিধ্যবোধ উদ্বুদ্ধ করিতে আমাদিগের আচমন করিবার বিধি আছে। আচমনমন্ত্রের অর্থ ই—আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায় বিষ্ণু বা সূর্য্য-রূপ ভগবৎচক্ষু প্রকাশ পাইয়া রহিয়াছে, এই জ্ঞানে তাঁহার চক্ষুতলে উপনীত হওয়া। আচমনের প্রকৃত অর্থ ধরিয়া যদি কেহ সত্যপ্রতিষ্ঠার সাহায্যে অনুশীলন করে, তবে তাহার অন্তশ্চক্ষু ফুটিয়া যায়—দর্শনশক্তিময় অন্তরাকাশ তাহার অন্তরে প্রকাশ পায়। তাহার পক্ষে প্রতীকে চক্ষুদান করা সহজসাধ্য। যাহা হউক, সারূপ্য সাহায্যে এইরূপে দর্শনশক্তিময় আকাশ ফুটাইবার চেষ্টা করিবি এবং ঐ আকাশ ফুটিলে তাহাতে স্বীয় ইষ্টমূর্ত্তি সঙ্কল্প সাহায্যে আবাহন করিবি। অথবা মূর্ত্তিসাধক না হইলে ঐ আকাশকেই প্রাণময় জ্ঞান করিবি। মূর্ত্তিসাধক হইলে ঐ মূর্ত্তিকেই প্রাণময় জ্ঞান করিবি ও পুনরায় তাঁহাতে সারূপ্য লাভের অনুশীলন করিবি। যাহারা মূর্ত্তিসাধক ও যাহারা প্রতীকে প্রাণসঞ্চালন করিতে চাহে, তাহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সেই মূর্ত্তিকে প্রাণময় করিয়া লইয়া, অর্থাৎ আমি প্রাণের যে স্বরূপের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেই আমার প্রাণই এই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন, এইরূপ ধারণার সাহায্যে আপনি তদাকার হইয়া যাইবি। এইরূপে নিত্য প্রাণমন্ত্রের সাহায্যে আপনি আপনার প্রাণময়ে সারূপ্যলাভের অনুশীলন করিবি।

প্রতীকে প্রাণ সঞ্চালন করিতে হইলে, প্রথমতঃ ঐ ভাবে, প্রাণময় হইয়া, তারপর আপনার পাদদেশ হইতে নাভিস্থল

পর্য্যন্ত দিয়া, অভীষ্ট মূর্ত্তির পাদদেশ হইতে নাভিস্থল পর্য্যন্ত আবদ্ধ করিবি। তারপর নাভি হইতে হৃদয়দেশ পর্য্যন্ত সাহায্যে অভীষ্ট মূর্ত্তির নাভি হইতে হৃদয়দেশ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবি। এবং তারপর কণ্ঠ হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত উভয়ের এক করিয়া, তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছি, এইরূপ ভাবিবি। যতক্ষণ নিজের নিজস্বরূপ জ্ঞান বলবৎ থাকিবে, ততক্ষণ এই ভাবে অনুশীলন করিতে হইবে। "নিজেই তাই" জ্ঞান পূর্ণরূপে ফুটিলে প্রতিমা স্পর্শ করিয়া পুনরায় এই ভাবে অনুশীলন ততক্ষণ করিবে, যতক্ষণ আপনি সেই দেবতা হইয়া তদন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছি, এইরূপ উপলব্ধি না হয়। অথবা পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল, গুল্ফ, জানুদ্বয়, গুহ্যদেশ, কামকলাস্থান বা গুহ্যদেশ হইতে লিঙ্গমূল পর্য্যন্ত স্থান, নাভি, হৃদয়, গ্রীবা, আলম্বিক, নাসা, ভ্রূমধ্য এবং ব্রহ্মরন্ধ্র—এই সকল স্থানে যথোক্তক্রমে সারূপ্য অবলম্বন করিতে প্রয়াস পাইবে। এই ভাবে নিত্য অনুশীলন করিবে। ঐরূপ উপলব্ধি হইবার পর "প্রাণা ইহ প্রাণাঃ, জীব ইহ স্থিতঃ, বাঙমনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্র চৈতন্যময় করিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবে। অথবা চৈতন্যময় মন্ত্র পাঠ করিলেই তোমারই প্রাণ তন্মূর্ত্তিময় হইয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। প্রতিমার অঙ্গস্পন্দন, হৃৎকম্পন, চক্ষে জ্যোতিঃ ও অধরে হাস্য, ইহাই হইবে প্রাণপ্রতিষ্ঠার বাহ্য-লক্ষণ। সত্য-প্রতিষ্ঠা ও সত্যজ্ঞানের সাহায্যে অগ্রসর হইলে এ সকল আপনা

হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এই সমস্ত কথা গুরুর মুখ হইতে শ্রবণ করিলেই উপযুক্ত কার্য্যকরী হইয়া থাকে।

অনুশীলনের জন্য ইহা অপেক্ষা অধিক বলিবার আর আবশ্যকতা দেখি না। প্রতীকে প্রাণ সঞ্চালন করিতে তাহারাই সক্ষম হইবে, যাহারা নিত্য আপনাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুশীলনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সুতরাং নিত্য স্বীয় অন্তরে প্রাণময়ে সারূপ্যলাভে অভ্যস্ত হইয়া ধন্য হও, ধন্য হও। ওরে! প্রাণপ্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত পুরুষ না করিতে পারে, এরূপ কার্য্য নাই। জগৎকে আকর্ষণ করিতে পারে সেই প্রাণময় মহাপুরুষ, প্রাণপ্রতিষ্ঠার কৌশল যাহার আয়ত্ত হইয়াছে।

প্রাণপ্রতিষ্ঠাবিধিরেবমুক্তঃ সাঙ্গঃ সযোগো বিনিয়োগযুক্তঃ।
অস্মিন্ প্রবীণো গিরিকাননাদীন্ প্রচালয়েৎ কিং পুনরাত্মযুক্তান্॥

চেতন ত দূরের কথা। অচেতন পর্য্যন্ত তাঁহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়।

শোন, সত্য সত্যই যেমন করিয়া প্রাণ দিয়া আপনার পুত্রাদিকে ভালবাসিস, নিজের প্রাণকে ঠিক সেই প্রকারে ভালবাসার অভ্যাস করিবি। আর সেইরূপ যখন করিতে পারিবি, তখন বুঝিবি—তোর প্রাণপ্রতিষ্ঠার অধিকার আসিয়াছে। পূর্ব্বে যে স্বীয় পাদাদি হইতে আরম্ভ করিয়া, হৃদয় সাহায্যে শিরোদেশ পর্য্যন্ত সমর্পণের কথা বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্বীয় অন্তরাকাশে আপনি উপাস্যের স্বরূপ হইয়া, তারপর বাহিরে প্রতীকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার কথা বলিয়াছি—আশঙ্কা

করিতে পার যে, নিজে উপাস্য হইয়া গেলে তখন ত আর বাহ্য পূজার সঙ্কল্পাদি স্মরণে থাকিবে না, কেমন করিয়া আবার বাহ্য পূজায় প্রবৃত্ত হইব? না রে—একেবারে তেমন করিয়া সমস্ত সহজে যায় না। খুব উচ্চ অধিকারে সেরূপ হয়। ক্ষণে ক্ষণে সারূপ্যভাব তিরোহিত হইয়া যায়, আবার ক্ষণে ক্ষণে আসে। আবার সর্ব্বোচ্চ অধিকারে, তখন আবার সে সারূপ্য এতই স্বতঃসিদ্ধ হয়, এত স্বাধীনভাবে হয় যে, তখন উপাস্য হইয়াই পূর্ব্বের উপাসনার সঙ্কল্পাদি জাগাইয়া লওয়া স্বচ্ছন্দে যায়। আর ওরূপ যতক্ষণ করা না যায়, ততক্ষণ দ্রষ্টা মাত্র, ততক্ষণ প্রকৃত উপাস্য হওয়া হয় না। ইহাকেই তন্ত্রে উপাস্য লাভ সম্বন্ধে তুরীয়াতীত বা পঞ্চম অবস্থা বলে। যাহাতে সারূপ্য লাভ করিব, তাহার মত স্বাধীনতা লাভ না হইলে সে হওয়া সম্পূর্ণ হওয়া নহে। কিন্তু তত বুঝিবার এখন আবশ্যকতা নাই। এখন যাহা বলি, সেইটুকু লক্ষ্য করা অন্তরে তন্ময় হইয়া, তারপর বাহিরে প্রতিমাদির চক্ষুদান করিবে অর্থাৎ ওই প্রতিমার চক্ষুই তোমার চক্ষু ওই চক্ষু দিয়া অন্তর্বাহ্য সমস্ত দেখা যাইতেছে, এইরূপ সত্যধারণা করিবে। এইটি ঠিক হইলে, অন্তর্ব্বাহ্য এক হইয়া মাত্র দর্শনশক্তিময় প্রাণময় উপাস্য রহিয়াছেন—এই বোধ আসিতে থাকিবে। আর ঠিক সেই সময়ে "আমিই ওই উপাস্য, ওই আমার দেহ; আমি উহাতে প্রবেশ করিতেছি" এই ভাবে ধারণা করিবে বা হইবে। আমি উপাস্য হইয়া সম্মুখে রহিয়াছি, আবার আমিই উপাসক হইয়া উপাসনা করিতেছি। আর সে

"আমি" "জীব আমি" নহি—সেই "উপাস্য আমি"। ইহা হইলেই তোর প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুশীলন হইল বুঝিবি।

জীবন, বাক্, মন, শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণ, ইন্দ্রিয়, সমস্ত ধীরে ধীরে এক এক করিয়া প্রতিমায় ধারণা করিবি। এইরূপে অভ্যাসের সাহায্যে পূজা সত্যের পূজাই হইবে এবং আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করার ও আপনি স্বেচ্ছায় দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশের অনুশীলন হইয়া তোমার মুক্তির আস্বাদ ফুটিয়া উঠিবে।

ইহাতে শুধু সতর্ক হইবি, যেন জীবভাবীয় আমি আসিয়া পূজাকে আসুরিক পূজায় পরিণত না করে।

রুদ্রগ্রন্থি

মন্ত্রচৈতন্য

মন্ত্রচৈতন্য

সাধনায় সত্য সত্য সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে মন্ত্রচৈতন্য অধিকারে আসা চাই। "মন্ত্রচৈতন্য" না হইলে সাধনা পণ্ডশ্রম। সত্যপ্রতিষ্ঠায় এক দিক্ দিয়া যেমন আস্তিক্যবোধ, আশ্রয়াশ্রিতবোধ, আত্মীয়বোধ, আত্মবোধ স্ফুটতর হইতে থাকে, অন্য দিকে তেমনই মন্ত্রচৈতন্য লাভ হয়। মন্ত্রচৈতন্য হওয়া সত্যপ্রতিষ্ঠারই অঙ্গবিশেষ বলা যাইতে পারে। মন্ত্রচৈতন্য না হইলে যে সিদ্ধিলাভ হয় না, একথা তন্ত্রেও বিশেষভাবে বলা আছে। "মন্ত্রচৈতন্য" এই কথাটি সাধক-জগতে খুবই প্রচলিত। কিন্তু মন্ত্রচৈতন্য বস্তুতঃ কি, তাহা সাধারণ সাধক প্রায় জানে না। কথাটিকে সাধন-রাজ্যের একটা মস্ত রহস্য বলিয়া প্রায় সকলে ধারণা করে; একটা কোন কিছু অলৌকিক অভাবনীয় ব্যাপার, এইরূপ মনে করে। কত তপস্যার ফলস্বরূপ যেন এই ব্যাপার সংসাধিত হয়, যেন একান্ত দৈব দানের মত এ জিনিষ সাধক লাভ করে। আর অজ্ঞ সাধকবৃন্দ এই শব্দটির এত রকম কদর্থ করে ও এত অদ্ভুত অদ্ভুত উপাখ্যান এই শব্দটিকে আশ্রয় করিয়া রচনা করে, যাহাতে সাধারণ লোকের মনে হয়, এ যেন এক অতি জটিল দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব এবং সাধারণ গৃহস্থের বা সাধারণ সাধকের ইহাতে কোন অধিকারই

থাকিতে পারে না। যে মন্ত্রচৈতন্য সম্পাদিত হইলে দেবতার আবির্ভাব হয়, সাধকের সকল অভিলাষ সিদ্ধ হয়, মনুষ্য-জন্ম সার্থক হইয়া যায়, সে অমৃতের সোপানস্বরূপ মন্ত্রচৈতন্য—সে কি সুলভ-সিদ্ধ বস্তু?

প্রকৃত পক্ষে মন্ত্রচৈতন্য সিদ্ধির যথার্থ সোপানস্বরূপ হইলেও তত দুষ্কর সাধনাসাপেক্ষ নহে। মন্ত্রচৈতন্য কাহাকে বলে, আগে সেইটি বুঝাইয়া বলি। কথাগুলি একান্ত অভ্রান্তিপূর্ণ করিয়া মনে গাঁথিয়া রাখিয়া দিবে।

মন্ত্র, গুরু ও দেবতার একীকরণের নাম মন্ত্রচৈতন্য। পরিত্রাণ পাইবার জন্য কোন ভাববোধক শব্দবিশেষ মনন করিলে সেই শব্দকে মন্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। ত্রাণের জন্য যাহা মনন করি, তাহাই মন্ত্র। একটি একাক্ষর শব্দই হউক অথবা কতকগুলি শব্দের সমষ্টিই হউক, ত্রাণ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলেই তাহাকে মন্ত্র বলে। এক হিসাবে অর্থবোধক শব্দমাত্রকেই মন্ত্র বলা যায়। শব্দ মাত্রেরই প্রধানতঃ বা অপ্রধানতঃ অর্থ আছে। শব্দমাত্রই কোন না কোন অর্থ প্রকাশ করে। এবং শব্দবিশেষ যখন স্মরণ করি বা শুনি, তখন সেই শব্দার্থ অন্তঃকরণে ফুটিয়া উঠিয়া অন্য ভাবকে তৎক্ষণের জন্য অপহৃত করে। যাহা ভাবিতেছিলাম বা বোধ করিতেছিলাম, তাহা সরিয়া গিয়া, ওই শোনা বা স্মরণ করা শব্দটির ভাব অন্তঃকরণে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ যেন শব্দটী, আমার অন্তঃকরণকে নিবিষ্ট ভাব হইতে উদ্ধার করিয়া—ত্রাণ

করিয়া; অন্য ভাবে—অন্য বোধে ঘুরাইয়া লইয়া যায়। এই হিসাবে শব্দমাত্রকেই মন্ত্র বলা যাইতে পারে।

কিন্তু এ গেল সাধারণ কথা। বিশেষভাবে মন্ত্র সেই-গুলিকে বলে, যেগুলির দ্বারা আমরা ভগবদ্‌বোধে প্রবেশ করিতে পারি বা যে বিশিষ্ট বিশিষ্ট শব্দাদি স্মরণ করিয়া আমরা তাঁহার আরাধনা বা উপাসনা করি অথবা তাঁহার অনুভূতি হৃদয়ে সম্বদ্ধ করিতে প্রয়াস পাই, আর বিশ্বাস করি, যেই-গুলির নিয়মিত স্মরণে পরিত্রাণ লাভ করিব। সেইগুলি মন্ত্র। সর্পাদি দংশনে বা ওইরূপ জাগতিক ব্যাপার সংশ্লিষ্ট অনেক মন্ত্র আছে, যেগুলির কার্য্যকারিতা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। অথচ সে সব মন্ত্র একে উচ্চারণ করে ও অন্যের উপর তাহার কার্য্য হয়। এবং অনেক স্থলে সে সকল মন্ত্র তুচ্ছ শব্দবিন্যাস ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সে-সম্বন্ধে পরে বলিব। আগে সাধন পথের কথা বলি।

মন্ত্র বলে—ওইরূপ শব্দবিশেষকে, আর গুরু বলে—সেই শব্দগত অর্থকে বা জ্ঞানকে। শব্দ উচ্চারণে যে অর্থ মনে ফুটিয়া ওঠে, সেই অর্থটি সেই শব্দের গুরু। গুরু অর্থে জ্ঞান অথবা জ্ঞানদাতা। অজ্ঞানরূপ অন্ধকার হইতে জ্ঞানরূপ আলোকে যে লইয়া যায় বা যিনি লইয়া যান, তাকে বা তাঁহাকে গুরু বলে। জ্ঞানই অজ্ঞানতার নাশক। কোন বিষয়ের জ্ঞান উদয় হইলেই সেই বিষয়ের অজ্ঞানতা দূর হইল বলে। কোন ব্যক্তিবিশেষের উপদেশে যখন কোন বিষয়ের

অজ্ঞানতা আমাদের দূরীভূত হয়, তখন তাঁহার প্রদত্ত সেই উপদেশ বা জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াই আমরা তাঁহাকে গুরু বলি। বস্তুতঃ সেই মানুষকে গুরু বলি না। এই জন্য গুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধি করা নিষিদ্ধ। গুরুকে জ্ঞানময়রূপেই দেখিতে হয়, বুঝিতে হয়, অনুভব করিতে হয়। জ্ঞানস্বরূপ বা জ্ঞানময় পরমাত্মাই একমাত্র গুরু; মানুষ গুরু নয়—তিনিই গুরুপদ-বাচ্য। কোন মানুষের ভিতর দিয়া তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইলে বা গ্রহণের চেষ্টা করিলে, সেই মানুষে গুরুবুদ্ধি আরোপ করিয়া দেখিতে হয়। যেমন শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুবুদ্ধি আরোপ করি সেই রকম। সত্য গুরু তিনিই—তিনি আপনার পথ আপনি দেখান। জ্ঞানই তাঁহার মূর্ত্তি। সেই জন্য উচ্চারিত বা স্মৃত শব্দের অর্থ বা জ্ঞান উদয়ের নাম গুরু উদয় বা গুরু আবির্ভাব। কোন শব্দ মনে আসিলে যদি তাহার অর্থটি সঙ্গে সঙ্গে মনে উদিত হয়, তবেই মন্ত্র ও গুরু এক হইয়াছে বলিতে হয়।

আর দেবতা বলে—সেই জ্ঞানের অনুভূতিকে। প্রকৃত-পক্ষে চিন্ময় আত্মার বিশিষ্টতাগুলিকে দেবতা বলে। চেতনার বিশিষ্ট বিশিষ্ট বিকাশের নাম দেবতা। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন,—তিনি বলেন, আমি অগ্নি, আমি বায়ু, আমি আকাশ ইত্যাদি, আর সেই বলা বা বোধ করাই অগ্নিপ্রভৃতির আবির্ভূতি বা সৃষ্টি। অর্থাৎ তিনি অগ্নি বোধ করেন ও অগ্নি হয়েন। তিনি আকাশ বোধ করেন, আর আকাশ উৎপন্ন হয় বা তিনি আকাশ হন। তাঁহার সেইরূপ বোধকরা-রূপ যে বিশিষ্টতা, নির্গুণ

পরমাত্মস্বরূপের সেই বিশিষ্টতাগুলিই দেবতাপদবাচ্য। জ্ঞানস্বরূপের সেই বিশিষ্ট বিশিষ্ট জ্ঞানায়তনই দেবতা।

পরমাত্মা বোধস্বরূপ বা বোধময়। আর আমরাও অনুভূতিময়। আমাদের যত কিছু গতি—জন্ম, মৃত্যু, নানা যোনি ভ্রমণ, সমস্তই অনুভূতি অবলম্বন করিয়া। অনুভূতি বা অনুবোধ এক কথা। তিনি যাহা বোধ করেন, তদাকারে সম্ভব হয়েন, আর আমরা অনুবোধ করি বা তাহা অনুভব করি। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি আদি অবস্থা তিনি আমাদের জন্য রচনা করেন, আর আমরা তাহা অনুভব করি। ইহা পরমাত্মতত্ত্বের অন্তর্গত কথা। জীবতত্ত্বে আমরা কর্ম্মসূত্রানুসারে গতি লাভ করি সত্য, কিন্তু তাহার উপলক্ষ্য অনুভূতি। অর্থাৎ যাহা অনুভব করি, তাহাই হই। মৃত্যুকালে যেমন অনুভব করি, তেমনি আমাদের পরলোকে গতি হয়, এ কথা শাস্ত্র বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। আর অনুভব করা অর্থে যে তদাকার হওয়া ইহা পূর্ব্বে আমি ভাল করিয়া বলিয়াছি। যাহা হউক, এই অনুভূতির উদয়কে দেবতার উদয় বলে। কেন না, অনুভূতিও বোধ, ইহা চেতনার ধর্ম্ম—চেতনাই। জীব-চৈতন্য সম্যক্‌রূপে যখন কিছু অনুভব করে অর্থাৎ অনুভূতিতে সে অনুভাব্যের স্বরূপ উপলব্ধি করে, তখনই বিরাটে তদাকারীয় চেতনার যে দেবক্ষেত্র বা বিশিষ্টতা আছে অথবা যে দেবতা আছে, সেই দেবতা বা দেবক্ষেত্রের সহিত সে একত্ব লাভ করে—এক হইয়া যায় এবং তখনই সেই দেবতার বা দেবক্ষেত্রের মহিমা

তাহাতে আবির্ভূত হইতে থাকে। এই জন্য অনুভূতি উদয়কেই দেবতার আবির্ভাব স্থূলতঃ বলা যায়। আর মন্ত্রাদি উচ্চারণের সঙ্গে তাহার অর্থ ও অনুভূতি যদি এক সঙ্গে ঘটে, তবেই মন্ত্র গুরু ও দেবতা এক হইয়াছে বলা হয়। ইহারই স্থূলতঃ নাম মন্ত্রচৈতন্য। দৃষ্টান্ত দেই—মনে কর, তুমি আমার মুখে শুনিয়াছ যে, তোমার বাড়ীর নিকটস্থ বৃক্ষে ভূত আছে। ভূত আছে, এই কথাটা শুনিয়া অবধি তুমি মনে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তাহার স্মরণ করিতেছ। আর ভূতের অর্থ তোমার জানা আছে যে, ভূত বলিলেই বিভীষিকাপ্রদ কোন জীববিশেষকে বুঝায়। তার পর তুমি রাত্রে সেই বৃক্ষতলে কার্য্যবশতঃ যেমনি হঠাৎ গেলে, অমনি তোমার মনে পড়িয়া গেল সেই শব্দটা—"ভূত।" আমি সেই গাছের ভূত সত্তাটি বেশ সুস্পষ্ট করিয়া তোমার বুকে আঁকিয়া দিয়াছিলাম। তুমি বৃক্ষতলে যাওয়া মাত্র তোমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল, গলা শুকাইয়া যাইতে লাগিল, বুকের ভিতর কেমন সব জড়াইয়া আসিতে লাগিল, তুমি সভয়ে বৃক্ষের দিকে চাহিতে গিয়া দেখিলে, যেন সত্যই ভূত বৃক্ষে আবির্ভূত! ভয়ে হয় পরিত্রাহি চীৎকার করিয়া উঠিলে, অথবা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে। এই হইল তোমার ভূতানুভব বা "ভূত" মন্ত্রে চৈতন্যযুক্ত হইবার ফল। ভূত শব্দটি যেন মন্ত্র, তৎসম্বন্ধে যে বর্ণনাদি করিয়াছিলাম, তাহা গুরু, আর 'এই যেন সত্যই ভূত বৃক্ষে উপবিষ্ট,' এই অনুভূতিটিই ভূত মন্ত্রের দেবতা। আর একটা দৃষ্টান্ত দেই—"তেঁতুল" উচ্চারণ করিলে, আর সঙ্গে

সঙ্গে তোমার জিহ্বায় রস নিঃসরণ হইল। এটিও বুঝিবে, তেঁতুল অনুভূতি বা তৎশব্দগত দেবতার আবির্ভাব। ভূত ও তেঁতুল শব্দ নিয়া যেমন বুঝিলে, দেবতা সম্বন্ধেও ওইরকম বুঝিবে। মন্ত্রটি উচ্চারণ বা স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে যদি তৎশব্দগত অর্থ ও সেই অর্থানুরূপ অনুভূতি অন্তরে ফুটিয়া ওঠে, তবেই বুঝিবে, তোমার মন্ত্রচৈতন্য হইতেছে। অথবা তোমার চেতনা ঠিক তোমার অভীষ্ট দেবতার বা আত্মমহিমার বা দেবক্ষেত্রের সঙ্গে সারূপ্য লাভ করিতেছে। আর সেইরূপ সারূপ্যে একটু বিশেষ ভাবে অবস্থান করিতে পারিলেই বিরাটের সেইরূপ দেবতার বা দেবক্ষেত্রের বা আত্মমহিমার সহিত সংযোগ ঘনীভূত হয় ও তন্মহিমা তোমাতে প্রকাশ পাইতে থাকে।

মন্ত্রচৈতন্যের লক্ষণ সারূপ্যবোধ,—উপাস্যের স্বরূপে আপনার সত্তাবোধ পরিণত হইয়া যাওয়া। ইহা না হইলে বিশেষ কিছু হয় না—হইবে না। জপই কর, আর কীর্ত্তনই কর, অথবা ধ্যান কর বা পূজা কর—যাহাই কর না কেন, উপাস্যের সারূপ্য তোমায় লাভ করিতেই হইবে। তদ্ভিন্ন সাধনার কোন প্রক্রিয়াই সিদ্ধ হয় না। উপাসনার সকল প্রণালীতেই উহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হয়। পূজা-প্রকরণে যে ভূতশুদ্ধির ব্যবস্থা আছে, সে এই—"সোঽহমিতি বিচিন্তয়েৎ"—এইটুকুই তার সার মর্ম্ম। "শিবো ভূত্বা শিবমর্চ্চয়েৎ, অবিষ্ণুঃ পূজয়েৎ বিষ্ণুং ন পূজাফল-ভাগ্ ভবেৎ"—এই সকল উক্তি ঠিক এই মন্ত্রচৈতন্য-লক্ষিত অনুভূতির উপাস্য-সারূপ্য লাভকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

এই সারূপ্যলাভ অনুভূতিতে আসিলে তবে সাধনায় অধিকার হয়। তার নিম্নে যাহা কিছু, শুধু চিত্তমর্ষণ। আর সেই সারূপ্যানুভূতি বারম্বার নিয়া আসিবার উদ্দেশ্যেই মন্ত্রচৈতন্য একান্ত আবশ্যক। আর এই মন্ত্রচৈতন্যে সিদ্ধ হইবার উদ্দেশ্যেই জপবিধান। মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রচৈতন্যশূন্য মন্ত্র জপে কদাপি সিদ্ধিলাভ হয় না, তন্ত্রে এ কথা বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। চৈতন্যরহিত মন্ত্র অর্থাৎ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে চেতনার তৎসারূপ্য লাভ যদি না হয়, তবে সে মন্ত্র উচ্চারণ কেবল বর্ণ উচ্চারণ মাত্র।

"চৈতন্যরহিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তা বর্ণাস্তু কেবলম্।
ফলং নৈব প্রযচ্ছন্তি লক্ষকোটিজপাদপি॥"

এই মন্ত্রচৈতন্য লাভ করিবার জন্যই অনেক প্রকার প্রক্রিয়ার কথা শাস্ত্রে বলা আছে। তোমার নিশ্চয়ই এমন ভাবে মন্ত্র বা ভগবানের নাম স্মরণ করিবার অধিকার চাই যে, সারূপ্যবোধ স্মরণমাত্রে অন্তঃকরণকে সম্যক্ পরিপ্লুত করে। সত্যপ্রতিষ্ঠার অনুশীলন অর্থাৎ সত্যানুভূতি হৃদয়ে উজ্জীবিত হইলে এ মন্ত্রচৈতন্য অতি সত্বর প্রকাশ পায়। কিন্তু যদি সত্যপ্রতিষ্ঠা না হইয়া থাকে, তবে শাস্ত্রোল্লিখিত পুরশ্চরণাদির দ্বারা বিশেষ কোন ফলই লাভ করিতে পারা যায় না। মন্ত্র-চৈতন্য করিবার জন্য কত অভিষেক পুরশ্চরণ, কত কি আইন মানার মত করিয়াও বিফলমনোরথ হইতে প্রায়ই দেখা যায়। ইহার কারণ শুধু অজ্ঞানতা, শুধু জানিয়া করে না—জানে না, সে কি করিতেছে, কি করিবার জন্য সে ওই সব অনুষ্ঠান

সম্পাদন করিতেছে, কাহাকে পাইবে বলিয়া ? যাহাকে পাইবে বলিয়া এত হাঙ্গামা, সে কি সত্য তাহার আছে ? সত্য আমার প্রাণ, আমার আত্মা—আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, আমার সর্ব্বস্ব সে—সে এই বিশ্বের সর্ব্বস্ব, আমার গুরু সে ; যে এই বিশ্বের গুরু—আমার—সত্যই আমার—সে রহিয়াছে, এই বোধ সত্য হইলে, মন্ত্রচৈতন্য ত হইয়াই রহিয়াছে। তাই বেশ করিয়া মনে রাখিবে, সত্যপ্রতিষ্ঠা না হইলে মন্ত্রচৈতন্য হয় না।

আমি আগে বলিয়াছি, সারূপ্যবোধই মন্ত্রচৈতন্যের লক্ষণ। যাহাকে আমি ভালবাসি, যাহাকে সত্য সত্য আমার প্রাণ চায়, তাহাকে ভাবিতে গেলে যদি প্রাণ তন্ময় হইয়া না যায়, তবে আবার ভালবাসা কি ? যাহাকে প্রাণ চায়, সে সত্য সত্যই তোমার প্রাণ, এই কথা যদি জানা থাকে, তবে কি আর নূতন করিয়া মন্ত্রচৈতন্য করিতে হয় ? চেতনা ত তাহাতেই মগ্ন হইয়া থাকিবে, নিবিড় বুক, নিবিড় আলিঙ্গনে তাহাকেই ত জড়াইয়া রাখে রে ! কোন তুচ্ছাদপি তুচ্ছ কাজও কি জীব করিতে পারে, তার প্রাণের প্রাণকে তাহার অংশীদার না করিয়া ! হায় ! শুধু যদি জীব সত্য করিয়া জানিত—বোধ করিত, তাহারই আত্মাকে সে অন্বেষণ করিতেছে, তাহারই আত্মাই পরম সত্য, যাহাকে পাইবার জন্য আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলে লালায়িত। তাহাত জানে না ; জানিলেও তাহা সত্য বলিয়া ধারণা করে না। তাই এত কথা বলিতে হয়, শুনিতে হয়, এত রকম করিতে হয়। কিন্তু থাক।

শোন। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার ইত্যাদির সমষ্টিকে বলে ব্রহ্মগ্রন্থি বিরাটে ইঁহারই নাম ব্রহ্মা। এইখানে যত কিছু দৃশ্য ফুটিয়া ওঠে, নামরূপ অভিব্যক্ত হয়। আর যেখানে বোধ ফুটিলে তবে নামরূপ ফুটিয়া ওঠে, যেখানে সুখ-দুঃখ, মমতা আত্মীয়তা বা সমস্ত অনুভূতি জাগে, তাহার নাম প্রাণগ্রন্থি বা হৃদয়গ্রন্থি বা প্রাণ বা বিষ্ণুগ্রন্থি। বিরাটে ইনিই বিষ্ণু। এ বিষয়ে আগে বিশদ ভাবে বলিয়াছি। বোধ ফুটিলে তবে মনে তাহার নামরূপ প্রকটিত হয়। এই দুই গ্রন্থির ক্রিয়ার একটা নিদর্শন বলিয়া দিই। মনে বা ব্রহ্মগ্রন্থিতে যাহা ফোটে, তাহা দৃশ্যবৎ হয়। দ্রষ্টা ও দৃশ্য, এই ভাব সেখানে অনুভব হয়, আর বোধগ্রন্থি বা হৃদয়ে এই দ্রষ্টা দৃশ্য ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। সেখানে যাহা ফোটে, দ্রষ্টাই দৃশ্য—আপনিই আপনাকে অনুভব করিতেছি, এই রকম অনুভূতি হয়। যাহাকে চলিত কথায় আত্মরমণ বলে। এই হৃদয়গ্রন্থিতেই মন্ত্রচৈতন্য হয় অর্থাৎ মন্ত্র যদি হৃদয় স্পর্শ করে, তবেই মন্ত্রার্থের অনুভূতি হয় বা মন্ত্রগত দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে বলা হয়। "হৃ" অর্থে আহরণ করা, "দ" অর্থে দান করা, "য়" অর্থে গমন করা বা গতি। যাহা সমস্ত আহরণ করে, আহৃত বস্তুতে আত্মদান করে —প্রাণ দান করে এবং আহৃত ভাব বা বস্তুতে একান্ত ভাবে গমন করে বা তন্ময় হইয়া যায়, তাহারই নাম হৃদয়। এই হৃদয়ই আত্মার নামান্তর। ইহাই বোধক্রিয়ার কেন্দ্র। এবং ইহাতেই সর্ব্বেশ্বর আত্মা বিরাজিত, অথবা ইনিই সেই। ইনিই

তাঁহারই সাক্ষাৎ নিত্য মহিমা—শক্তি বা ইঁহাতেই তিনি প্রতিষ্ঠিত বা তাঁহাতেই এ বোধশক্তির কেন্দ্র নিত্য প্রতিষ্ঠিত। ইঁহাকে শ্রুতি তাঁহার মহিমা বলেন এবং তাঁহার স্বরূপ ও মহিমা বস্তুতঃ একই।

যাহা হউক, মন্ত্র তোমার এমন ভাবে স্মরণ করিতে হইবে, যদ্বারা এই হৃদ্‌গ্রন্থি স্পন্দিত হইয়া উঠে। তবেই তোমার মন্ত্র স্মরণ সার্থক হইবে, জীবন্ত হইবে, আত্মময় হইবে। তোমরা সমস্ত দিন হয় ত "হরি হরি" করিতেছ—লক্ষ লক্ষ সংখ্যা ধরিয়া জপ করিতেছ, আর ভাবিতেছ—এত করিয়া ডাকিতেছি,—কই কিছুইত হইল না! হায়! যদি ওগুলি তোমাদের ব্রহ্মগ্রন্থির ক্রিয়ামাত্র না হইয়া, অন্তরের বা হৃদয়গ্রন্থি বা বোধের ক্রিয়া হইত! অর্থাৎ যদি তোমাদের মন্ত্রচৈতন্যে অধিকার থাকিত! তবে দেখিতে, তোমার প্রতি আহ্বান তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে, তোমার প্রতি স্মরণ তাঁহার চক্ষে অশ্রু নামাইয়া আনিতেছে—তোরই ডাকে সে তোরই বুকে—তোর চাওয়ার মতন হইয়া, তোর কাছে ছুটিয়া আসিতেছে। ঠিক তোর চাওয়ার মত! তোর চাওয়া মিথ্যা, তাই সে মিথ্যারূপেই আসিতেছে। তোর চাওয়ায় আছে শুধু নামরূপ, তাই শুধু নামরূপই তোর ভাগ্যে ফুটিতেছে। প্রাণ থাকিলে প্রাণময় হইয়া ফুটিত, চেতনা থাকিলে চিন্ময় হইয়া দেখা দিত। সে কল্পতরু—ঠিক যেমন করিয়া তাঁহাকে চাহিবি, ঠিক তেমনই করিয়া সে তোর কাছে আসিবে

দশরথ শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপে তিনটি ব্রহ্মহত্যার কারণ হইয়াছিলেন। সেই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তের বিধান জানিতে মহামুনি বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়া, তাঁহাকে না পাইয়া, তাঁহার পুত্র বামদেবকে সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া, যখন দশরথ প্রায়শ্চিত্তের বিধান চাহিলেন, বামদেব তাঁহাকে তিনবার মাত্র রামনাম করিতে বলিয়াছিলেন। যে মহাপুরুষের পুত্ররূপে ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিবেন, সে মহাপুরুষের পক্ষে ইহাই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত, বোধ হয়, এই ভাবিয়াই তিনি ওরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরে বশিষ্ঠদেব গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পুত্রের মুখে সমস্ত শুনিলেন। যখন শুনিলেন, বামদেব তিনটি ব্রহ্ম-হত্যা পাতকের প্রায়শ্চিত্তকল্পে দশরথকে তিন বার রামনাম উচ্চারণ করিতে আদেশ দিয়াছেন, তখন তিনি ক্রোধে পুত্রকে বলিয়াছিলেন,—তুমি চণ্ডাল! যে নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে এমন পাপ ত্রিভুবনে নাই, যাহা হইতে জীব পরিত্রাণ পায় না, সেই নাম তিনবার উচ্চারণ করিতে বলিয়া তুমি নামের মহিমা খর্ব্ব করিয়াছ।

সে কেমন নাম উচ্চারণ? কেমন করিয়া নাম গ্রহণ করিলে নামের এ অমোঘ বীর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়? কোন্-খানে এই ক্লিষ্ট, অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব, তাহার বুকের ভিতর কোথায় এমন অমৃতের কুণ্ড লুকান আছে, যেখানে নাম স্পর্শ করিলে সর্ব্বপাতক-বিদ্রাবী অমৃতের উৎস ফুটিয়া বাহির হইবে? আমার মরা প্রাণে সঞ্জীবনী সুধার স্রোত প্রবাহিত হইবে?

এ বিশুষ্ক মরুতে রসের প্লাবন দিগ্‌দিগন্ত ছাপাইয়া দিবে? এই ত এত ডাকি, এত স্মরণ করি; কই—কই সে সুরধুনীর অবতরণ—সে বিষ্ণুপাদোদ্ভবার পুণ্য-প্রপাত—সে সদ্যঃপাতক-সংহন্ত্রীর সদ্যঃস্নেহোল্লাস?

সেই বিষ্ণুগ্রন্থি—হৃদয়—সাক্ষাৎ বিষ্ণু। ওরে, ভুলিস না—ওই নারায়ণ তোর অন্তরে—বুকে। তোর অন্তর তিনিই, যাঁহার দ্বারাতে তুই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ উপভোগ করিস্, ওই উনিই সেই নারায়ণ। সত্য সত্য যিনি তোর চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ, শ্রবণের শ্রবণ, মনের মন—ওই উনিই সেই নারায়ণ। ওই যিনি ভিন্ন আর দ্রষ্টা নাই, শ্রোতা নাই, মন্তা নাই, বোদ্ধা নাই, ওই তোর অন্তরে ওই উনিই সেই নারায়ণ। যাঁকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও তুই কখনও জানিস্ না,—কেহ কখনও জানে না, যাঁকে না খাওয়াইয়া তুই খাইতে পারিস্ না, যাঁকে না শোয়াইয়া তুই শুইতে পারিস্ না, যিনি কথা না কহিলে তুই কথা কহিতে পারিস্ না, তোর সকল কর্ম্ম, সকল চঞ্চলতা যাঁর সেবা, যাঁর তৃপ্তি, যাঁর রতি, ওই তোর বুকের বোধকেন্দ্র হৃদয়—ওই ব্রহ্মপুর—ওই সেই নারায়ণ। তুই অদ্যাবধি যাহা কিছু করিয়াছিস, পরে যাহা কিছু করিবি,—সকলে যাহা কিছু করিয়াছে, যাহা কিছু করে—করিবে, সব সাক্ষাদ্‌ভাবে ওঁরই তুষ্টিবিধান, ওঁরই জন্য কৃত—উহাঁরই আত্মরমণ। প্রাণপণে আপনার ভিতর ওই হৃদয়ের সন্ধান কর, যেখানে গেলে তুই সে-ই হইয়া যাস, তোর সকল কর্ম্ম সে-ই হইয়া যায়—

সেই ক্ষীরোদার্ণব সত্য করিয়া সত্য প্রতিষ্ঠার সাহায্যে পাইবার জন্য ইচ্ছা কর—ইচ্ছা কর—ইচ্ছা কর। ভাবের কথা বলিতেছি না—অতিরঞ্জিত করিয়া তোদের চিত্ত লুব্ধ করিবার জন্য লিখিতেছি না—সত্য, অতি সত্য। তাঁহাকে অতিরঞ্জন করিয়া বলিবার সাধ্য কাহারও নাই—বলিতে গেলেই কম বলা হইয়া যায়—ছোট করিয়া দেখা হয়। ওই হৃদয় স্পর্শ করুক তোর মন্ত্র—সত্য ধারণা—আকাঙ্ক্ষা,—তোর সকল আশা পূর্ণ হইবে।

মন্ত্র, গুরু, দেবতা এক করিয়া ডাকিতে হইবে। কাহাকে ডাকিতেছ, সে জ্ঞান না থাকিলে মন্ত্র কখনও সজীব হয় না। "গুরুলাভ না হইলে দেবতা লাভ হয় না"—এ প্রচলিত কথার ইহাই মর্ম্ম। জ্ঞানই গুরুমূর্ত্তি, আবার জ্ঞানই দেবতামূর্ত্তি; কিন্তু মনে প্রতিফলিত জ্ঞানকে সাধারণতঃ আমরা জ্ঞান বলি এবং বোধ বা অনুভূতিকে সেরূপ জ্ঞান হইতে যেন স্বতন্ত্র জিনিষ বলিয়া ধারণা করি। কিন্তু বস্তুতঃ উহা শুধু ঘনত্বের তারতম্য মাত্র। যাহা হউক, গুরুলাভ কর—শুধু মন্ত্র, শুধু নাম লইয়া মৃত সাধনা করিস না। সম্যক্ জ্ঞান জিনিষ না পাইলে হয় না, জিনিষ লইয়া ব্যবহার না করিলে তাহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞান লাভ হয় না, এ কথা সত্য; কিন্তু ধারণাকে একান্ত ঘন ও ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য শ্রুত জ্ঞানের বা শ্রবণের বিশেষ প্রয়োজন। সম্যক্ শ্রবণের সাহায্যে ধারণা ঘনীভূত হইলে তাহার অনুশীলন বা ব্যবহার সম্ভবপর হয় এবং সে অনুশীলনের দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞান প্রত্যক্ষে পরিণত হয়। আর সত্য সম্বন্ধে

এই শ্রুত জ্ঞান যখন এমন সম্যক্‌রূপে লাভ হয় যে, তাহা অনুভূতি ফুটাইয়া দিতে সক্ষম, তখনই তাঁহাকে বলে সদ্‌গুরু। অথবা যে পুরুষ সেই ভাবে সত্যের অনুভূতি ফুটাইয়া তুলিবার যোগ্য করিয়া জ্ঞান দেন, তাঁহাকেও সদ্‌গুরু বলে। সদ্‌গুরু লাভ হইলে তবে দেবতার আবির্ভাব হয়, এই জন্যই বলে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সত্যপ্রতিষ্ঠায় যখন আত্মীয়বোধ উদ্ভাসিত হয়, তখন সাধক থাকিয়া থাকিয়া সারূপ্যবোধে চলিয়া যায়। তাঁহাকে ভাবিতে গেলে আপনি তাহাই হইয়া যায়। সত্যপ্রতিষ্ঠার এই অবস্থাতেই বস্তুতঃ মন্ত্রচৈতন্য হয়, মন্ত্র উচ্চারণ মাত্র নিজের "অহং" বোধটি মন্ত্রার্থের লক্ষিত বিষয়ের আকার গ্রহণ করে। দুর্গা বলিয়া সে নিজেই দুর্গা হইয়া যায়; কালী বলিয়া কালী হইয়া যায়; হরি বলিতে হরি হইয়া যায়। প্রাণ বলিতে সে প্রাণময় হয়—সত্য বলিতে সত্যময় হয়। অর্থাৎ তার নিজত্বের অনুভূতিটি উপাস্যের সারূপ্য লাভ করে।

আমি বলিয়াছি, অনুভূতি অনুসারে আমাদের গতি হয়। অনুভূতি যত সামান্যাকারেই হউক, অনুভূতি অর্থেই বোধশক্তির অনুভাব্যের আকার গ্রহণ। অনু পশ্চাৎ ভবতি ইতি অনুভূতি। কোন কিছু মনে হইলেও সামান্য পরিমাণে বোধের এ পরিণাম ঘটে। বোধের পরিণাম না ঘটিলে অন্তঃকরণের কোন ব্যাপারই সংঘটিত হয় না। তবে পরিমাণের বা মাত্রার তারতম্য আছে। আমি যে সারূপ্যের কথা বলিতেছি, সে সম্যগনুভূতি;—হৃদয়গ্রন্থির সম্যগ্‌ভাবে অনুভাব্যের আকার

বাক্যে সত্যপ্রতিষ্ঠা

মন্ত্রচৈতন্য করিবার জন্য বাক্যে সত্যপ্রতিষ্ঠা করিবে। অর্থাৎ যাহা বলিতেছ, তাহা যে সত্য, অতি সত্য, এ ধারণা অবশ্য অবশ্য করিতে হইবে। মন্ত্রে বা মন্ত্রার্থে সত্যপ্রতিষ্ঠা হইলেই মন্ত্রচৈতন্য সম্ভব হইয়া উঠিবে। মন্ত্র সকৃৎ করিবার চেষ্টা করিবে। অর্থাৎ একবার মাত্র উচ্চারণ করিলেই যেন সমস্ত চেতনা তদাকার হইয়া যায়, এই দিকে লক্ষ্য রাখিবে। কিন্তু যত দিন না সে রকম হয়, ততদিন বার বার মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, আর সত্যপ্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রাখিবে। যদি বলি "মঙ্গলময়," তবে যেন "মঙ্গলময়" বলিতে প্রাণটা মঙ্গলে বা মঙ্গলানুভূতিতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, এই দিকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখিবে। আর যতক্ষণ তাহা না হয়, ততক্ষণ "মঙ্গলময়, মঙ্গলময়" বলিতে থাকিবে। প্রাণে আর কোন চেষ্টা তখন রাখিবে না। সাধারণতঃ লোকে তাঁহাকে ডাকিবার সময় এ রকম করে না। তাহারা মুখে বা মনে, মনে যাহা বলে, ভাবিতে থাকে তাহার অন্য। বলিতেছে "মঙ্গলময়," কিন্তু ভাবিতেছে হয় ত তাঁহার রূপাদি; হয় ত চেষ্টা করিতেছে তাঁহার ধ্যান করিতে, তাঁহার মূর্ত্তি বা স্বরূপ বুকের ভিতর ফুটাইয়া তুলিতে; অথবা হয় ত তাহাদের নিজের দুঃখ দৈন্য

ছবির মত বুকে ফুটিয়া, তাহাকে আকুল করিতেছে; সে কাঁদিতেছে ব্যথার মোহে—দৈন্যের স্বপ্নে, অথচ মনে করিতেছে, ভগবানের জন্য তাহার সে ক্রন্দন। লোকেও মনে করিতেছে, তাহার সে ক্রন্দন ভগবদ্‌বিরহে। এ রকম করিয়া মঙ্গলময় বলায় মন্ত্রচৈতন্যের দিক্‌ দিয়া কোন সার্থকতাই বহন করিবে না। যদি বল "মঙ্গলময়," তবে ভাবিতে হইবে শুধু "মঙ্গলময়," শুধু মঙ্গলের ছবি বুকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যদি মূর্ত্তি ফুটাইয়া তোলা কাহারও অভ্যস্ত হইয়া গিয়া থাকে, তবে সেই মূর্ত্তিতেই মঙ্গলের জ্যোতি দেখিতে হইবে। শুধু মঙ্গল—মঙ্গল—মঙ্গলে চিত্তের দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ, আর কিছু নাই—শুধু মঙ্গল। এই ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে তখন তাঁহার হাত আছে, কি পা আছে, কি তাঁহার শক্তি আছে, কি রূপ আছে, কি অন্য গুণ আছে, এ সব কথা প্রাণে উঠিতে পাবে না। শুধু মঙ্গল—মঙ্গল—মঙ্গল। যতক্ষণ না চিত্তটা এই মঙ্গলের অনুভূতিতে ভরিয়া যাইবে, ততক্ষণ "মঙ্গল, মঙ্গল" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। এই রকম সমস্ত মন্ত্রের বেলায়। যখন তাঁহাকে যাহা বলিয়া ডাকিবে, মাত্র সেই কথাটির অর্থে অনুভূতিময় হইবার জন্য প্রয়াস করিবে। অন্য কিছু ভাবিবে না; আসিলে সরাইয়া দিবে। তবেই মন্ত্রচৈতন্য সংঘটিত হইবে, সকৃৎ উচ্চারণে কাজ হইবে। সকৃৎ উচ্চারণ অর্থে একবার মাত্র উচ্চারণ। মন্ত্রচৈতন্যের লক্ষণই—একবার মাত্র উচ্চারণেই চেতনার আবির্ভাব। এ কথা তন্ত্রেও আছে।

মন্ত্রোচ্চারে কৃতে যাদৃক্‌স্বরূপং প্রথমং ভবেৎ
শতে সহস্রে লক্ষে বা কোটিজপে ন তৎ ফলম্‌॥
হৃদয়ে গ্রন্থিভেদশ্চ সর্ব্বাবয়ববর্দ্ধনম্‌।
আনন্দাশ্রূণি পুলকো দেহাবেশঃ কুলেশ্বরি॥
গদ্‌গদোক্তিশ্চ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
সকৃদুচ্চারিতেপ্যেবং মন্ত্রে চৈতন্যসংযুতে॥—কুলার্ণব।

চৈতন্যযুক্ত মন্ত্র উচ্চারণ একবার মাত্র হইলেই যে স্বরূপ প্রথমেই প্রকটিত হয়, বহু বহু জপের দ্বারা সেই রূপ বা সেই ফল লাভ হয় না। স্বরূপের প্রকটন প্রথম উচ্চারণেই হয়—বহু জপের দ্বারা শুধু সেই স্বরূপকে দীর্ঘস্থিতি দেওয়া হয় এবং সেই স্বরূপের আবির্ভূতির যাহা ফল, তাহাই ফলিতে থাকে। কিন্তু স্বরূপাবির্ভূতি প্রথমেই হয়। হৃদয়গ্রন্থি উন্মুক্ত হইয়া যায়, সর্ব্বাবয়ব যেন বিস্তৃত হইতে থাকে, আনন্দাশ্রু, পুলক, দেহাবেশ, গদ্‌গদভাবে কথা—এই সব মন্ত্র উচ্চারণ মাত্রেই সংঘটিত হয়। মৃত মন্ত্র লক্ষ লক্ষ জপেও এ ফল ফলে না।

বাক্যে সত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাকে ডাকা অভ্যাস করিবে—তা জপই হউক, কীর্ত্তনই হউক, আর যাহাই হউক। কি বলিতেছ, সে কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া, তবে বলিবে। জানিবে, বাক্যই বল। বাক্যে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়। বাক্যই বিশ্বের প্রথম অভিব্যক্তি। অনেকে আমার কাছে আসিয়া নালিশ করে,—"ঠাকুর! ধারণা ঠিক রাখিতে পারি না,—কেমন করিয়া সত্যপ্রতিষ্ঠা করিব বা

মন্ত্রচৈতন্য করিব।" ধারণা ঠিক রাখিতে পারিলে আর সাধনার কি বাকি থাকে? ধারণা ঠিক রাখিবার জন্য মন্ত্রাবৃত্তি সজীব নয় বলিয়াই ত ধারণা করিতে পারিস্ না। সজীব হইবার জন্যই মন্ত্রচৈতন্য। ওরে, সত্যপ্রতিষ্ঠা করা মন্ত্রচৈতন্য করা—এ যেন শবসাধনা। তুই মৃত শবাসন। তোর বিষয়-কর্ম্মে জীবনের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সাধন-ক্ষেত্রে তুই মৃত, প্রাণহীন। তোর এই মৃত অহংই তোর মাকে সাধনা করিবার শবাসন। আর এটা শুধু শবাসন নয়—প্রেতাবিষ্ট শবাসন। এটা বিষয়মুখী চাঞ্চল্য নিয়া তোকে বার বার বুক হইতে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিবে—তোকে আসনচ্যুত করিয়া দিতে বার বার প্রয়াস পাইবে। মাকে সত্য করিয়া ডাকিতে থাক—ওটা নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া থাকিবে। ডাকে ফাঁকি থাকিলেই তোকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া যোগভ্রষ্ট করিবে। তাই খুব সত্যবোধে ডাকিতে থাকিবি, সত্যপ্রতিষ্ঠার বা সত্যানুভূতির সাহায্যে মন্ত্র চৈতন্যযুক্ত হইলে মাতৃঅনুভূতি যেমন আবির্ভূতা হইবে বা মা যেমনই উদিতা হইবেন, তখনই দেখিবি, ও আবার চঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। উচ্ছ্বাসের তরঙ্গে ও পর্য্যন্ত জীবন্ত হইয়া পড়িতেছে, আর তোকে মায়ের দিক্ হইতে "স্বার্থকতার" মোহে বাহিরে টানিয়া নিয়া আসিতেছে। অনুভূতি উদয় হওয়াকেই মাতৃ-আবির্ভাব বলিয়া জানিবি—দেবতা বলিয়া ধারণা করিবি—এ কথা, বোধ হয় পূর্ব্বে

বলিয়াছি। সেই অনুভূতি ফুটিতে সুরু হইলেই আমিত্বটার ভাবের একটা অভিভূতি আসিয়া তাহাকে নাচাইয়া দেয়। আনন্দে তখন মাকে ছাড়িয়া, সেই ভাবটার উচ্ছ্বাসেই মত্ত হইয়া পড়িতে হয়। একটু বিশেষ ভাবে প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ভাবের আবেশের সময় ক্ষণে ক্ষণে চকিতের মত যাঁহার জন্য ভাব, তাঁহার উদয় হয়, আর তাহার পরক্ষণেই তাঁহাকে ফেলিয়া, উচ্ছ্বাসটার দিকেই দৃষ্টি বদ্ধ হয়—সেইটারই প্রসাধন করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। আবার সে চেতনার উদয় হয়—আবার ভাব স্পন্দন তাঁহার দিক্ হইতে সাধককে চারের দিকে ঠেলিয়া দেয়। আমিত্বটা নিয়াই সাধক ব্যস্ত হইয়া পড়ে। এইটা কোন ক্রমেই হইতে দিবি না। যেমনি ভাঙ্গিব ভাঙ্গিব হইবে, মন্ত্রোচ্চারণের সাহায্যে অমনি তাঁহাকে স্থির রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইবি। সত্যানুভূতি না ভাঙ্গে—ভাবের উচ্ছ্বাসে তোকে ভাসাইয়া বাহিরে লইয়া না আইসে, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবি।

ডাকিবার সময় সব ছাড়িবি—সব ভুলিবি। ডাকিলে তবে ধারণা আইসে। কিন্তু ধারণা আসিতে সুরু হইলেই তোর কাঙ্গাল প্রাণটা অমনি তাহার ভিক্ষার ঝুলি খুলিয়া বসে—অভাবগুলার দিকে অথবা কৌতুহলের দিকে দৃষ্টি পড়ে; মায়ের দিক্ হইতে ঘুরিয়া আইসে। বড় ছোট—বড় কাঙ্গাল—বড় সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিস তোদের প্রাণকে। সত্যই যে মানুষ সিদ্ধিময় জীবন লাভ করিতে পারে, এ বিশ্বাসই

হৃদয়ে ফুটাইয়া তুলিতে পারিস না। আর সেই জন্যই প্রচেষ্টাও সত্য হয় না। চিত্তগ্রন্থিতে সত্যের অনুভূতি হইলে তবে হৃদয়-গ্রন্থি স্পর্শ করিতে পারিবি—ভেদ করিতে সমর্থ হইবি। তাই সত্য সত্য একজনকে আসিবার জন্য যে ডাকিতেছিস, এটা স্থির জানিবি। আর ধারণা আসিতে আরম্ভ হইলে কোন কিছু প্রার্থনা করিবি না। মায়ের কাছে কিছু না চাহিলে তবে মা জিজ্ঞাসা করে, "তুই কি চাস্?" এ কথা মনে রাখিবি। শুধু কি বলিতেছিস্—সেটা সত্য বলা হইতেছে কি না, এ দিকে দৃষ্টি রাখিবি ; তাহা হইলেই হৃদয়গ্রন্থি খুলিয়া যাইবে।

মন্ত্র, গুরু, দেবতার ঐক্য ও স্থিতি

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, মন্ত্র, গুরু ও দেবতার একীকরণের নাম মন্ত্রচৈতন্য। সাদা কথায় বলিতে হইলে মন্ত্রের মতন চেতন বা বোধ হওয়াটাই মন্ত্রচৈতন্য। কিন্তু মন্ত্রের অর্থ লইয়া যে কাজ করিতে হয়—মন্ত্র বলা উদ্দেশ্যই যে একটা অর্থবোধ বুকে ফুটাইয়া তোলা, এ কথাটা সাধারণ লোকে প্রায় ধারণাতেই রাখে না। সেই জন্যই এত করিয়া বলিতে হয়। গুরুর আদর জানে না—আদর করে না, তাই সাধারণ লোকে দেবতাকেও পায় না। জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই প্রকৃত গুরু, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই গুরু উদ্বোধন করিয়া দেন বলিয়া বাহিরের জ্ঞানদাতা মনুষ্যকেও আমরা গুরু বলি। আর চেতনার বা বোধের বিশিষ্ট বিশিষ্ট আয়তন দেবতাপদ-বাচ্য। যদি সদ্‌গুরু উদয় হন, অর্থাৎ যদি দেবতা-জ্ঞান সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হয়, তবে বোধক্ষেত্রে মূর্ত্তি উপাসকদিগের দেবতা মূর্ত্তিমান্ হইয়া আবির্ভূত হয়েন। আর ওই রকম বিশেষ বিশেষ ভাবে আবির্ভাবের জন্যই পরমাত্মাকে প্রকৃতি অনুযায়ী নানা মন্ত্রে নানা জনে সাধন করে। কিন্তু যে জানিয়া রাখে যে, তার প্রাণের প্রাণকেই, তার আত্মার আত্মাকেই ওই ভাবে ডাকিতেছে, তাহারই আত্মবোধ হয়—আর না হইলে দেবতা উপাসনা হয় মাত্র। তাই আত্মবোধের দিকেই লক্ষ্য

রাখিয়া উপাসনা করিতে হইবে। অন্য দেবতাবিশেষ বুঝিয়া উপাসনা করিলে বিভূতি লাভ হইতে পারে, কিন্তু আত্মজ্ঞানে উপাসনা না করিলে আত্মবোধ প্রবুদ্ধ হয় না। "আত্মেতি উপগচ্ছন্তি গাহয়ন্তি চ।" "আমার আত্মা"—এই ভাবেই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। স্বীয় জীবভাবকে তাদাত্ম্যভাবে লইয়া যাইতে হইবে—আত্মময় হইয়া আত্মাকে লাভ করিতে হইবে। আত্মা হইতে অন্য একজন, এ ভাব থাকিলে আত্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। এই জন্য শ্রুতি বলেন—বিভূতিকামী পুরুষ আত্মজ্ঞের উপাসনা করিবে। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ সম্পদ্—সেই জ্ঞানেই সকল উপাসনার শেষ। "আত্মা হইতে অন্য," এভাব যত দিন থাকিবে, তত দিন বুঝিবে, তোমার সদ্‌গুরু এখনও লাভ হয় নাই। আমি একজন, আত্মা তিনি অন্য আর একজন, এ ভাব তোমার ছাড়িয়া যাইতেই হইবে; এ দূরত্ব—এ ব্যবধান ঘুচাইয়া তোমাকে তাঁহার হইয়া তাঁহাতে মিশিয়া যাইতে হইবে। আর সেটা কিন্তু যেমন খানিকটা জল লইয়া অন্য জলে মিশাইয়া এক করা যায়, তেমন করিয়া হইবে না। সেটা হইবে অন্তরের ভিতর দিয়া। মেধার দ্বারা বা কোন উৎকট প্রচেষ্টা দ্বারা বা ধারণা দ্বারা নহে—প্রাণ দিয়া—প্রাণের ভিতর দিয়া। আগে তাঁহাকে তোমার সাক্ষাৎ প্রাণ বলিয়া বরণ করিতে হইবে; আর সেই বরণের ফলে তোমার আত্মসমর্পণ ওইরূপ সার্থকতায় পর্য্যবসিত হইবে। "আমি তোমার" এ কথাটা পূর্ণ মাত্রায় বলার প্রকৃত

অর্থ—"এ আমিত্বটা তোমারই আমিত্ব। তোমার আমিত্ব ভিন্ন এখানে অন্য আমিত্ব নাই।"

যাহা হউক, গুরু এই প্রকারের মূর্ত্তি লইয়া বুকের ভিতর আসন প্রতিষ্ঠা করিলেই বুঝিবে, তোমার আত্মবোধ আগত-প্রায়। কিন্তু এ আসন অচল-প্রতিষ্ঠ হওয়া চাই। থাকিয়া থাকিয়া ভাঙ্গিয়া যতক্ষণ যাইবে, ততক্ষণ বুঝিবে, গুরু এখনও সুপ্রসন্ন হন নাই।

কিন্তু সাধারণ ভাবে মন্ত্রচৈতন্য করিতেও অর্থাৎ আত্মবোধ না হওয়ায় দেবতা-বোধে তাঁহাকে অজ্ঞতাবশতঃ অথবা সিদ্ধি-বিশেষের আশায় উপাসনা করিতে গেলেও তোমায় তাদাত্ম্য ভাব গ্রহণ করিতে হইবেই।—তবে সেখানেও সত্যবোধ মাত্র উজ্জীবিত হইলেই কাজ হইতে পারিবে। তবে লক্ষ্য রাখিবে, সেই মন্ত্রচৈতন্য করিবার জন্য, যে মন্ত্র তাঁহাকে শক্তিময়, মহিমময় মাত্র বলিয়া তোমায় বুঝাইয়া না দিয়া, তোমার আত্মা বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দেয়, সেই মন্ত্র—সেই গুরু পাইবার ইচ্ছা যেন বলবতী থাকে। তাঁহাকে আত্মস্বরূপে লাভ করাই আত্ম-বোধ লাভ, এ কথা বোধ হয়, বেশ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

অনেককে বলিতে শুনিয়াছি,—"দেখুন, মন্ত্র একটি শব্দ-বিশেষ, আর গুরু একটি মনুষ্যমূর্ত্তি, আর দেবতামূর্ত্তি অন্য প্রকার। এ তিনকে কেমন করিয়া এক করা যায়, তাহা ত ভাবিয়া পাই না। 'দেবতাগুরুমন্ত্রাণামৈক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া'—ঐক্য কেমন করিয়া চিন্তা করি?" এই রকম অজ্ঞতা

অনেকেরই আছে। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে বুঝিতে পারিয়াছ বোধ হয়, ঐক্য করা কাহাকে বলে। দেবতানুভূতি ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, ইহাই মর্ম্ম।

কিন্তু মন্ত্র, গুরু ও দেবতার একীকরণ হইলে অর্থাৎ মন্ত্র উচ্চারণে দেবতানুভূতি প্রবুদ্ধ হইলে, তাহাতে স্থিতি অভ্যাস বিশেষভাবে করিবে। অনুভূতি ফোটান সহজ, কিন্তু তাহাকে ধরিয়া রাখাই আয়াসসাধ্য। সত্ত্বাবোধের তারতম্যে এই স্থিতি স্বল্পাধিককালস্থায়ী হয়। আর স্থিতি একটু অধিক কালব্যাপী না হইলে মূর্ত্তির আবির্ভাব হয় না।

হায় দুর্ভাগ্য! ওরে, আমরা মনে করি, ভগবান্‌কে বড় ডাকিতেছি, তাঁহার জন্য বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছি—কেন যে কৃপা করিতেছেন না, তিনিই জানেন। আমার জীবনটা তাঁহার জন্য শূন্য করিয়া, শ্মশান করিয়া রাখিয়াছি: আমার প্রাণ আর কিছুই চাহে না—শুধু তিনি। তাঁহার জন্য বাসর-শয়ন পাতিয়া পাতিয়া জীবন অতিবাহিত হইয়া গেল—তাঁহাকে পাইলাম না। কিন্তু যখন তোর প্রাণ ক্ষণেকের জন্য তদনুভূতিতে পূর্ণ হইয়া যায়, লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবি, মুহূর্ত্ত—মুহূর্ত্তমাত্র সে ভাবে অবস্থান করিয়া, অমনি পলাইয়া আসে—নামিয়া আসিয়া তবে প্রকৃতিস্থ হয়। ইহা হইতে বুঝিবে, তোমার ভগবৎপ্রাপ্তির ইচ্ছা এখনও প্রকৃতিগত হয় নাই। হইলে এমন করিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া পলাইয়া আসিতে হইত না। কিন্তু যাউক সে-কথা।

মন্ত্রকে বোধে তোমায় ফুটাইয়া তুলিতে হইবে এ কথা

শ্রুতিতেও আছে। ভাবিও না, এ সব মন-গড়া কথা। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"যচ্ছেদ্‌বাঙ্‌মনসি প্রাজ্ঞঃ তদ্‌যচ্ছেদ্‌জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্‌যচ্ছেৎ শান্ত আত্মনি।" বাক্যকে মনে লইয়া যাইবে, মনকে বোধে লইয়া যাইবে, বোধকে মহান্‌ বোধে লইয়া যাইবে এবং মহান্‌ বোধকে শান্ত আত্মবোধে লইয়া যাইবে। বাক্য বা মন্ত্রের অর্থ মনে ধারণা করিয়া বোধ-ক্ষেত্রে লইয়া যাইবে। অর্থাৎ তদাকার বোধ ফুটাইয়া তুলিবে। তাহার পর সেই তাদাত্ম্য বোধ যখন ফুটিতে থাকিবে, তখন তাহাকে মহান্‌ বোধে বা সর্ব্ববুদ্ধি-ব্যাপক ঈশ্বর-বোধে বা সর্ব্বব্যাপী বোধে পর্য্যবসিত করিবে। ব্রহ্মবোধে পর্য্যবসিত করিতে করিতে তবে তোমার তুমিত্বটা এককালে লুপ্ত হইয়া ধোঁয়াকার হইয়া যাইবে। আর যদি দেবভাবের উপাসক না হইয়া আত্মার উপাসক হও, তবে সেই ব্রহ্মবোধ তোমার আত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইবে। অর্থাৎ তাঁহাকে স্বাত্ম-স্বরূপে দেখিবে।—তুমি আত্মা হইয়া যাইবে। অবশ্য দেব-ভাবে উপাসনা করিতে যাইবে না। মূর্ত্তি লইয়া সাধনা করিলেও আত্মারই যে উপাসনা করিতেছ, এই ধারণা ঠিক রাখিবে; তাহা হইলে মূর্ত্তি লইয়াই কর, আর যেমন করিয়াই কর, সব গলিয়া গিয়া এক চিন্ময় আত্মস্বরূপই ফুটিয়া উঠিবে। ওই যে বাক্যকে মনে নিয়া যাইবে, মনকে বোধে নিয়া যাইবে বলিয়া শ্রুতির উপদেশের কথা বলা হইল, আত্ম-উপাসনা লক্ষ্য করিয়া ঋষি ও কথা বলিয়াছেন।

তবে তোমরা স্পষ্ট বুঝিলে, সাধনা করিতে গেলে বোধ-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তোমায় তৎসারূপ্য লাভ করিতেই হইবে—কি তন্ত্র, কি শ্রুতি, এই কথাই বলিয়াছেন। মোট কথা ভাল করিয়া জানিয়া রাখ, বোধগ্রন্থিতে তোমার যাওয়া চাই, হৃদয়-গ্রন্থিতে বা অন্তরে তোমার অধিকার আসা চাই-ই চাই। এ 'অন্তর' কথাটা বলিলে তোমরা ধারণা করিবে না যে, যেন একটা থলির ভিতর গহ্বর, তেমনই আমাদের দেহের ভিতর বা হৃৎপিণ্ডের ভিতর যে গহ্বর আছে, সেই গহ্বরটায় প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। বস্তুতঃ সেই হৃৎপিণ্ডের গহ্বরই স্থূল স্থান হিসাবে অন্বেষ্য হইলেও সেখানে পৌঁছাইতে অন্তরের বৃত্তি ধরিয়া অগ্রসর হইবে। মায়া মমতা, আত্মীয়তা, স্নেহ, সুখ-প্রীতি, বিদ্বেষ, এই সব বৃত্তির কেন্দ্রকে অন্তরক্ষেত্র বলে। সত্তাবোধও অন্তরবৃত্তিবিশেষ। সমস্ত বিশ্ববোধই অন্তর্বৃত্তি। কিন্তু তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত মায়া-মমতা, স্নেহ প্রেম আদির কেন্দ্র-স্বরূপ সেই সত্তাকে অন্বেষণ করিতেছি—আমার অন্তরে, এই ভাবে যাইবার প্রচেষ্টা করিবে। জলের ভিতর একটা সোনা ফেলিয়া দিলে, সে সোনাটা জলের অন্তরে রহিয়াছে বলা যায় সত্য, কিন্তু ঠিক বলিতে গেলে সে সোনা জলের বাহিরেই থাকে। জলজ্ঞানাদি বাষ্পই জলের যথার্থ অন্তরে রহিয়াছে বলা যাইতে পারে। তোমার তুমিত্বের সকল বিকাশের মধ্যে—তোমার অস্থিমাংসময় স্থূল দেহ তোমার নামরূপময় বা চিন্তাময় মনোময় দেহ, তোমার

সুখ-দুঃখাদি অন্তর্ধর্ম্ময় বোধময় দেহ, এই সমস্তের অন্তরে তেমনই তিনি রহিয়াছেন, তোমার প্রত্যেক পরমাণু যেন স্ব স্ব অন্তরে তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে, এমনই ধারণা করিবে। কেন না, তোমার এই যে দেহবোধ, এও বোধের বিকাশ অর্থাৎ বোধের দেহময়ত্বই তুমি বোধ করিতেছ, তুমি তোমার বোধের হাত, বোধের মুখ, বোধের শরীরই অনুভব করিতেছ। তোমার স্থূল শরীর তাহার সে দেহবোধ জাগাইবার উদ্দীপক কারণ মাত্র। আগে এ কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছি যে, আমরা যাহা কিছু জানি বুঝি, সবই বোধের আয়তন। আর সেই জন্য দেহকে ব্রহ্মপুর বলে। এই দেহের হৃৎপিণ্ডের মধ্যের আকাশই অন্তর, সেইখানে বিশ্বেশ্বর—সেইখানে সমস্ত বিশ্ব সমাহিত। "যচ্চাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বমস্মিন্ সমাহিতম্।" যাহা কিছু আছে বা যাহা কিছু নাই, সবই এইখানে—শ্রুতির এই কথা স্পষ্ট করিয়াই দেখাইয়া দিতেছে যে, আমাদের অন্বেষ্যই এই অন্তর। ইঁহাকে পাইলেই সব পাওয়া হইবে। "তস্মিন্ শেতে সর্ব্বস্য বশী ঈশানঃ"—সেই-খানে বিশ্বেশ্বর অবস্থিত। সুতরাং যখন বোধধর্ম্মী আত্মাই অন্বেষ্য বা বোধক্ষেত্রই লক্ষ্য, তখন "জড় দেহের অভ্যন্তরস্থ একটি জড় গহ্বর" এভাবে অন্বেষণ না করিয়া, দেহ-বোধের অন্তর—যেমন পূর্ব্বে বলিয়াছি, তেমনই ভাবে অন্তর স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিবে। অথবা মায়া-মমতাদি সাক্ষাৎ অন্তর্ব্বৃত্তি ধরিয়া যাইবার প্রয়াস পাইবে। তবে হৃদয়গহ্বরমুখে

স্থূলভাবে প্রচেষ্টা করিলেও চলিতে পারে। মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, আর সেই মন্ত্রার্থময় ভাব অন্তরে অন্বেষণ করিবে। অর্থাৎ অন্তরই যেন সেইরূপ, এই দিক্ দিয়া যাইবে।

দেখ, তুমি যখন স্বপ্ন দেখ, তখন হয়ত তুমি কত রকম গন্ধ, কত রকম শব্দ, কত রূপ, কত রস, কত স্পর্শ অনুভব কর। তখন সেগুলি তোমার সত্যবৎই লাভ হয়, সত্য বলিয়াই অনুভব কর। সে সব শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ কোথায় ছিল? কোথায় তুমি সেগুলি পাইলে? তোমার অন্তরে। তোমার অন্তরে সবই আছে, ঘটনাক্রমে তুমি সেগুলি ভোগ কর; অবশ্য অভিভূত হইয়া সে ভোগ তোমার সংঘটিত হয়। তুমি কত ভবিষ্যৎ ঘটনা ও দূরস্থ পদার্থও তোমার সান্নিধ্যে পাও। যদি এই অন্তরক্ষেত্রে ইচ্ছানুক্রমে প্রবেশ করিতে সক্ষম হও, তবে আর অভিভূত হইয়া নয়—ইচ্ছানুসারে জাগ্রত অবস্থার ভোগের মত সে সব ভোগ করিতে সক্ষম হইতে পার। তাহা হইলে তোমার অন্তরের মধ্যেই তুমি সকল গন্ধ অনায়াসে পাইতে পার, রূপ পাইতে পার, রস পাইতে পার; এমন কি, এ ব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যাহা আছে, সব ভোগ করিতে সমর্থ হও। ইহাই আপ্তকামত্ব। অন্তর লাভ করিতে পারিলে এই অধিকার তোমার আয়ত্তীভূত হয়, আর সেইজন্য সত্যপ্রতিষ্ঠা ও মন্ত্র-চৈতন্য সাহায্যে যদি এইখানে আসিতে পার, তবে তোমার অন্বেষ্য যিনি, তাঁহাকেও লাভ করিতে নিশ্চয়ই পারিবে। তাই মন্ত্রচৈতন্য করার প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। মন্ত্র

উচ্চারণ করিবে, আর অন্তরে সেইভাব ফুটিতেছে কি না, লক্ষ্য করিবে।

মন্ত্রচৈতন্য না হওয়ার কারণ, শুধু সত্যজ্ঞানের অভাব, আর মন্ত্রচৈতন্য কাহাকে বলে, তাহার অজ্ঞতা। স্ত্রীপুত্রের সত্যতার জ্ঞান আপনা হইতে অন্তরকে উদ্বুদ্ধ করে—কোন কৌশলের দরকার হয় না। ভগবৎসাধনাতেও ঠিক তেমনই হয়। এখন অবধি যাহা বলিয়াছি, বেশ করিয়া মনে রাখিয়া যদি চেষ্টা কর, খুব সহজসাধ্য বলিয়াই মনে হইবে।

কিন্তু যাইতে হইবে বহু দূর। জ্ঞান লাভ করিয়া উদ্বুদ্ধ হও। গুরুর নিকট ভাল করিয়া বুঝিয়া নাও—কাহাকে অন্বেষণ করিতেছ—সে কোথা, তাহার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ, তারও নাম কেন? এই সব জানিয়া শুনিয়া সাধনায় অগ্রসর হও। অথবা সাধনা করিতে করিতে এই সব বুঝিয়া নিতে থাক। তবেই তোমার মন্ত্রে সত্যপ্রতিষ্ঠা হইবে।—মন্ত্রচৈতন্য আসিবে। তুমি ধন্য হইবে। ওরে, অনেক দূর যাইতে হইবে। এই মানুষ তুমি, এই ধূলির কাঙ্গাল—বিষয়পদলেহী, ক্ষণভঙ্গুর জীবনশীল, মৃত্যু দ্বারা সর্ব্বদা বিতাড়িত, এই মানুষ—নগণ্য মানুষ তুমি—তুমি হইবে এমন যে, তোমার কল্পনা কখনও মিথ্যা হইবে না, তোমার মৃত্যু বলিয়া কোন বোধ থাকিবে না, অজ্ঞাত কিছু থাকিবে না, তোমার গতিবিধি দেবতারা পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া লক্ষ্য করিবে। প্রাণহীন জড়তাময় এ ক্ষেত্র, এখানে অচেতনে আবৃত চৈতন, অজ্ঞানে ঢাকা জ্ঞান,

মৃত্যুতে ঢাকা অমৃত, নাস্তিক্যের মোহে ঢাকা আস্তিক্যবোধ, এখান হইতে যাইতে হইবে তোমায়—যেখানে প্রাণের স্বাধীন অনাবিল উৎস, শুধু স্ফুরণশীল, জড়তাহীন, অচেতনাখ্যা যেখানে আখ্যামাত্র, অজ্ঞানতা যেথা জ্ঞানেরই লীলাবিলাস, মৃত্যু যেখানে অদৃশ্য, আস্তিক্যবোধ যেখানে স্বভাবসিদ্ধ। যে জাতি, যে ধর্ম্মী, যে সম্প্রদায়ভুক্ত হও, সত্যের সন্ধানে বাহির হইতে—শুধু সংস্কারের বোঝা নৌকার কানায় কানায় ভরিয়া, জীবন-প্রবাহের জোয়ার ভাটায় শুধু এদিক্ ওদিক্ করিয়া বেলা বহাইয়া দিও না। শুধু এ-পারের দিকে চোক রাখিয়া, জলে দাঁড়াইয়া, সাঁতারের নামে হাত-পা সঞ্চালন করিও না—সত্যের একটানায় ঝাঁপাইয়া পড়—এ-পারের খুঁটা উপড়াইয়া ফেল। সত্য চাই—সত্যের দক্ষিণা বাতাসে পাল তুলিয়া দাও। জোয়ার হউক, ভাটা হউক, চলুক নৌকা পালভরে—আগাইতে থাক ও-পারের তীরের লক্ষ্যে। ডাক সত্যের ডাক—তোমার আর অন্য আশ্রয় নাই—অন্য আত্মীয় নাই, এই জ্ঞান সত্য করিয়া নাও। পার হইতেই হইবে তিমির-তরঙ্গ ভেদ করিয়া। সবের মাঝে একা হইয়া থাকা ছাড়িয়া, একের মাঝে সব পাইয়া তোমার জীবনকে ধন্য না করিতে পারিলে তোমার জোয়ার ভাটায় আগু-পাছু হওয়া আর ঘুচিবে না। প্রতি আহ্বান তোমার তাঁহাকে টানিয়া নিয়া আসিবে,—তোমার হতাশ প্রাণের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া দিতে, তাঁহার জীবন্ত চোখের চাহনিতে—প্রতি আহ্বান ছুটাইয়া আনিবে তাঁকে—তোমার

নিমজ্জমান চেতন-তরীকে ভাসিবার মত শক্তি দিতে—শতদীর্ণ প্রাণকে মেরামত করিয়া দিতে—তটের তরঙ্গভঙ্গ হইতে গভীর সাগরের সমতল বুকে ঠেলিয়া দিতে।

দেখ তোমার বুকের কপাট খুলিয়া!--মা সন্তানকে প্রভাতে সুপ্তি-ঘোর হইতে জাগ্রত করিয়া, খাওয়াইয়া, পরাইয়া গুরুগৃহে বিদ্যা-শিক্ষার জন্য পাঠাইয়া দেয়। সেখানে সে বালক সমস্ত দিন গুরুর আদর ও শাসন ভোগ করে। আবার সন্ধ্যায় ক্লান্ত শরীরে মলিন মুখে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখে, মাতা দ্বারদেশে পথের পানে চাহিয়া, তাহারই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া; সন্তানকে পাইবা-মাত্র বুকে তুলিয়া নিয়া, আদরে সোহাগে চুম্বনে তাহাকে প্লাবিত করিয়া, আহার্য্য দানে তাহার ক্ষুধা পিপাসার নিবৃত্তি করিয়া দিয়া, তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া ঘুম পাড়ায়! ঠিক তেমনি নিত্য তোমরা যখন প্রভাতে জাগ্রত হও, তখন মায়ের বুক হইতেই জাগিয়া ওঠ—সেই মায়েরই গুরুমূর্ত্তি এ বিশ্বরূপের প্রাঙ্গণে তাঁহার আদর তিরস্কার সমস্ত দিন ভোগ কর—আবার সন্ধ্যায় অবসন্ন হইয়া সেই মায়েরই বুকে ঘুমঘোরে মিশিয়া যাও। তোমাদের জাগিয়া থাকা, কর্ম্মময় থাকা ও ঘুমাইয়া পড়া, এ সকলের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই—ইহা শাস্ত্রের বাক্য। হাঁ রে! এমন করিয়া মা অনিমিক্ দৃষ্টিতে সত্য সত্য তোর মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে—অথচ এমন লুকাইয়া রহিয়াছে, যেন সে নাই। তাহাকে যতক্ষণ তুই না চাহিস্, ততক্ষণ তোর সামনে আসিলে তোর অহমিকার স্বাধীনতা

পাছে কুণ্ঠিত হয়—পাছে ভয়ে তোর স্বাধীন ইচ্ছাগতি স্তব্ধ হইয়া তাঁর দিকে ফিরিতে বাধ্য হয়, এই জন্য সে এমন করিয়া লুকাইয়া থাকে! সে চাহে, শুধু স্বাধীন ভাবে, স্বেচ্ছায় তুই তাহাকে ভালবাসিবি—স্বেচ্ছায় তাকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া বরণ করিবি। যতক্ষণ তেমন করিয়া তাহাকে না চাহিস, ততক্ষণই সে তোর মুখ চাহিয়াই তোর কাছে লুক্কায়িত। এই না থাকার মত থাকাই এই লুকাইয়া অবস্থান।—এর মত ভালবাসার অপূর্ব্ব আদর্শ আর কোথায় পাবি? এমন করিয়া যে আপনাকে হারাইয়া তোকে ভালবাসে, তোর জন্য—তোর কাছে শুধু তোর, আর কাহারও নয়—শুধু তোর জন্য, যে জগৎমূর্ত্তি ধরে, যেন চেতনহারা হইয়া তোর ভোগ্য-সম্ভার সাজাইয়া ধরে, আমার কাছে শুধু আমার—আর কাহারও নয়, শুধু আমার—শুধু আমার জন্য জগন্মূর্ত্তি ধরে, ভোগ দেয় অথচ লুকাইয়া থাকে, অথচ অনিমিক্ চোখে চেয়ে;—এমন যে, তাহাকে রহিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিলে কি আর কিছু শিখিতে হয় রে। এমন যে, তাহাকে আমরা সত্য বলিয়া মানিয়া নিতে পারিলাম না! অথচ ধর্ম্ম লইয়া কতই না গবেষণা করিয়া বেড়াই! ওরে, তাই তার নামটা মনে পড়িবামাত্র যেন তোর চক্ষু তার চক্ষে সম্মিলিত হইয়া যায়—এটা কখনও ভুলিস না; তাহা হইলেই তোর মন্ত্র আপনি চৈতন্যময় হইয়া উঠিবে, তোর মিথ্যা-বুদ্ধি সত্যের জ্ঞান-সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হইবে। ওরে! তোর কাছে সে সত্যই

শুধু তোর—আর কাহারও নয়—আর কিছু সে জানে না—শুধু তোকে, শুধু তোকে সে জানে। আমার কাছে সে শুধু আমার—আর কাহারও নয়—শুধু আমাকেই সে জানে, এমনই সে! অথচ সেই সে, সেই একই সময়ে এ সমগ্র বিশ্বের বোদ্ধা, দ্রষ্টা, পরমেশ্বরত্বের ইহাই অপূর্ব্ব প্রেমলীলা--আমি বিশ্ব, আমার বিশ্ব, বিশ্ব আমার প্রাণের প্রাণ, বিশ্বের প্রত্যেক অণুকে সে "আমার তুই, আমার তুই" বলিতেছে—ইহাই পরম ভাব। আবার সেই সময়েই সে সমগ্র বিশ্বলীলায় মত্ত হইয়া—লীলাময় হইয়া রহিয়াছে। "অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্য আত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু"—এই শ্রুতি জীবের সহিত পরমাত্মার এই প্রাণ-সম্বন্ধই স্পষ্টতর করিয়া দেখাইয়া দেয়। মরীচিকার মত এ জগতের উৎপত্তি নহে, ইহা প্রাণের অপূর্ব্ব প্রেমময় লীলা, আত্মদানের অপূর্ব্ব আদর্শ—এ বিশ্ব একান্ত মমত্বময় প্রাণ-যজ্ঞ। সাধককে কোন বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে যেমন সাধ্যের সহিত তাহার বাক্, মন, প্রাণের ঐকান্তিক তন্ময়তা ঘটাইতে হয়, সমগ্র প্রাণ দিয়া সাধ্যকে বরণ করিতে হয়, তিনিও ঠিক তেমনই করিয়া নিজের প্রাণ দিয়া, নিবিড় মমত্ব পরিস্ফুট করিয়া এ বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার এ আত্মদান অতুল। 'আমরা তাঁহার প্রাণ—তিনি আমাদিগের প্রাণ, এ কথা কখনও ভুলিও না। কিন্তু আবার সেই সময়েই সে বিশ্বভুবন কিছুই জানে না—জানে শুধু আপনাকে। সৌভরির উপাখ্যানে যেমন সৌভরিকে দেখিয়াছিস্—একই সময় সে

প্রত্যেক স্ত্রীতেই যেন একান্ত আত্মভোলা—অথচ যেমন সেই সময়েই সে তাহার এ স্ত্রীসমষ্টি লইয়া লীলার স্রষ্টা ও ভোক্তা, অথচ যেমন সমস্তে নির্লিপ্ত, আমার প্রাণের প্রাণও ঠিক ঠিক সেই রকম রে! ওরে! এমন যে তোর প্রাণের প্রাণ, উপদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া ফিরিয়া চা—ফিরিয়া চা তোর সেই প্রাণের দিকে। তোর মন্ত্রসিদ্ধি আপনি আসিবে। কিসের ধর্ম্ম, কিসের কৌশল, কিসের উপদেশ—কিসের যোগযাগ—ছুটিয়া চল—তোর চেতন-গতিকে ফিরাইয়া ধর সত্যের দিকে—প্রাণের দিকে—মন্ত্রময়ীর দিকে। তোর অনুভূতিক্রিয়ার তিন অংশ অর্থাৎ মন, প্রাণ, জ্ঞান—ইহার কোথাও যেন বিমুখতা না থাকে;—তোর বাক্, প্রাণ, মনের কোনটা যেন আর কাহারও দিকে বাঁকা চোখে চাহিয়া না দেখে। মন্ত্র বা তার নাম বলিবার সময় শুধু জানিবি, তুই বাঙ্ময়, মনোময় আর প্রাণময় বা হৃদয়ময়—আর তোর কিছুই নাই; সেই তোর বাক্য, মন, প্রাণ—সবটা এক সুরে বাজিয়া উঠিতেছে—একই সুরকে ধরিয়া রাখিতেছে। আর সেই একই সুরের তরঙ্গাভিঘাতে মাতোয়ারা হইয়া যাইতেছে! তবেই তোর মন্ত্রচৈতন্য সিদ্ধ হইবে। তোরা মনে রাখিবি, এই কথাগুলিকেই আইন-শৃঙ্খলায় বাঁধিয়া বলিতে গেলে যাহা হয়, তাহাই আমি উপায় বলিয়া বলিয়াছি। আর তাকে বুকের টানে পাইতে ছুটিলে যে সব লক্ষণ ও ভঙ্গিমা জীবের মনে প্রাণে, শরীরে বাক্যে ফুটিয়া ওঠে, সেইগুলি যোগাঙ্গ বা উপায়রূপে অবলম্বন করিবার কথাই ঋষিরা বলিয়াগিয়াছেন।

তোরা দুই দিক্ দিয়াই চেষ্টা কর। দুটাকেই খাপ খাওয়াইয়া লইয়া চলিতে অভ্যাস কর।

মন্ত্রচৈতন্য সম্বন্ধে যাহা এ পর্য্যন্ত বলিয়াছি, তাহার সার মর্ম্ম সংক্ষেপে একবার বলি। মনে কর, পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে,—"প্রতিবোধবিদিতং মতং অমৃতত্বং হি বিন্দতে।" প্রত্যেক বোধের দ্বারা তাঁহাকেই বিদিত হইতেছি, ইহাই অমৃতলাভের উপায়। কেন না, তিনিই বোধময় ও বোধশক্তি-সম্পন্ন। সুতরাং ঘরের জানালা দিয়া আলোকরশ্মি প্রকাশ পাইতে দেখিলে যেমন বোঝ যে, ওই আলো দেখা যাইতেছে এবং ওই ঘরের ভিতর দীপ আছে, তেমনই তোমার অন্তর্ব্বৃত্তি অর্থাৎ প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়ের স্পন্দন দেখিয়া বুঝিয়া লইবে যে তাঁহাকেই দেখিতেছ বা তাঁহার শক্তিকেই দেখিতেছ এবং তিনি অন্তরেই রহিয়াছেন—তিনিই অন্তর। এইটিকে একেবারে সত্য বলিয়া ধারণা করিবে। তোমার কাপড়ের ভিতর একটা বৃশ্চিক রহিয়াছে যদি বলি, তবে তৎক্ষণাৎ তুমি লাফাইয়া ওঠ; ঘরে ভূত আছে বলিলে তৎক্ষণাৎ তুমি চমকিয়া ওঠ; কিন্তু ভগবান্ তোমার অন্তরে রহিয়াছেন বলিলে তোমার কোন ভাবান্তরই হয় না,—এইটি দেখাইয়া দেয় যে, ভগবৎসত্তা তুমি মোটে এখনও মানিয়া উঠিতে পার নাই। সেই জন্য যাহাতে ভগবান্‌কে ডাকিতে গেলেই সেই রকম চমক আইসে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে। সেই চমক আনাই মন্ত্রচৈতন্য করা। দেখ, তোমার জগদ্‌বোধও

বোধের আকার, তোমার স্ত্রী-পুত্র বোধও বোধের আকার। আবার তোমার ভগবদ্‌বোধও বোধের আকার। একটা কিছু দেখিয়া তুমি বল, ওটা অমুক বলিয়া বোধ হইতেছে। "অমুক বলিয়া বোধ হইতেছে" বলাও যা, আর "বোধ অমুক আকার হইতেছে" বলাও তাই। তোমার বোধই সর্ব্ব আকার গ্রহণ করেন। "তুমি রহিয়াছ" বলাও যা, "তোমার বোধ 'রহিয়াছি'র আকার গ্রহণ করিয়া রহিয়াছেন" বলাও তাই। আর বোধ যে আকার সত্য সত্য গ্রহণ করে, তোমার সেই জিনিষই বা সেই অবস্থা বা সেই লোক লাভ হয়, ইঁহাই শাস্ত্রের শিক্ষা। কেন না, যিনি তোমার বোধরূপে প্রকাশ পাইয়া রহিয়াছেন, তিনিই বিশ্ব সাজিয়াছেন, এবং তাঁহারই বিশ্ব। সুতরাং যখন তোমার কোন কিছু পাইতে হইবে, তখন তোমার বোধকে সম্পূর্ণরূপে তদাকারে ঢালাই করিয়া ফেলিতে হইবে। সে বোধের তখন আর অন্য কোন আকার প্রকার থাকিবে না, তখন আর কিছু আছে বলিয়া বোধ হইবে না; এমন কি, তোমার বোধের যে অংশটি তোমার নিজের সত্তার আকার ধরিয়া রহিয়াছে, সে অংশ পর্য্যন্ত তাহার সে আকার ভাঙ্গিয়া ফেলিবে—তোমার অস্তিত্বটি পর্য্যন্ত আর তোমার বোধে দেখা যাইবে না, সমস্ত বোধ মাত্র প্রার্থিত আকার-প্রকারের রূপ গ্রহণ করিবে। সেই ভাবে অবস্থান করিলেই সেই প্রার্থিতটিকে পাওয়া হইয়া যাইবে। যদি তোমার অর্থ বা শ্রীসম্পদের দরকার হয়, তবে তোমার

বোধকে "শ্রী"র আকার দিতে হইবে। যদি তোমার বিত্তার দরকার হয়, তবে তোমার বোধকে ওই রকম করিয়া সরস্বতীর আকারে গড়িতে হইবে। ইহাকেই আমাদের লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতীপূজা বলে। আর এই পূজাই ফলদায়িনী হয়, সকল পূজার উদ্দেশ্য ও প্রণালী ইহাই। ইহাই একমাত্র সাধন-বিজ্ঞান—জগদ্‌বিজ্ঞান—তত্ত্ববিজ্ঞান।

আর তোমার বোধকে এই রকম অভীপ্সিত ছাঁচে ঢালাই করিতে হইলে মন্ত্রচৈতন্যের সাহায্যেই করিতে হইবে। অর্থাৎ শব্দ, অর্থ ও বেদন এক সঙ্গে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। বোধে অভীপ্সিতকে সম্যক্‌রূপে লাভ করার নাম বা নিজের বোধ সম্যক্‌রূপে ঈপ্সিত আকার গ্রহণকরার নামই সারূপ্য-বোধ। ইহার ফল বিশ্ব, ইহারই ফল সিদ্ধি, শক্তি মোক্ষ। এই বোধশক্তিই একমাত্র মহাশক্তি, ইহার ত্রিবৃৎ ভাবই জ্ঞান। ইচ্ছা ক্রিয়া বা রুদ্রাণী, বৈষ্ণবী, ব্রহ্মাণী অথবা জ্ঞান, প্রাণ, মন অথবা বাক্, মন, প্রাণ। মনে আকার প্রকার, প্রাণে জীবন বা ভাব, এবং জ্ঞানে অক্ষররাশি। অক্ষর-সকল গ্রথিত হইয়া ভাব হয়, আর ভাব ঘন হইয়া ক্রিয়া হয় বা আকার-প্রকার প্রকাশ পায়।—মূলে অক্ষরসমষ্টি। আবার ক্রিয়া বা আকার-প্রকার অবলম্বন করিয়া তদ্ভাবে প্রবেশ করিতে হয় এবং মহাসত্ত্বা পাইতে হইলে ভাব সকলকে জ্ঞানে পর্য্যবসিত করিতে হয়। এই ভাব-সকলকে জ্ঞানে পর্য্যবসিত করাই লয় হওয়া। সেই জন্য লয়ের দেবী মহাকালী মুণ্ড-

মালিনী ;—মুণ্ড হইতেছে মৃত বা ছিন্নকণ্ঠ ভাবের অক্ষররাশি। ভাব জিনিষটি হইতেছে যেন জীবন্ত শব্দ-বিন্যাস ; আর শব্দ ভাঙ্গিলে পাওয়া যায় অক্ষর। এই জন্য জ্ঞানক্ষেত্রে বা রুদ্রক্ষেত্রে বা পরমেশ্বরক্ষেত্রে পাওয়া যায় শুধু অর্থহীন, শব্দহীন অক্ষররাশি। এই কারণে অক্ষরগুলিই হয় সাধনার বীজ। সেই বীজকে ভাবে ও মূর্ত্তিতে ঘনীভূত করিয়া তুলিতে হয়। ইহারই নাম বীজকে বা মন্ত্রকে চৈতন্য করা অর্থাৎ দেবতাতে সারূপ্য লাভ করিয়া দেবতাকে পাওয়া ও সিদ্ধ হওয়া। বিশেষ বিশেষ বীজ শুধু বিশেষ বিশেষ দেবতার বা চেতন-বৈচিত্র্যের নিদর্শন। ওঁ ব্রহ্মতত্ত্বের বা আত্মতত্ত্বের বীজ। যাহা হউক, এই জন্য বীজের অর্থ বা লক্ষ্য জানিয়া লইয়া তবে তাহাতে চৈতন্যময় হইতে হয়। বীজটি পরমাত্মার কোন্ ভাব বা কোন্ প্রাণময় বিশিষ্টতা বা দেবত্ব লক্ষ্য করে, সেইটি জানিবে এবং সেইরূপ ভাব বা প্রাণের প্রকট মূর্ত্তি কি প্রকারে ধারণ করা সম্ভব, তাহা জানিয়া তবে সাধনা করিতে হয়। দেবতা ধ্যানের জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দেখ, উহা এই। প্রাণের বা ভাবের ভিন্নতায় মূর্ত্তির ভিন্নতা। যেমন তোমার ক্রোধ হইলে তোমার ভাবময় শরীর একরকমের হয়, ক্ষুধা হইলে এক প্রকারের হয়, ভগবদ্ভাবাপন্ন হইলে অন্য এক প্রকারের হয়, নিদ্রিত হইলে অন্য এক প্রকারের হয়, তদ্রূপ পরমাত্মার বোধ-শক্তিবিশিষ্টতার ভাবময় মূর্ত্তিও ভিন্ন এবং ওই সকলই দেবতা নামে খ্যাত। কিন্তু যাক—'

বোধ করাই শক্তি। সেই জন্য তোমরা শরীরের বা মনের যদি বিকলতা দূর করিতে চাহ, তবে শরীরের গ্রন্থিগুলি বোধ করিবে। তোমরা আচমন ও ন্যাসাদি করিতে যে সব মন্ত্র পাঠ ও অঙ্গস্পর্শাদি কর, তাহার উহাই উদ্দেশ্য—সেই স্থানগুলি বিশেষ ভাবে বোধ করা। দেবতাকে যদি পাইতে চাহ, তবে দেবতার স্বরূপ জানিয়া, তাঁহাকে বোধ করিবে ও তৎসারূপ্য গ্রহণ করিবে। আর পরমাত্মাকে যদি পাইতে চাহ, তবে পরমাত্মতত্ত্বে কথিত প্রকারে আপনাকে চিরদিনের জন্য হারাইয়া ফেল। বোধশক্তিই তোমার একমাত্র সম্বল—বোধশক্তিই তোমার একমাত্র আলোক—বোধশক্তিই তোমার একমাত্র স্ত্রীপুত্র, ধন জন, যশঃ সম্পদ, ঊর্দ্ধ অধঃ, বন্ধন মোক্ষ, জন্ম মৃত্যু, সিদ্ধি শান্তি, যাহা কিছু লাভের একমাত্র মূলধন। উহাকে ধরিয়া উনি যাঁহার স্বরূপ ও শক্তি, তাঁহাকেও লাভ করিতে হয়—আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। মন্ত্রচৈতন্য মানেই মন্ত্রে বোধময় হওয়া।

আর এই মন্ত্রচৈতন্য-সিদ্ধি লাভ করিতে বা বোধতত্ত্ব সম্যক্ ভাবে ধরিতে হইলে প্রাণের ভিতর দিয়াই হয়। কেন না, প্রকৃত প্রাণই বোধকেন্দ্র। সেই জন্য সত্যপ্রতিষ্ঠা, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও মন্ত্রচৈতন্য, সকলগুলিই পরস্পর সাহায্যাপেক্ষী। প্রাণকে বা হৃদয়-গ্রন্থিকে বিচঞ্চল না করিতে পারিলে কিছু হয় না, ইহা যেন ভুলিও না।

উপসংহার

এই বার এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সার মর্ম্ম-টুকু গ্রহণ কর। সাধনার উদ্দেশ্য পরমাত্মাকে লাভ, আর সাধনার উপায় পরমাত্মাকে জ্ঞানতঃ ব্যবহারতঃ জানা, মানা। এই যে জ্ঞানতঃ ও ব্যবহারতঃ জানা, মানা, ইহা করিতে হইলে পরমাত্মার সত্তায় সত্যপ্রতিষ্ঠ হওয়া ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই। যে জাতি, যে সম্প্রদায় যে মতাবলম্বী হও না কেন, জগৎকে বা নিজের সত্তাকে যেমন সত্য দেখ, ভাব, ব্যবহার কর, ঠিক তদাকারের ধারণায় তাঁহার সম্বন্ধে জীবন্ত হইতে হইবে। এই সত্য বোধ উজ্জীবিত করিতে নিজ অন্তরস্থ অনুভূতিক্রিয়া ও নিজ অস্তিত্ববোধ অবলম্বন করিয়া "সত্তামাত্র" বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা যে এক জ্ঞানঘন জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন পরমাত্মসত্তা এবং একমাত্র তিনিই রহিয়াছেন এবং তিনিই আপনি আপনাকে নানারূপে সম্ভব ও বোধ করিতেছেন বা আপনি আপনাকে স্বরূপে ও বহুরূপে জানিতেছেন, এজীবময় জগৎ তাঁহার বোধক্রিয়া, তাঁহার জ্ঞানশক্তির বা চিৎমহিমার ইচ্ছাকৃত প্রকাশ, ইহা গুরুমুখে সর্ব্বদা বুঝিতে হইবে। আর আমরাও বিষয় বলিয়া যাহা কিছু অনুভব করি, সে যে আমার জ্ঞানময় প্রত্যগাত্মারই জ্ঞানাক্রিয়া—বোধবৈচিত্র্য, বোধশক্তির

নানা আবর্ত্তনরাশি, ইহা বুঝিতে হইবে। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন এবং তাঁহাকে বোধ করিতে গিয়া আমিও সেই স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব—আমিও মাত্র জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন হইয়া, নিজ সত্তা তাঁহাকেই সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়া ফেলিব, ইহাই হইবে আমার লক্ষ্য। আর তাঁহাকে পাইলে জ্ঞান, প্রাণ, মন যে ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহাকে আপনাতে পায়, তাঁহাকে পাইবার চেষ্টা করিতে গেলে সেইভাবেই জ্ঞান, প্রাণ, মনকে বা বাক্, প্রাণ, মনকে পরিণমিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যোগস্থ হইলে যে লক্ষণ স্বতঃ ফুটিয়া উঠে, যোগস্থ হইবার চেষ্টা করিতে গেলে সেই লক্ষণগুলির অনুধাবন করাই যোগাঙ্গ, ইহা বলিয়াছি।

ওই যে মন, প্রাণ, জ্ঞান—ইহাই পরমাত্মার পরমেশ্বরমুর্ত্তির বিশিষ্টতা। তিনি জ্ঞানশক্তিরূপে ক্রিয়াময় হইয়া, প্রাণময় ও মনোময় হইয়া তাঁহার এ জ্ঞানময়, প্রাণময়, মনোময় জগৎ রচনা করিয়াছেন। এ অচেতন জগৎ তাঁহার মনের রূপ বা বিকাশ-বৈচিত্র্য। তাঁহার জগৎ হইবার ইচ্ছা বা তপস্যার এই ত্রিবৃৎ বা জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি বা জ্ঞান, প্রাণ, মনই হইল যেন উপাদান। জগৎসিদ্ধির উপায়ই যেন ওই তিনের সমাবেশ। মোটা কথায় সমগ্র জ্ঞানক্রিয়াটুকু বা ভাবনাটুকু ইচ্ছানুরূপ আকারে ঢালাই করা, ইহাই সর্ব্বসিদ্ধি লাভের, জীবের জন্মজন্মান্তর ভ্রমণের, মুক্তির ও পরমেশ্বরের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ লীলার একমাত্র কারণ। সুতরাং তাঁহাকে পাইতে

ইচ্ছা করিলে মন, প্রাণ, জ্ঞান বা বাক্ মন প্রাণরূপ অনুভূতি-ক্রিয়ার অংশ তিনটিকে তদাকারে ঢালাই করিতে হইবে। তা যে উপায়েই হউক, যেমন করিয়াই হউক।

তাঁহাকে সত্য রহিয়াছেন বলিয়া জানাটি সুসম্পন্ন হইলে সমগ্র অনুভূতি তদাকার না হইয়া থাকিতে পারে না, সে মহানের এমনই মহতী প্রাণময়ী আকর্ষণী শক্তি, এতই নিবিড় প্রেমশক্তির বিলাসে এ জগৎরচনা। আবার সমগ্র অনুভূতি তদাকারে পরিণত করিলে তাঁহাকে পাইতে বাকি কিছু থাকে না—জীব আপনাতে আপনি তাঁহাকে লাভ করে। এক দিক্ দিয়া তাঁহার প্রেম যদি আমাদিগকে তাঁহাকে বরণ করাইয়া লয় ও তিনি আমাকে গ্রহণ করেন, তবেই আমার সমগ্র অনুভূতি তন্ময় হয় ও তাঁহাকে আনিয়া দেয়; এবং অন্য দিক্ দিয়া আমাদিগের প্রচেষ্টা বলিয়া যাহা আছে, তাহা যদি আমাদিগের অনুভূতিকে তন্ময় করিতে বীর্য্যের সহিত নিযুক্ত করি, তবেই তাঁহাকে পাইবার যথার্থ উপযোগী সাধন-পথ অবলম্বন করা হয়।

এই যে, অনুভূতি বা বোধক্রিয়ার তিন অংশ, ইহাদিগের নাম দেওয়া হয়—মন, হৃদয় বা প্রাণ এবং জ্ঞান বা মূল বোধ-ক্রিয়া, জ্ঞানক্রিয়া। মনে করা, তাঁহাতে ভাবময় হওয়া ও জ্ঞানেতে তাঁহাকে লাভ করা বা বিপরীত ক্রমে জ্ঞানে লাভ করা, তাঁহাতে প্রাণময় হওয়া বা সুখ-দুঃখ প্রীতি-বিদ্বেষময় হওয়া ও তদনুসারে মনোময় হওয়া বা ক্রিয়াময় হওয়া—সকল অনুভূতিতেই এই

তিনটিই কম-বেশীভাবে প্রকাশ পায়, আর ইহাদিগের নাম হয় ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি, রুদ্রগ্রন্থি। পরমেশ্বরের বিরাট্ ক্ষেত্রে ইঁহাদিগের নামই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।

সত্যপ্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ করিতে হইলে বা সত্য লাভ করিতে হইলে এই তিন গ্রন্থিভেদ করিতে হয় বা অন্তরাকাশের এই তিন স্তরে প্রবেশ করিতে হয়। তবে তিন গ্রন্থির ক্রিয়ায় তিন ভাবের যথাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিই—সত্যপ্রতিষ্ঠা, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, মন্ত্রচৈতন্য। মনোময় ব্রহ্মগ্রন্থির কাজ কর্ম্ম, প্রাণময় বিষ্ণুগ্রন্থির কাজ ভোগ এবং জ্ঞানময় রুদ্রগ্রন্থির কাজ সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য লাভ ও ত্যাগ। রুদ্র রাজরাজেশ্বরীর স্বামী, অথচ ভিখারী, বৈরাগ্যময়। এই জন্য ইনি মহেশ্বর, অন্তরাকাশের এই ক্ষেত্রেই যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু নাই, সমস্ত সমাহিত। প্রকাশ করা ও ত্যাগ করা, আবার সমাহিত করা, ইহাই এ গ্রন্থির কাজ। সমস্ত শক্তির আধার এই রুদ্রগ্রন্থি। এই গ্রন্থি পরমেশ্বরীর লীলাভূমি—আদ্যা শক্তির আবাসস্থল, মহাবিদ্যার মন্দির। প্রকাশে ভোগময় হওয়া অথবা তাহাকে প্রাণময় করা ও তাহাতে প্রাণময় হওয়া বিষ্ণুগ্রন্থির কাজ। তাঁহাকে স্থূলতঃ পাওয়া বা তাঁহাতে স্থূলতঃ প্রাণানুসারে ক্রিয়াশীল হওয়া ব্রহ্ম-গ্রন্থির ব্যাপার। জীবের অন্তরাকাশ এই ত্রিগ্রন্থিময়; অন্তরা-কাশই আত্মা এবং তাঁহাতেই বিশ্বেশ্বর পরমাত্মা অধিষ্ঠিত। অন্তঃক্রিয়া অবলম্বনে এই অন্তরাকাশ তোমায় দেখিতেই হইবে, পাইতেই হইবে। কেন না, পরমাত্মা হইতে স্থূল জগৎজ্ঞান

বা জগৎ পর্য্যন্ত এই অন্তরেরই মূর্ত্তি, ভিন্ন ভিন্ন আয়তন-প্রকাশ ও ইহাতেই প্রতিষ্ঠিত।

শোন, চণ্ডীর দেবীস্তুতিতে—"আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা, মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি। অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত-দাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে ॥" এইটী ব্রহ্মগ্রন্থি ও ব্রহ্মার ক্ষেত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। তাহার পরের স্তুতিটী— "ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা, বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া। সম্মোহিতং দেবী সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥" এইটী বিষ্ণুগ্রন্থি বা বিষ্ণুকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। আর "বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি! ভেদাঃ, স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু। ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ, কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥" এইটি রুদ্রগ্রন্থি বা রুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে। রুদ্রগ্রন্থি উপাদান, বিষ্ণুগ্রন্থি ক্রিয়াবীজ এবং ব্রহ্মগ্রন্থি ক্রিয়া-প্রকাশ। বোধময় অন্তরাকাশের এই তিনটী স্তর লক্ষ্য করিয়া সাধনায় অগ্রসর হইলে সহজেই অভীষ্ট কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়া যায়।

ব্রহ্মগ্রন্থিতে মূর্ত্তি লইয়া স্বচ্ছন্দে উপাসনা করিতে পার— প্রাণ-গ্রন্থিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে প্রাণময় করিবে, আর রুদ্রগ্রন্থিতে মাত্র তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া জীবত্বের মোচন, সিদ্ধিলাভ ও আপ্তকাম হওয়া।

ব্রহ্মক্ষেত্রে পরমেশ্বর প্রকাশময় এবং সেই প্রকাশ পরম সত্যের প্রকাশ হইলেও জীব, খণ্ডাত্মক সত্যবোধে ইহাকে দর্শন

করে। এই খণ্ড সত্যরূপে নামরূপ অংশটুকু দেখা ও পরম-ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি না করা, ইহাই ব্রহ্মগ্রন্থির গ্রন্থিজটিলতা। এই ক্ষেত্রে সাধনাই সত্যপ্রতিষ্ঠা। বিষ্ণুক্ষেত্রে পরমেশ্বর প্রাণময়, ভোগময়, প্রেমময়, সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়, হৃদয়-ব্যবহারময়, জীবের গতি ভর্ত্তা সুহৃৎ—আর এই ক্ষেত্রে খণ্ড ভোগে, খণ্ডমোহে, খণ্ড ভালবাসার খণ্ড মমতায়, খণ্ড খণ্ড হৃদয়ব্যবহারে মুগ্ধ থাকা, ইহাই হৃদ্‌গ্রন্থির—হৃদয়ের জটিলতা।

এ গ্রন্থি মুক্ত করিতে হইবে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার সাহায্যে—ভগবানে প্রাণ সমর্পণ করিয়া—ব্রহ্মগ্রন্থিতে উপলব্ধ সত্যকে জীবন্ত দর্শন করিয়া। তাঁহাতে প্রাণ অর্পণ করিয়া, তাঁহার একান্ত আপনার হইয়া গিয়া, থাকিয়া থাকিয়া তাঁহাতে সোঽহং বোধে উপনীত হওয়া, প্রাণ দানের ইহাই সার্থকতা।

আর রুদ্রক্ষেত্রে পরমেশ্বর সৃষ্টি-সংহরণময়। এই ভূমি প্রলয়-ভূমি—এই ভূমিতে প্রাণ-মন সমস্ত আসিয়া বিলীন হয়, আবার ইহা হইতেই সমস্ত উদ্ভব হয়—নামরূপ ও সেই সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবহার লয় হইয়া, ভূমা জ্ঞানাকারে অবস্থান করে। আর অজ্ঞ জীব এইখানে সুষুপ্ত হয়, মৃত্যুর গ্রাসে আচ্ছন্ন হয়। ইহাই এ ক্ষেত্রে গ্রন্থি। আর সাধক ভগবানে আত্মসমর্পণে করিয়া, সোঽহং বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া—এই ক্ষেত্রে তুরীয়-সংস্থানে সার্থকতা লাভ করে এবং সকল গ্রন্থি হইতে মুক্ত হয়। ইহা ত্যাগের ভূমি। এ গ্রন্থিতে জীবের আমিত্ব একান্ত ভাবে লোপ হয় এবং সাধ্যের আমিত্বে বিহার করে।

আপনি আপনাকে জানিতেছি, এই স্বসম্বেদন বোধ ও সেই আমি আত্মাই বা উপাস্যই, এই বোধ এখানে সম্যক্ ক্রিয়াশীল। রুদ্র-গ্রন্থি-প্রাপ্ত পুরুষই প্রকৃত নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করে বা সন্ন্যাসী হয়। এ ভূমির সন্ধান পাইলে জীব আর বহির্জগতে জ্ঞানচক্ষু বিসর্পিত করিতে চাহে না, বাহ্য জগতের উপর প্রকৃত বৈরাগ্য আসে, কোন অনাত্ম এষণা থাকে না—সকল ভোগ ইচ্ছাধীন হইয়া গিয়া সাধকের বাহ্য ভোগে বিরতি ফুটিয়া ওঠে ও সাধক সর্ব্বদা এই অন্তরেই বাস করিতে থাকে এবং বাহ্য জগতের—এমন কি, স্থূল দেহের থাকা যাওয়া তাহার নিকট অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান হয়। এ গ্রন্থি লাভের পূর্ব্বে যাহারা সন্ন্যাসী হইতে চাহে বা সাজিতে চাহে—তাহারা মিথ্যাচারী। যাহারা নৈষ্কর্ম্ম্যের এই কেন্দ্রভূমি পাইবার পূর্ব্বে কর্ম্মত্যাগ করে বা ত্যাগ শিক্ষা দেয়, তাহারা উন্মার্গগামী এবং যাহারা এই গ্রন্থিতে উপনীত হইয়া, তত্ত্বদর্শনে সিদ্ধ হইয়া, চিন্ময়ের চিতিশক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, জগৎ মিথ্যা বলিতে প্রয়াস পায়, তাহারা সাধন-রহস্য-জ্ঞান-শূন্য, মরীচিকা-মোহগ্রস্ত 'মিথ্যাবাদী" মাত্র।

অচেতন ভোগ বমনাহারবৎ প্রতিভাত হইলে, তবে সন্ন্যাসাধিকার আসিয়াছে বুঝিতে হয়।

মনে রাখ,—অনুভূতিং বিনা মূঢ়ো বৃথা ব্রহ্মণি মোদতে।
প্রতিবিম্বিতশাখাগ্রফলাস্বাদনমোদবৎ ॥

প্রতিবিম্বিত বৃক্ষ-শাখায় প্রতিবিম্বিত ফল খেয়ে সন্ন্যাস

গ্রহণ করিস না। ব্রহ্ম-গ্রন্থিতে ঈশ্বর-জ্ঞানের দ্বারা জগৎকে আচ্ছাদিত করা সত্যপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত; সত্যবোধে সেইরূপ ব্যবহারময় হইতে পরমেশ্বরে প্রাণের বৃত্তি সংলগ্ন করিয়া, তাঁহাতে আত্মহারা হওয়া ও থাকিয়া থাকিয়া সত্য-প্রেমে তাঁহাতে তন্ময় হইয়া, তৎসারূপ্য লাভ করা ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস হইতে সকল কর্ম্ম তাঁহার কর্ম্মরূপে উপলব্ধি করা, ইহাই প্রাণ-গ্রন্থির সাধনা; এবং সর্ব্বতত্ত্ব আত্মস্থ দর্শন করিয়া—তাই হইয়া স্বায় অন্তরে বিরাজ করা, সর্ববাহ্যত্যাগী হওয়া রুদ্রগ্রন্থির সাধনা।

মনে সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন, প্রাণে তাঁহার সহিত প্রেম-লীলা—যদিও তাঁহাকে অধিকার করা রূপ বোধে প্রেম হেথা ঈষৎ লাঞ্ছিত—আর রুদ্রগ্রন্থিতে সর্বস্বার্থত্যাগী অনাবিল প্রেম।

তাড়াতাড়ি সোঽহং হইতে যাইও না। সত্য পুরুষকে দর্শন অভ্যাস করিয়া, তাঁহাতে প্রাণ বিগলিত করিয়া দিয়া আপনার সত্তা তদনুসারী করিয়া তাঁহাতে হারাইয়া, তবে রুদ্র-গ্রন্থিতে উপনীত হইতে পারিবে ও স্বতঃ সোঽহং অধিকার লাভ হইবে। কিন্তু বলিয়া রাখি, এখানে উঠিতে হইবেই। যাঁহাকে আমা হইতে অন্য বলিয়া বিন্দুমাত্র ধারণা করিলে ক্ষুণ্ণ করা হয়, সোঽহং সত্য সত্য বলিতে ও বোধ করিতে না পারিলে পর করিয়া ফেলিয়া রাখা হয়, আর যে প্রাণময় প্রীতিময় আত্মা পরবোধের বিন্দুমাত্র সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহার ধারণা

পরিপূর্ণ ততক্ষণ হইবে না, যতক্ষণ না "আমি আমাকেই জানিতেছি—" ইত্যাদি সোঽহং ভাবের বোধে উপনীত না হও। ততক্ষণ গ্রন্থির পর গ্রন্থি সত্যপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হও—অগ্রসর হও। শান্তি তোমার অচিরলব্ধ সার্থকতা হউক। তুমি জয়যুক্ত হইয়া, তাঁহাকেও তোমাতে জয়যুক্ত কর।

ব্রহ্মগ্রন্থিতে তাঁহার চোখে চোখ দিয়া সকল কাজ করিবে, প্রাণগ্রন্থিতে তাঁহার তৃপ্তিতে তোমার তৃপ্তি, এই বোধে জগদ্-ব্যবহার করিবে—রুদ্রগ্রন্থিতে সর্ব্বব্যবহারশূন্য সমাধিস্থ হইবে, তবেই তুরীয়ান্ত মোক্ষক্ষেত্রে তুমি আরূঢ় হইবে।

দ্বৈতবোধে সাধনার সূচনা হইলেও সঙ্গে সঙ্গে আপনি আত্মারই শক্তি বা চঞ্চল ক্রিয়াময় চিৎরশ্মি ও তাঁহাতেই জাত, স্থিত, এই ভাবে বিশিষ্ট অদ্বৈত-বোধে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া, তাঁহাতে আমিত্ব হারাইয়া মিশিয়া যাইবে বা সমাধিস্থ হইতে প্রয়াস পাইবে। মনে একান্ত সত্যবোধ ও নিষ্ঠা ফুটাইবে। সেই নিষ্ঠা অবলম্বনে শ্রদ্ধা ও প্রেম প্রীতি ফুটাইয়া তুলিবে ও প্রাণময় হইয়া স্বীয় অভীপ্সিতকে প্রাণময় করিবে বা প্রাণময় প্রীতিময় দেখিবে ও তাঁহাতে তদাত্ম হইবে এবং তাদাত্ম্য ভাব লাভ হইলে স্বতঃ রুদ্রগ্রন্থিতে সমাধিস্থ হইয়া, তাঁহাকে ও তদৈশ্বর্য্য লাভ করিবে অথবা তুরীয়াতীত স্বাধীন ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবে।

ব্রহ্মগ্রন্থিতে সত্যপ্রতিষ্ঠার সময় এই ভাবটি তোমার আসিলে তবে বুঝিবে, সত্যপ্রতিষ্ঠা হইতেছে। তাঁহার প্রসঙ্গ

করিতে গিয়া যদি স্বতঃ এমন সাবধানতা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, তিনি ওই সময়ে ওইখানে তোমার অন্তরে রহিয়াছেন; এবং কাহারও সাক্ষাতে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে, সে বলা, তাঁহার অসাক্ষাতে সে প্রসঙ্গ করিতে গেলে যেমন হয়, তাহা হইতে যদি ভিন্ন রকমের হয়—তেমনই ধরণের সাক্ষাতে করণীয় প্রসঙ্গের মত ভাব আপনা হইতে যদি গ্রহণ করে, তবেই বুঝিবে, সত্যপ্রতিষ্ঠা হইতেছে। বিষ্ণুগ্রন্থিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ততক্ষণ সম্যক্ হইয়াছে বুঝিবে না, যতক্ষণ তুমি পরকায়ে বা প্রতিমাদিতে প্রবিষ্ট হইতে না পার। এবং সেরূপ প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রচৈতন্য না হইলে হইতে পারে না।

রুদ্রগ্রন্থি। মন্ত্রচৈতন্য ততক্ষণ হয় নাই, যতক্ষণ তোমার আবাহনমাত্র দেবতা বা বাঞ্ছিতের আবির্ভাব না হয়। তবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও মন্ত্রচৈতন্য অত পূর্ণ মাত্রায় না হইলেও যখন ডাকিবামাত্র তন্ময়তা আসিবে এবং তোমার মনে হইবে, তুমি স্বাধীন ক্ষেত্রে রহিয়াছ ও আপনি আপনাকে ইচ্ছানুসারে বিভক্ত করিতে সমর্থ হইয়েছ, তখনই বুঝিবে, ঠিক হইতেছে। আর এ সমস্তের সমষ্টিরূপে একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞান-শক্তিসম্পন্ন স্বয়ম্ভু ও স্বসম্বেদনময় আত্মাই রহিয়াছেন, আমিও মুক্ত, কোন অনাত্মবোধ আমার নাই, এই ধরণের বোধও যখন আসিতে থাকিবে, তখন বুঝিবে, ঠিক হইতেছে।

মন্ত্রচৈতন্য করিতেই হইবে এবং না হওয়া পর্য্যন্ত সত্য-প্রতিষ্ঠা হয় নাই বুঝিবে। এবং প্রাণের ব্যবহারের ভিতর

দিয়াই মন্ত্রচৈতন্য ও সত্যপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়—মেধা, কৌশল, উগ্র আসুরিক তপস্যা ও প্রাণহীন জ্ঞানচর্চ্চা রুদ্রগ্রন্থির-দ্বারে আঘাত করিতে পায় না।

এই রুদ্রগ্রন্থিতে পরমাত্মা মহাকালমূর্ত্তি। আমি প্রাণ প্রতিষ্ঠার কথা বলিতে প্রাণের স্বরূপের মধ্যে আয়ু বা কালজ্ঞান ধারণা করিতে বলিয়াছি। রুদ্রগ্রন্থি অপ্রাণ, অমল, শুভ্র, নিত্যকাল-বোধময় চিৎপ্রকাশ, ইহাই মহেশ্বরত্ব। দেখ, দুইটি পদার্থের দ্বারা যেমন আকাশ বা দিগ্‌ব্যাপ্তির অস্তিত্ব বুঝিতে পার—দুইটী পদার্থের অস্তিত্ব দেখিয়া তবে বোঝ, ইহাদের মধ্যে একটা আকাশ বা ব্যাপ্তিক্ষেত্র আছে, তেমনই দুইটা ঘটনা বা ক্রিয়া দ্বারা কালের সত্তা নির্ণীত হয়। ঘটনা-পারম্পর্য্য দেখাইয়া দেয় যে, কাল নামে এক সত্তা আছে। আর আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, জগৎ বা পদার্থ বলিয়া যাহা দেখ, এ সব ক্রিয়া ঘটনা—শক্তির আবর্ত্তন। বস্তু বলিতে শুধু শক্তিপ্রবাহ বা ঘটনা বুঝায়। সুতরাং এক মহাকালের বক্ষে এক মহতী শক্তির প্রবাহ—ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই। এই ঈশানক্ষেত্র—এই রুদ্রগ্রন্থি—জ্ঞানক্রিয়া বা আদ্যাশক্তি বক্ষে লইয়া মহাকাল সমস্ত লয় ও সৃষ্টির মূলক্ষেত্র। এই "নিত্য" কালজ্ঞান রুদ্রগ্রন্থিতে অবলম্বনীয়। কিন্তু এ গ্রন্থির বলিবার অনেক আছে, যাহা তোদের এখন দুর্ব্বোধ্য। সুতরাং উপযুক্ত হলে পরে বলব—যা আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও বলি নাই।

মনে রাখিবে, ব্রহ্মৈশ্বর্য্য-ভোগে আপ্তকামত্ব সত্যপ্রতিষ্ঠার

উদ্দেশ্য না হইলেও স্বত আগত সিদ্ধি। নিজের অন্তরের দৈন্যকে এই ফলের সহিত তুলনা করিয়া দেখিয়া বুঝিয়া লইবে, তোমার সত্যপ্রতিষ্ঠা কত দূর সত্য হইয়াছে। শেষ কথা ও আসল কথা—গুরুবোধ। গুরু ভিন্ন গতি নাই—গতি নাই। গুরু বলিতে কি বুঝায় তাহা বিশেষ করিয়া ধারণা করিয়া, গুরুতে শ্রদ্ধা প্রগাঢ় করিয়া তুলিতে থাকিবে। গুরুর প্রসন্নতা ভিন্ন সিদ্ধি-লাভের কোন উপায় নাই—এ কথা বৈজ্ঞানিক হিসাবে বুঝাইয়াছি এবং সেই জন্য যাঁহাতে গুরুবুদ্ধি আরোপ করিবে, যিনি স্থূলতঃ চাক্ষুষ গুরু, তাঁহাকে প্রাণ দিয়া বরণ করিতে না পারিলে কিছুই হইবে না। গুরু বলিতে কি বুঝায়, দেখ। যিনি সমস্ত অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত করিয়া, পরমাত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন, সেই জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানমূর্ত্তি বা জ্ঞানদাতা পুরুষ গুরুপদবাচ্য। যে আত্মজ্ঞান লাভ হইলে জগতে কোন প্রাপ্তির অভাব থাকে না, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বিভূতি ঐশ্বর্য্য আয়ত্তীভূত হয়, সমস্ত দুঃখ চির অন্তর্হিত হয়, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব যে জ্ঞানের মহিমা, সেই জ্ঞানে যিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন, তাঁহাকে কিরূপ চক্ষে দেখিতে হইবে? কোন মনুষ্যের নিকট বিন্দুমাত্র উপকার লাভ হইলে অথবা কোন মনুষ্যের বিন্দুমাত্র মহত্ত্ব দর্শন করিলে সেখানে যদি তোমার শির কৃতজ্ঞতায় অথবা গৌরবের ভারে স্বতই অবনত হয়, তবে এত বড় ঐশ্বর্য্যের দাতা, এত বড় দুঃখের পরিত্রাতা, এতবড় মহান্ পুরুষের স্মরণে তোমার অন্তরে কিরূপ আলোড়ন ফুটিয়া উঠিবে? গুরু স্মরণে

বা গুরু দর্শনে যদি তোমার অন্তরে এইরূপ আলোড়ন উপস্থিত না হয়, তবে বুঝিবে, তোমার গুরুবোধ এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। সেই জন্য সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বসাধনার পূর্ব্বে সর্ব্বতোভাবে গুরু বলিতে কিরূপ মঙ্গলময় দাতা, সখা ও অনন্ত জীবন-পথের সারথি লক্ষ্য করা হয়, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবে ও সেই বোধে আপনাকে সঞ্জীবিত করিবে। পরমাত্মাই গুরু; তিনি আপনি আপনার পথপ্রদর্শক। শালগ্রামে নারায়ণ-বুদ্ধি আরোপের ন্যায় যদি কোন পুরুষবিশেষে গুরুবুদ্ধি আরোপ কর, তবে তাঁহাতে এই ভাবে সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিবে; নতুবা সমস্ত সাধনা নিষ্ফল প্রয়াসে পরিণত হইবে। জানিও, মাত্র গুরুবোধে সত্যপ্রতিষ্ঠ হইলে, আপনা হইতে সমস্ত সাধনা সুসিদ্ধ হইয়া যায়। বিশেষ করিয়া মনে রাখিও,—

"ধ্যানমূলং গুরোর্ম্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥"

আর এস, একবার সেই মহান্ পরমাত্মস্বরূপ পরমগুরুর চরণে বিলুণ্ঠিত হইয়া সমস্বরে বলি,—

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

পরিশিষ্ট

গ্রন্থিত্রয়ের কথা যত দূর বলা হইয়াছে, সাধনা সূচনার পক্ষে তাহা যথেষ্ট হইলেও আরও একটু বিশিষ্ট পরিচয় এ স্থলে দিতেছি। বিষয় অবলম্বনে তন্ময় হওয়া বা তাদাত্ম্যভাবে অস্থায়িরূপে থাকা ইহাই অনুভূতি এবং সেই অনুভূতির সংস্কার লাভই জীবের পক্ষে ভূতি। ভূতি অর্থে—হওয়া। উহাই এই সংস্কারগ্রন্থি বা রুদ্রগ্রন্থি। এইখানেই জীব সুপ্ত হয় —এইখানেই জীবের জগদনুভূতিলব্ধ সমস্ত বীজ সঞ্চিত থাকে ও এইখান হইতেই জীব স্বীয় মায়াময় বিষ্ণুগ্রন্থি ও কর্ম্মময় ব্রহ্ম-গ্রন্থিতে ভোগময় ও কর্ম্মময় হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে হৃদয়া-কাশের অন্তঃস্বরূপ বলিয়া এই রুদ্রক্ষেত্রের বর্ণনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ হৃদয়ের এই অন্তঃক্ষেত্রই প্রাজ্ঞপুরুষ বা ঈশ্বর এবং এই প্রাজ্ঞ পুরুষ হইতেই জীব নিত্য জাগ্রত হয় ও এই প্রাজ্ঞ পুরুষেই সুপ্ত হয়। চণ্ডীতে শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ নামে দেবীর যে তৃতীয় চরিতের বর্ণনা আছে, উহা এই রুদ্রগ্রন্থিভেদেরই কথা—অদৃষ্ট ও পুরুষকাররূপ গ্রন্থিশক্তির নাশের কথা।

ব্রহ্মগ্রন্থি—কর্ম্মগ্রন্থি; বিষ্ণুগ্রন্থি—রাগগ্রন্থি এবং রুদ্র-গ্রন্থি—সংস্কারগ্রন্থি বা জ্ঞানগ্রন্থি। সুতরাং মুক্তিও তিন ভাগে বিভক্ত বলিতে পারা যায়,—কর্ম্মমুক্তি, রাগমুক্তি ও জ্ঞানমুক্তি। সাধারণ জীব জগদনুভূতির দ্বারা এই তিন গ্রন্থিতেই আবদ্ধ হয় এবং ভগবদনুভূতি বা আত্মানুভূতি দ্বারা এই তিন গ্রন্থি ভেদ করে। বস্তুতঃ পুনঃ পুনঃ মহান্ ঈশ্বরে বা মহত্তত্ত্বে সারূপ্য লাভ

করিতে করিতে স্বীয় রুদ্রগ্রন্থি দর্শন যতক্ষণ না জীব করিতে পারে, ততক্ষণ মুক্তি হইতে সে যে দূরে আছে, ইহাই বুঝিতে হয়। রুদ্রগ্রন্থি-ভেদ ভিন্ন সম্যক্ মুক্তি ঘটে না। আমি গ্রন্থি-ভেদ সম্বন্ধে পরে বলিব।

এই তিন গ্রন্থির ক্রিয়া এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—জানা, পাওয়া ও হওয়া। ইহাই যথাক্রমে ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণু গ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থির ক্রিয়া। জানিলেই পাওয়া হয়, পাইলেই হওয়া হয়—ইহাই অনুভূতিতত্ত্বের স্থূল ও সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞান। সত্য করিয়া জান—সত্য করিয়াই পাইবে; সত্য করিয়া লাভ কর—সত্যই তুমি তাহাই হইবে। ব্রহ্মগ্রন্থিতে সত্য বলিয়া তাঁহাকে ধারণা কর, প্রাণ-গ্রন্থিতে তাঁহাকে তুমি পাইতে থাকিবে; প্রাণ দিয়া তাঁহাকে প্রাণময় কর—তুমিও মহাপ্রাণে পরিণত হইবে। বন্ধন বা মুক্তি কেবল অনুবেদনের ফল, এ কথা কখন ভুলিও না। "অনুবিদ্য বিজানাতি" বলিয়া শ্রুতিতে যে "জানা"র কথা বলা আছে, সেই জানার মানেই এমন জানা—যাহাতে জানা, পাওয়া ও হওয়া যুগপৎ সংঘটিত হয়। জানাটি শুধু ব্রহ্মগ্রন্থিতে স্থূলতঃ পর্যাবসিত না হইয়া যেন বিশেষভাবে রুদ্রগ্রন্থি পর্যান্ত অনুবেদিত করে—রুদ্র-স্থিত ভাবভাবীয় গ্রন্থিসকল সে "জানা" যেন ভেদ করে। এই ভাবে জান, এই ভাবে পাও, এই ভাবে তুমি আত্মস্থ হও—ইহাই ঋষির উপদেশ—ইহাই ঋষির উপদেশ।

শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মার প্রণীত

পুস্তকাবলী

১। বেদান্তদর্শন পূর্ব্বভাগ—বেদান্তে নূতন আলোক। ঋষির সত্যদর্শন আবার জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল, বুঝি ঋষিযুগ আবার আসিল। প্রজ্ঞানরসময় একাত্মরসপ্রচুর একমাত্র পরমাত্মাই আছেন ও তিনিই সাক্ষাৎভাবে জগৎ কারণ ইহাই ব্রহ্মবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত। শুদ্ধ আত্মার এইরূপ ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন এই অপরাজিতা ভাষ্যের মূল কথা এবং ইহাই যে ঋষিযুগের প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মবিদ্যা, তাহা শ্রুতিসমন্বয় দ্বারা এবং আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজের ভাষ্য খণ্ডন দ্বারা এই অপরাজিতা ভাষ্যের প্রকাশিত পূর্ব্বভাগটিতে নিঃসংশয়রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। দর্শন জগতে ইহা সম্পূর্ণ নূতন আলোক। সংসারের উপর সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া যে মিথ্যা ও বিষময় দৃষ্টি সংস্কার রচিত হইয়াছিল, কর্ম্মকে সত্য প্রতিপাদিত করিয়া সেই দৃষ্টিকে অপনোদিত করিয়া জীব কর্ম্মপথে ব্রতী হইয়া সংসারেই অমৃতলাভ করিতে পারে, এই ভাষ্যে তাহার সন্ধান দেখান হইয়াছে। ইহা সত্যযুগের সত্যধর্ম্ম, ইহার প্রচারে আবার সত্যযুগ সূচিত হইয়াছে ... ... ৩৲

ঐ কাপড়ে বাঁধাই ... ৪৲

উত্তর ভাগ (যন্ত্রস্থ)

২। ঈশোপনিষৎ—জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চই যে জীবনযাত্রায় ঋষিনির্দিষ্ট পথ ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সত্য প্রতিষ্ঠাই পরম ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম জগৎকে মধুময় করে—আত্মাকে মধুময় করে, বীর্য্য দিয়া কর্ম্মক্লান্ত জীবকে বীর সাধকে পরিণত করে। বীর্য্যবলে ভাবী ভারের প্রাবল্য

জ্ঞানের অপরিমেয় গাম্ভীর্য্য বেদান্তের দুর্গম গিরিবক্ষ ভেদ করিয়া ভাবের স্নিগ্ধ অমৃত নিঃস্যন্দিত। ইহা অপূর্ব্ব ... ১।০

৩। শিবের বুকে শ্যামা কেন ? ... ... ।০

৪। মা আমার কাল কেন ? ... ... ।০

৫। মায়ের খেলা ... ... ।০

ঐ ২য় ভাগ ... ... ।০

৬। দশমহাবিদ্যা (সচিত্র) ... ... ।০

৭। মুক্তি ... ... ।০

৮। বিজয় ভেরী ৵০

৯। বৈজয়ন্তী তন্ত্রম্ (ঋতম্ভরা সারম্) ... ... ১।০

১০। আদর্শ ব্রাহ্মণ (নাটক) ... ... ১৲

১১। নামের বল (নাটক) ... ... ১৲

১২। সতী (নাটক)—যন্ত্রস্থ ... ...

১৩। উপনিষদ্‌রহস্য বা গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা—

১ম ভাগে—১ম ও ২য় অধ্যায় ... ৩৲

ঐ কাপড়ে বাঁধাই ... ৩॥০

২য় ভাগে ৩য় ৪র্থ ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায় ... ২৷৵০

ঐ কাপড়ে বাঁধাই ... ৩৷৵০

৩য় ভাগে—৭ম হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় ... ৩।০

ঐ কাপড়ে বাঁধাই ... ৩৷৵০

শ্রীকুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীগুরুমন্দির—

৬৪নং কালী বন্দ্যোপাধ্যায় গলি. হাওড়া।